প্রথম প্রকাশ □ ১৩৬৭



১১৭, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

এ রায় কর্তৃক এ পি পির পক্ষে প্রকাশিত ও সিদ্ধেশ্বরী
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২৮/জি অবিনাশ ঘোষ লেন
হইতে মুদ্রিত।

সূচি

'ভালোবাসার লিখন' ৭

আন্তন চেখভ। **কাশ্তান্কা** (অনুবাদ অনিমেষ পাল। সম্পাদনা অরুণ সোম) ১৫

ইভান তুর্গেনেভ। **বেঝিন মাঠ** (অনুবাদ প্রদ্যোৎ গুহ। সম্পাদনা অরুণ সোম) ৪১

দ্মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক। **শিকারী এর্মোলিয়া** (অনুবাদ অরুণ সোম) ৬৫

নিকোলাই তেলেশোভ। **বাড়ির পথে** (অনুবাদ অরুণ সোম) ৭৯

লেওনিদ আন্দ্রেইয়েভ। **বাগানবাড়িতে পেতিয়া** (অনুবাদ অরুণ সোম) ৯৫

আলেক্সান্দ্র কুপ্রিন। **ধলা পুড্ল** (অনুবাদ অরুণ সোম) ১০৯

ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি। **বাবুদের বোর্ডিং-স্কুলে** (অনুবাদ অরুণ সোম) ১৪৫

দ্মিত্রি গ্রিগোরোভিচ্। **সার্কাসের ছেলে** (অনুবাদ অরুণ সোম) ১৫৭

কন্স্তান্তিন স্তানিউকোভিচ্। **মাক্সিমকা** (অনুবাদ অরুণ সোম) ১৭৭

ভ্সেভলোদ গার্শিন। **সিগন্যাল** (অনুবাদ অরুণ সোম) ২১১

লেভ তলস্তয়। **ককেশাসের বন্দী** (অনুবাদ অরুণ সোম) ২২৫

'ভালোবাসার লিখন'

(মুখবন্ধ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান লেখক দস্তয়েভ্স্কি, চেখভ ও লেভ তলস্তয়ের নাম বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত। এই লেখকেরা রাশিয়ার জাতীয় গৌরব। আমরা, সোভিয়েত জনগণ, আমাদের ঊনিশ শতকের সাহিত্যের জন্য গর্বিত, কেননা সে যুগের গোটা সাহিত্য গড়ে উঠেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে, মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সহানুভূতি আর তার সুখের স্বপ্ন থেকে। আমরা আমাদের সাহিত্যের জন্য গর্বিত, কেননা তা চিরকাল ছিল সৎসাহিত্য, তা অত্যাচার, নৃশংসতা ও জাতিবিদ্বেষের মুখোস খুলে দিয়েছে, বিশ্বের সকল মানুষের মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করেছে। আমরা অতীতের মহান রুশ সাহিত্যের জন্য গর্বিত, কেননা সে সাহিত্য সত্য ও ন্যায়পরতা রক্ষায় অবিচল এবং অন্যায় ও হিংসার পীড়নে নির্যাতিত মানুষের স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখকদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যিনি শিশুদের সম্পর্কে কিংবা শিশুদের জন্য লেখেন নি। আমাদের লেখকেরা শিশুদের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন জাতির ভবিষ্যৎ, দেশের আগামী দিন। তাঁদের প্রয়াস ছিল বয়স্কদের অজ্ঞানতা ও নৃশংসতার হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা। লোকে যাতে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, সৎ ও সুখী হয়ে উঠতে পারে, সেরকম ভাবে তাদের শিক্ষাদানের কথা তাঁরা ভেবেছেন।

রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দী হল জনগণের ঘোর দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দশার কাল। ১৮৬১ সন পর্যন্ত দেশে বজায় ছিল 'ভূমিদাস প্রথা' নামে এক প্রথা, যার বলে প্রাচীনকালে যেমন ক্রীতদাস

কেনা-বেচা করা যেত, তেমনি জমিদার কৃষককে কিনতে অথবা বেচতে পারত, বেত মারতে মারতে তাকে মেরে ফেলতে পারত — এতে জমিদারের কোন শাস্তি হত না। কিন্তু জার ভূমিদাস প্রথা রদ করার পরও জনগণের জীবন তেমন কিছু উন্নত হল না। আগের মতোই বড়লোক বড়লোকই রয়ে গেল, গরিবও গরিব রয়ে গেল। আগের মতোই গরিব মানুষ দুর্ভিক্ষ, সাধ্যাতীত শ্রম ও লাঞ্ছনার কবলে পড়ে কষ্ট পেতে লাগল।

বিশেষ করে কঠিন অবস্থা ছিল শিশুদের। এমন কি ধনী পরিবারের শিশুরা — যারা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করত এবং লেখাপড়ার সুযোগ পেত — তারাও সত্যিকারের আনন্দ ও মুক্তি কাকে বলে তা জানত না। আর গরিবদের ছেলেমেয়েদের সামনে ছিল রক্ত-জল-করা পরিশ্রম; তাদের প্রায় সকলেরই ভবিষ্যৎ বলতে ছিল নিরক্ষরতা, অশেষ অভাব-অনটন আর প্রায়শই অকাল মৃত্যু।

'বড়দিনে খ্রীস্টের বালক অতিথি' নামে দস্তয়েভ্স্কির একটি গল্প আছে। কাহিনীর খুদে নায়কের মা রাতের বেলায় গরিব লোকদের রাত্রিযাপনের এক ঠাণ্ডা কনকনে আশ্রয়ে মারা যায়। সকালে মা'র শয্যার পাশে ছেলেটার ঘুম ভাঙে। মা ঘুমুচ্ছে, এই ভেবে সে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, ঘরবাড়ির জানলা দিয়ে তার চোখে পড়ে সচ্ছল লোকজন বড়দিনের উৎসবে মেতেছে। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ক্ষুধার্ত ছেলেটি কোন এক বাড়ির দেয়ালের ধারে, উঠোনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে তার মা'র মতোই কালঘুমে।

বলাই বাহুল্য, দস্তয়েভ্স্কি তাঁর গল্পটি লিখেছিলেন এই সমাজচ্যুতদের জন্য নয়। ওরা ত পড়তে অবধি জানত না! তিনি লিখেছিলেন সেই সব শিশুর জন্য যাদের ছিল উষ্ণ গৃহকোণ, সুন্দর সুন্দর বইপত্র। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওদের মনের মধ্যে হতভাগ্যদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক করা, করুণা ও সমবেদনা জাগিয়ে তোলা।

অপর এক মহান রুশ লেখক আন্তন চেখভ যে কথা উচ্চারণ করেছেন, তা বহু খ্যাত — তিনি বলেছেন: 'শৈশবে আমার শৈশব ছিল না।' মহকুমার এক অসচ্ছল দোকানদারের ছেলে ছিলেন তিনি। তাঁকে একেবারে ছোটবেলা থেকেই গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে হয়, কাজ করতে হয় বাপের দোকানে, যেখানে গরমকালে পর্যন্ত স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা। অভাব-অনটনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ৪৪ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। শিশুদের নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলি শিশুমন সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধশক্তি, ভালোবাসা ও দরদে পরিকীর্ণ। ঐ সব গল্পে বিষাদাচ্ছন্ন অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে হাসির জিনিসও কম নেই। শৈশবে লেখক আনন্দ বলতে কমই জানতেন, তাই এ আনন্দ যে শিশুদের কত দরকার সেটা তাঁর জানা ছিল। তিনি নিজের রচনায় তা সঞ্চার করতে প্রয়াসী হন। চেখভের সুহৃদ্, লেখক কুপ্রিন মৃত্যুর কিছুকাল আগে ক্রিমিয়ায় চার বছরের এক মেয়ের সঙ্গে চেখভের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বলে উল্লেখ করেন: 'একরত্তি একটি শিশু আর প্রৌঢ়, বিষণ্ণপ্রকৃতির ও বিরাট এক মানুষ, বিখ্যাত লেখকের মধ্যে কেমন যেন বিশেষ ধরনের, গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা অনেকক্ষণ পাশাপাশি বেঞ্চে, বারান্দায় বসে থাকত; আন্তন পাভ্লভিচ মনোযোগ দিয়ে, একাগ্রচিত্তে শুনে যেতেন...'

শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া, তাদের জীবনের যথাযথ বিবরণ দেওয়া এবং শিক্ষা দিতে শুরু করার আগে তাদের বুঝতে চেষ্টা করা — এটা ছিল সাধারণভাবে সমস্ত রুশ লেখকেরই অন্তিম নির্দেশ। লেভ্ তলস্তয় বলেছেন: 'স্কুলের ছেলেমেয়েরা — মানুষ, ছোট হলেও মানুষ; আমাদের মতো একই রকম চাহিদা তাদের আছে, একই পথে চলে তাদের ভাবনাচিন্তা।' সহালাপী হিশেবে শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা — রুশ শিশুসাহিত্যের শক্তিস্বরূপ।

চিরায়ত সাহিত্যের লেখকেরা শিশুসাহিত্যের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন 'এমন এক জীবন্ত যোগসূত্র যা শিশুদের গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে এসে বাকি দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে'। একথা বলেছেন দ্‌মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভূমিকা তিনি নির্ধারণ করেছেন নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে:

'আমার কাছে আজ পর্যন্ত প্রতিটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থই কেমন যেন জীবন্ত, যেহেতু তা শিশুচিত্তের জাগরণ ঘটায়, শিশুর ভাবনাচিন্তা নির্দিষ্ট খাতে পরিচালিত করে এবং অন্যান্য কোটি কোটি শিশুহৃদয়ের সঙ্গে একই তালে এক শিশুহৃদয়কে স্পন্দিত করে তোলে। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ — এ হল বসন্তকালের সূর্যকিরণ, যে কিরণ শিশুচিত্তের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই অপূর্ব জমিতে যে বীজ ছড়ানো হয়েছে তার বিকাশ ঘটায়। এই গ্রন্থের কল্যাণেই শিশুরা মিলিত হয় এক বিশাল আত্মিক সম্পর্কে, যেখানে নেই কোন জাতিগত ও ভৌগোলিক সীমানা...'

শিশুদের প্রতি রুশ লেখকদের গভীর মনোযোগের ফলে শিশুসাহিত্য রচনার ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ববোধের পরিচয় মেলে। '...শিশুদের জন্য ভালো করে লেখা — বড় কঠিন,' মন্তব্য করেন বিখ্যাত 'মুমু' গল্পের লেখক তুর্গেনেভ। 'এখানে যা দরকার তা কেবল নিজের বিবেকবুদ্ধি মতো বিষয়ের অনুশীলন নয়, কেবল ধৈর্য নয়, কেবল সামগ্রিকভাবে মানবহৃদয় সম্পর্কে এবং বিশেষ করে শিশুহৃদয় সম্পর্কে জ্ঞান নয়, অবশেষে, অতিমিষ্টতা ও ইতরতা বর্জন করে সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় গল্প বলার ক্ষমতামাত্রও নয় — এসব বাদেও এখানে দরকার হয় উঁচু পর্যায়ের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ।'

শিশুদের জন্য যিনি লিখছেন তাঁকে সর্বোপরি হতে হবে সৎ, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁকে হতে হবে সৎ নাগরিক — ভালোবাসতে হবে নিজের জাতিকে, স্বদেশকে। উঁচু মাত্রায় নাগরিক ও নৈতিক গুণের ফলেই রুশ লেখকেরা মন্দকে গোপন না করে, অথচ ভালোকেও বিস্মৃত না হয়ে তৎকালীন বাস্তবতাকে তার যথাযথ রূপে শিশুদের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

'আমাদের রুশ জীবনের অপূর্ণতা — সমস্ত রুশ লেখকের অভ্যস্ত বিষয়বস্তু,' মামিন-সিবিরিয়াক এক সময় লেখেন, 'কিন্তু এ ত কেবল মন্দ দিক, অথচ ভালো দিকও একটা নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে বাঁচা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত, অসম্ভব হত নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা, ভাবনাচিন্তা করা... কোথায় সে জীবন? কোথায় আছে সেই গোপন উৎস যেখান থেকে ক্ষরিত হচ্ছে বহু প্রপীড়িত রুশ ইতিহাস? কোথায় আছে সেই পথরেখা আর সর্বনাশা পথসংযোগ যার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন শক্তিমান মহাবীরের দল?'

এই গ্রন্থে সংগৃহীত গল্পগুলি এমনি সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এককালের বুর্জোয়া-অভিজাত ব্যবস্থাধীন রাশিয়ার অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কালব্যাপী জীবনযাত্রা।

এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে লেখক আর গল্পের চরিত্রের সঙ্গে মনে মনে তোমরা দেখতে পাবে সেকালের মস্কো ও পিটার্সবুর্গ, অতিক্রম করবে দক্ষিণের সূর্যালোকে প্লাবিত ক্রিমিয়ার উপকূলভূমি, সাইবেরিয়ার প্রশস্ত পথ, যেখানে শিস দেয় ঠান্ডা উত্তুরে বাতাস আর ঝাপটা মারে শরতের বৃষ্টিধারা। কল্পনায় চলে যাবে গ্রীষ্মকালীন উরালের তাইগায়, যেখানে পাহাড়পর্বত আর ঘন ফারবনের মাঝখানে চরে বেড়ায় বুনো হরিণের দল। যাবে ককেশাসের নির্জন পর্বতশ্রেণীতে, যাবে ভারত মহাসাগরে, যেখানে রুশ নাবিকেরা বিশ্বপরিভ্রমণ করে। 'বেঝিন মাঠ' গল্পের লেখকের সঙ্গে গরমকালের ছোট রাত কাটাবে রাশিয়ার একেবারে কেন্দ্রে — কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের গহনে, যেখানে উত্তরের বনভূমির সঙ্গে এসে মিলেছে দক্ষিণের স্তেপ, যেখানে সেই একশ বছর আগেকার মতো আজও মাঠ তেমনই প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, নদী তেমনই রহস্যময়ী ও মৃদুগামিনী।

বহু হাজার ভার্স্ট বিস্তৃত রাশিয়ার এই পথে পথে দেখা দেবে কৃষক, শিকারী, কারিগর, সার্কাসের খেলোয়াড়, জীবজন্তুর ট্রেনার, রেল লাইনের পাহারাদার, জঙ্গী অফিসার, সৈনিক, নাবিক, পলাতক আসামী, শিক্ষক, ধনী লোকজন, তাদের ভৃত্য — নানা ধরনের, অতি বিচিত্র লোকজন।

এ ছাড়াও দেখতে পাবে নিজের সমবয়সীদের — শহরের ও গ্রামের 'নিচু স্তরের' ছেলেমেয়েদের, হতভাগ্য অনাথের দলকে। তাদের মা-বাবাদের হয় অকালে মৃত্যু হয়েছে কিংবা দারিদ্র্যের তাড়নায় তারা আপন শিশুসন্তানকে বাবুদের কাছে চাকরিতে বহাল করতে বাধ্য হয়েছে। আর আছে খুদে জমিদারনন্দন — বাপের অর্থপ্রাচুর্য এবং বাড়ির দাস-দাসীদের আদরযত্ন যাকে বানিয়েছে আদুরে দুলাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবে — রুশ লেখকেরা যখন শিশুদের সম্পর্কে কিছু বলেন, তখন প্রায় অবধারিতভাবে তাঁরা বলে থাকেন তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা। 'শিকারী এর্মোলিয়া' গল্পে বাচ্চা গ্রিশা গুরুতর অসুস্থ। 'বাড়ির পথে' গল্পের বালক ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দস্তয়েভ্স্কির গল্পের চরিত্রটি শিক্ষক আর ক্লাসের ছাত্রদের হাসিঠাট্টার খোরাক হয়ে কষ্ট পায়। 'ককেশাসের বন্দী' গল্পের তাতার মেয়ে দিনা রুশী অফিসার জিলিনের কষ্টে যেন নিজেরই যন্ত্রণা অনুভব করে। লেওনিদ আন্দ্রেইয়েভের গল্পে রাঁধুনীর ছেলে পেতিয়া অঝোরে তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে যখন সে জানতে পারে তাকে ফিরে যেতে হবে শহরে, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক পায়ে খাড়া থেকে হুকুম তামিলের কঠিন কাজ, মনিবের গালাগাল আর চড়চাপড়। গ্রিগোরোভিচের 'সার্কাসের ছেলে' গল্পের মূল চরিত্র পেতিয়া সার্কাসের চাঁদোয়ার মাথা থেকে ফসকে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে মারা যায়...

এই সব গল্পের রচয়িতারা অন্ধকারাচ্ছন্ন, মর্মান্তিক এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকারহীন

জীবনের উজ্জ্বল দিকটিও যদি আমাদের না দেখাতে পারতেন, অভাব-অনটন, অধিকারহীনতা, দুঃখকষ্ট ও অন্যায়ের বাধা ভেদ করে এই গল্পগুলিতে যদি সত্য ও শুভবুদ্ধির নির্মল ও প্রবল উৎস উৎসারিত না হত তাহলে হয়ত মামিন-সিবিরিয়াকের সুরে সুর মিলিয়ে আপত্তি করে আমরা বলতাম, 'কিন্তু এ ত কেবল মন্দ দিক!'

অন্যতম মানবতাবাদী রুশ লেখক আন্তন চেখভের 'কাশ্‌তান্‌কা' গল্পে অগ্রভাগে যাকে দেখা যায় সে মানুষ নয়, কুকুর। এই বিষয়বস্তুর আশ্রয়গ্রহণ আকস্মিক নয়। চেখভ লিখেছেন: 'শিশুদের জীবনে ও স্মৃতিতে গৃহপালিত পশু... নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণজনক ভূমিকা গ্রহণ করে। এমন কি আমার মাঝে মাঝে একথাও মনে হয় যে শুকনো ও ফেকাসে চেহারার কার্ল কার্লভিচের লম্বা লম্বা ভর্ৎসনা বাক্যের চেয়ে কিংবা জল যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলে তৈরী — শিশুদের কাছে এটা প্রমাণ করার চেষ্টায় গভর্নেসের বহু ধোঁয়াটে বাক্যব্যয়ের চেয়ে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুর সহজাত সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা, অসীম ক্ষমাশীলতা শিশুর মনে অনেক বেশি শক্তিশালী ও শুভ প্রভাব বিস্তার করে।'

'কাশ্‌তান্‌কা' গল্পটির বিষয়বস্তু - বিশ্বস্ততা। এ হল একটি কুকুর সম্পর্কে আবেগপূর্ণ কাহিনী। মদ্যপায়ী ছুতোর লুকা আর ফেদিয়া নামে ছেলেটির দারিদ্র্যপীড়িত ঘরে সে বাস করত, অনশন ও মারধরের যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হত, তবু সে মনে করত এই বাড়ি তার নিজের বাড়ি, এ বাড়ির লোকজন তার আপনজন। একবার অপ্রত্যাশিতভাবে শহরে পথভ্রষ্ট হয়ে কুকুরটা হারিয়ে গেল, কিন্তু বেঘোরে মারা গেল না। সে সার্কাসের ট্রেনারের হাতে গিয়ে পড়ল। লোকটা তাকে ভালো ভালো খাওয়া দিত, নানা রকম কসরতের তালিম দিত, মারত না, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত, তাকে আদর করত। কিন্তু কয়েক মাস বাদে কাশ্‌তান্‌কা যখন তার আগের মালিকদের দেখা পেল তখনই সে তাদের কাছে ছুটে গেল। সত্যিকারের সুখ তখনই পেল। গল্পের পাঠ শেষ করতে করতে কাশ্‌তান্‌কার সঙ্গে সঙ্গে, ছুতোর লুকা আর বালক ফেদিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আনন্দ পাই, কেননা কাশ্‌তান্‌কার প্রত্যাবর্তন হল সেই ভালোবাসারই জয়, যে ভালোবাসা পেটভরা খাবার দিয়ে কেনা যায় না, দরদী কথা দিয়েও নয়।

মামিন-সিবিরিয়াকের 'শিকারী এমেলিয়া' গল্পটিরও বিষয়বস্তু — ভালোবাসার সর্বজয়ী শক্তি ও বিশ্বস্ততা। অসুস্থ গ্রিশা তার দাদুর কাছে আবদার করে হরিণের বাচ্চা ধরে এনে দিতে। বুড়ো শিকারীর পক্ষে এখন পাহাড়ে পাহাড়ে হাঁটাচলা করা কষ্টকর। কিন্তু নাতির খাতিরে তিন দিন তিন রাত তাইগায় ঘোরার পর সে হরিণের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পায়। তারপর আরও অনেকক্ষণ সে আর হরিণের বাচ্চার সন্ধান পায় না, কেননা মা-হরিণ নিজের জীবন বিপন্ন করে শিকারীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এমেলিয়া গোঁ ধরে থাকে। শেষ পর্যন্ত শিকার তার নজরে পড়ে। আর এখানেই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

আমরা গল্পে পড়ি: 'আর একটি পলক, এখনই ছোট হরিণছানাটি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের

করুণ আর্তনাদ করতে করতে ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো শিকারীর মনে পড়ে গেল কী দারুণ সাহস দেখিয়েই না মা তার শাবককে রক্ষা করছে, মনে পড়ে গেল গ্রিশার মা কী ভাবে নিজের জীবন দিয়ে নেকড়ের পালের কবল থেকে ছেলেকে বাঁচায়। বুড়ো এর্মোলিয়ার বুক যেন ভেঙ্গে গেল, সে বন্দুক নামিয়ে রাখল।'

গল্পের উপসংহারটি অপূর্ব। এর্মোলিয়া অসুস্থ নাতির ইচ্ছা পূরণ না করেই নিজের জীর্ণ কুটিরে ফিরে আসে। সে গ্রিশাকে ব্যর্থ শিকারের বর্ণনা দেয়। গ্রিশা হাসতে থাকে। রাত পর্যন্ত সে বারবার দাদুকে জিজ্ঞেস করে হরিণছানাটি কেমন ছিল, কী ভাবে ওটা পালিয়ে যায়। লেখক তাঁর গল্প শেষ করেন এই ভাবে: 'গ্রিশা শেষকালে ঘুমিয়ে পড়ল, সারারাত স্বপ্নে দেখল ছোট্ট হলদে হরিণছানা — ফূর্তিতে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মা'র সঙ্গে; এদিকে বুড়োও চুল্লীর ওপর শুয়ে ঘুমের ঘোরে হাসছিল।'

এই সাদাসিধে কাহিনীর মধ্যে কী বিপুল তাৎপর্যই না নিহিত! এতে গীত হয়েছে ভালোবাসার নামে সাধিত কীর্তির সৌন্দর্য, যাকে ভালোবাসা যায় তার খাতিরে আত্মত্যাগের সৌন্দর্য। এখানে দেখানো হয়েছে জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহারের সুদূরব্যাপী প্রভাব। মানুষের ওপর তার ফল শুভ। হরিণছানাকে না মেরে শিকারী দাদু যে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছে তা গ্রিশার পক্ষে নিহত জন্তুর মাংসের চেয়ে শতগুণ আরোগ্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

শিশু আর বয়স্ক লোকজন... এদের সম্পর্কের ছবি আঁকতে গিয়ে রুশ লেখকেরা সব সময়ই শিশুদের পক্ষ নিয়েছেন। গ্রিগোরোভিচের 'সার্কাসের ছেলে' গল্পে সার্কাসের খেলোয়াড় বেকার আমাদের কাছে ঘৃণিত, কেননা বড় ও শক্তিমান এই লোকটি ছোট পেতিয়াকে রক্ষার জন্য তার শক্তি খাটায় না, খাটায় তার আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তাকে বশ মানানোর জন্য। স্তানিউকোভিচের 'মাক্সিমকা' গল্পে মার্কিন জাহাজের ক্যাপ্টেনও আমাদের ঘৃণার উদ্রেক করে — তার ব্যবসা ছিল নিগ্রো ক্রীতদাসের চোরাই চালান। নিগ্রো বয়টি যখন নাবিকদের কাছে তার ওপর আগেকার মনিবের মারধোরের বিবরণ দেয় তখন ইতর ক্যাপ্টেনটা জাহাজডুবিতে মরেছে — এই ভেবে পাঠক খোলাখুলি আনন্দ পায়।

বড়দের শক্তি সব সময়ই ছোটদের চেয়ে বেশি। কিন্তু ছোটরা কেবল শক্তির ওপরই নির্ভরশীল নয়। বড়দের ওপর তাদের নির্ভরশীলতার আরও কারণ এই যে বড়রা তাদের খাওয়ায়, পরায়, আশ্রয় দেয়। এই নির্ভরতার সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি শিশুর ওপর জোর খাটায়, সে দুষ্কৃতকারী। রুশ সাহিত্য একথাই প্রচার করেছে। রুশ সাহিত্যে সেই মানুষেরই জয়গান ও কীর্তি প্রচারিত হয়েছে, যে মানুষ শিশুদের ভালোবাসে, শিশুদের সেবা করে, বঞ্চনা, দুঃখকষ্ট ও অন্যায়-অবিচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে।

তেলেশোভের 'বাড়ির পথে' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই যে অসুস্থ বালককে বাঁচাতে গিয়ে ফেরারী আসামী তাকে শহরে বয়ে নিয়ে আসে এবং সেপাইদের হাতে ধরা পড়ে। লোকটা যে কী অপরাধ করেছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা দেখছি যে সে অন্যের বাচ্চাকে, তার প্রায়

অচেনা এক বাচ্চাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীনতা, এমন কি হয়ত জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। তার কীর্তি আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

জোকার এডওয়ার্ডস আমাদের আস্থা অর্জন করে — সে বেকারের ঘুষি থেকে পেতিয়াকে রক্ষা করে। স্তানিউকোভিচের গল্পের মাতাল নাবিক আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর। সে উদ্ধার-পাওয়া নিগ্রো ছেলেটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, তাকে আদর করে নাম দেয় মাক্সিমকা, নিজের যৎসামান্য সম্বল থেকে তার জন্য জুতো ও পোশাক সেলাই করে, এমন কি ছেলেটির প্রতি দায়িত্ববোধ ও পিতৃসুলভ স্নেহের বশে মদ্যপানের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে মাঝে-মধ্যে দেখতে পাবে খামখেয়ালি, আবদারে ছেলেপুলে — যেমন দেখা যায় 'ধলা পুড্‌ল' গল্পে ধনী ইঞ্জিনীয়রের ছেলে ত্রিল্লিকে। কিন্তু এই সব গল্পে শিশুদের কখনই দুর্বৃত্ত, বদমাশ ও ইতর করে দেখানো হয় নি, যেমন সময় সময় চোখে পড়ে বয়স্কদের ক্ষেত্রে। এমন কি ত্রিল্লির মতো স্বার্থপর ছেলেও তাকে যাঁরা মানুষ করে তুলেছেন সেই বয়স্কদের চেয়ে অনেক কম দোষী; কেননা প্রকৃতিগতভাবে শিশুরা মানবপ্রকৃতির চরম সদ্‌গুণের প্রবক্তা, নির্মলতা ও নিষ্কলঙ্কতার মূর্ত প্রকাশ। 'বেঝিন মাঠ' গল্পের লেখক নিরক্ষর চাষী ছেলেদের কুসংস্কারের মধ্যে পর্যন্ত কী অপূর্ব সারল্য ও কাব্যধর্মের প্রকাশ ঘটিয়েছেন! আর 'ককেশাসের বন্দী' গল্পে রোগা, দুর্বল দিনা মেয়েটির মধ্যে সহানুভূতি, সমব্যথা ও ভালোবাসার কী অফুরান উৎসই না নিহিত!

বয়স্কদের সঙ্গে শিশুদের পার্থক্য এই যে জাতি-বর্ণভেদের সংস্কার সহজাতভাবে শিশুদের কাছে অপরিচিত। দিনার বাবা যাকে বন্দী করে রেখেছে, তারই জন্য দিনার মনঃকষ্ট। গাঁয়ের বয়স্ক অধিবাসীরা রুশীদের দুশমন হিশেবে দেখলেও দিনা তাকে সাহায্য করে। দিনার কাছে জিলিন — সর্বোপরি ভালো লোক, তার হাতে তৈরী খেলনা শিশুদের আনন্দ দেয়। 'মাক্সিমকা' গল্পটি মানুষে মানুষে যথার্থ সৌভ্রাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। রুশী নাবিকদের মধ্যে নিগ্রো বাচ্চাটি নিজেকে মানুষ বলে অনুভব করল, আদরযত্নের স্বাদ পেল এবং প্রতিদানে শিশুহৃদয়ের অসীম ভালোবাসা ও অনুরাগের পরিচয় দিল।

যারা অনভিজ্ঞ, যারা ছোট, তাদের পক্ষে বয়স্কদের দৃষ্টান্ত সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবের ভিত্তিভূমিতে যে শুভ সম্ভাবনা থাকে তা তখনই ভালোমতো দৃঢ় ও বিকশিত হয়ে ওঠে যখন বয়স্কদের আচার-আচরণে তার সাড়া ও সমর্থন মেলে। জিলিন যে সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের মুখেও নিজের পৌরুষ ও আত্মমর্যাদাবোধ হারায় নি তা আকর্ষণযোগ্য। ভ. গার্শিনের 'সিগন্যাল' গল্পে রেলকর্মী সেমিওনের কীর্তিও অপূর্ব। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে দুর্ঘটনা থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে রক্ষা করেছে। এমন কি যে ভাসিলি রেলবিভাগের ওপরওয়ালার নির্যাতনে উত্ত্যক্ত হয়ে প্রতিহিংসার বশে রেল লাইন উপড়েছিল, সে-ও যে সেমিওনের রক্তমাখা রুমাল তুলে নিয়ে ট্রেন থামায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা এতে অবাক হই না, যেহেতু নিরপরাধ লোকজনের প্রাণহানি নিবারণের জন্য — সম্ভব হলে নিজের জীবনের বিনিময়ে — ত্যাগস্বীকারে সেমিওনের

প্রস্তুতি ছিল এমনই প্রত্যয়জনক। বুদ্ধিবিবেচনাপ্রসূত যে কোন সিদ্ধান্তের তুলনায় এতে ভালোমতো প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বিবেক — মানুষের আচরণের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।

এই গল্পগুলি পড়ার পর এসব বিষয় ভেবে দেখো। মনে করে দেখ দস্তয়েভ্স্কির নায়কের যন্ত্রণা। তার যন্ত্রণার কারণ এই যে মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সে তার প্রতি যথেষ্ট ভালো ব্যবহার ও দরদের পরিচয় দেয় নি, বালকের সেই শেষ পর্যন্ত না-বলা ভালোবাসার বেদনা এখন তাকে দগ্ধ করছে। একবার মনে মনে বেরিয়ে এসো উরালের চাষী এর্মেলিয়ার সঙ্গে শিকারে, এসে দাঁড়াও রেলকর্মী সেমিওনের পাশে রেল লাইনের ওপর ছুটন্ত গাড়ির সামনে। তাহলে দেখতে পাবে এখানে যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে তাদের চরিত্র ট্র্যাজিক হওয়া সত্ত্বেও জীবন অপার, সেখানে এমন কিছু আছে যার জন্য আনন্দ করা যায়, বেদনা বোধ করা যায়, সংগ্রাম করা যায়। দেখতে পাবে কল্যাণের সর্বব্যাপী, সংক্রামক রূপ, অর্থাৎ তার অমরত্ব। সে কল্যাণের অবিনশ্বর শক্তি মন্ত্রের মতো এক প্রাণ থেকে অন্য প্রাণে সঞ্চারিত হয়, শিশু আর বয়স্কদের মিলন ঘটায়, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করে, মূর্খকে করে জ্ঞানবান, দুষ্টকে — শিষ্ট, উদাসীনকে — সংবেদনশীল, মানুষকে সম্মিলিত করে এক ঐক্যবদ্ধ মানব পরিবারে।

মামিন-সিবিরিয়াক তাঁর বালিকা কন্যার জন্য লিখেছিলেন 'আলিওনুশকার গল্প'। বইটি প্রকাশিত হলে লেখক মাকে জানান: 'এটি আমার প্রিয় বই — স্বয়ং ভালোবাসার লিখন, আর এই কারণে বাকি সবগুলির ওপরে।'

'সার্কাসের ছেলে' সঙ্কলনগ্রন্থটিতে যে সব গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি আজও জীবিত এই কারণেই যে তারা হল 'ভালোবাসার লিখন'।

এই গল্পগুলি যাঁরা রচনা করেছেন সে সব মানুষ আজ বহুকাল হল গত। বহুকাল হল গত হয়েছে আগেকার সেই দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়াও। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিশাল ভূখণ্ডে বাস করছে সেই সব মানুষের বংশধর ও মানসসন্তানেরা, যাঁরা সেকালে পরিশ্রম করেছেন, দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন কল্যাণের। সেই সময় থেকে লব্ধ মাটির টান, প্রকৃতি, শ্রম ও শিশুর প্রতি — সাধারণভাবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের সমকালীনরা তাদের বোধে রক্ষা করে আসছে পূত অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো। নবীন পুরুষের উদ্দেশে নিজেদের রচনার মধ্যে রুশ ভূমির মহান লেখকেরা যে ভালোবাসার জয়গান গেয়েছেন, এ হল সেই একই ভালোবাসা।

ইগর মতিয়াশোভ

আন্তন চেখভ

কাশতান্‌কা





১

দুষ্টুমি

ছোট একটা বাদামী কুকুর। জাতে দো-আঁশলা। মুখখানা একদম শেয়ালের মতো। ফুটপাতের ওপর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল আর অস্থির হয়ে তাকাচ্ছিল এপাশে ওপাশে। মাঝে মাঝেই কুকুরটা থামছে আর কাঁদছে, আর ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া একটা-না-একটা পা উ'চু করে মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছে—ও যে হারিয়ে গেল এটা কেমন করে হল?

দিনটা ওর কেটেছে কেমন করে আর কেমন করেই বা শেষকালে ও এই অচেনা ফুটপাতে এসে পড়ল তা ওর পরিষ্কার মনে আছে।

দিনের শুরুটা সেই তখন। ওর মনিব ছুতোর-মিস্ত্রি লুকা আলেক্সান্দ্রিচ্ টুপি মাথায় দিয়ে লাল রুমালে জড়ানো কাঠের কি একটা জিনিস বগলদাবা করে হাঁক পাড়ল:

'কাশ্‌তান্‌কা, চল! যাওয়া যাক!'

নিজের নাম শুনতে পেয়েই দো-আঁশলা কুকুরটি বেরিয়ে এল মিস্ত্রির টেবিলের তলা থেকে—সেখানে কাঠের চাঁছিগুলোর উপর ও ঘুমোচ্ছিল। মিষ্টি করে আড়মোড়া ভেঙে ও দৌড়ে গেল মনিবের পিছু পিছু। লুকা আলেক্সান্দ্রিচের খদ্দেররা থাকত সব ভীষণ দূরে দূরে। এতদূরে যে তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পেঁছুবার আগে গায়ে একটু জোর করে নেবে বলে ছুতোরকে একেকবার খানিকক্ষণের জন্য ঢুকতে হচ্ছিল সরাইখানায়। কাশ্‌তান্‌কার মনে পড়ল রাস্তায় ও খুব বাড়াবাড়ি রকমের অসভ্যতা করেছিল। ওকে বেড়াতে আনা হয়েছে এই আনন্দে ও লাফালাফি





করেছে, ঘেউঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়িগুলোর ওপর, অন্য সব কুকুরদের তাড়া করে ঢুকে গিয়েছে আশেপাশের বাড়ির উঠোনে। ছুতোর ওকে দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে থামছিল আর রেগে গিয়ে চীৎকার করে ওকে ডাকছিল। একবার সে ওর শেয়ালের মতো কানটা ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে থেমে থেমে বললে, 'তুই মর্! কলেরা হয়ে মর্!'

খদ্দেরদের সঙ্গে দেখা করে লুকা আলেক্সান্দ্রিচ গেল বোনের বাড়িতে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সেখানেও পান-ভোজন হল। তারপর বোনের বাড়ি থেকে এক জানাশোনা দপ্তরীর কাছে; দপ্তরীর কাছ থেকে আবার সরাইখানা; সরাইখানা থেকে তার কুটুমের কাছে। এক কথায় কাশ্তান্কা যখন অচেনা ফুটপাতটায় এসে পড়ল তখন সন্ধে হয়ে গেছে, বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়েছে ছুতোর। হাত পা ছুঁড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বিড়বিড় করে বকছিল:

'গর্ভধারিণী, জন্ম দিলি গো পাপে! কত পাপ গো! এইতো, এখন আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি; আলোগুলোকে দেখছি! কিন্তু যেই মরব... নরকের আগুনে পুড়তে থাকব...'

কখনো আবার খোশমেজাজে কাশ্তান্কাকে কাছে ডেকে নিয়ে সে বলছিল:

'তুই কাশ্তান্কা, নেহাতই একটা পোকা, আর কিছু তো নোস্! কিন্তু মানুষের সঙ্গে তোর তফাৎ কী, যেমন ছুতোরের সঙ্গে কাঠের মিস্ত্রির...'

এমনি করে সে যখন কাশ্তান্কার সঙ্গে আলাপ করছে তখন হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। কাশ্তান্কা তাকিয়ে দ্যাখে রাস্তা দিয়ে একদল সেপাই ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বাজনার চোটে ওর মেজাজ গেল বিগড়ে, সহ্য করতে না পেরে ছুটোছুটি করে উঁ-উঁ করতে লাগল। অথচ ভারী তাজ্জব হয়ে দেখল ছুতোর কিন্তু ঘাবড়েও যাচ্ছে না, 'ঘেউঘেউ'ও করছে না। খালি একগাল হেসে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ আঙুল টুপিতে ঠেকিয়ে সে সেলাম ঠুকছে। মনিব আপত্তি করছে না দেখে কাশ্তান্কা আরো জোরে জোরে উঁ-উঁ করতে লাগল, আর সব কিছু ভুলে গিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটল উল্টো দিকের ফুটপাতে।

ওর যখন চৈতন্য হলো, তখন বাজনাও বাজছে না, সেপাইয়ের দলও আর নেই। আবার রাস্তার মধ্য দিয়ে ছুটে এল ও সেই জায়গায়—ঠিক যেখানে মনিবকে ও ছেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু হায় কপাল, কোথায় ছুতোর? ও একবার সামনে ছোটে, একবার পেছনে, আবার দৌড়োয় রাস্তার মধ্য দিয়ে—কিন্তু ছুতোর যেন মাটির মধ্যে হঠাৎ তলিয়ে গেছে!.. কাশ্তান্কা ফুটপাত শুঁকতে শুরু করে দিল—পায়ের গন্ধে যদি মনিবকে খুঁজে পায় এই আশায়। কিন্তু একটু আগেই কোন পাজী নতুন রবারের জুতো পায়ে চলে গেছে আর রবারের উৎকট গন্ধে সমস্ত হাল্কা গন্ধটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই এখন কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব।

কাশ্তান্কা সামনে পেছনে ছুটোছুটি করে, কিন্তু মনিবকে আর খুঁজে পায় না। ওদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। রাস্তার দুপাশে আলো জ্বলে ওঠে। বাড়িগুলোর জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায় বাতির আলো। খুব ঘন হয়ে পেঁজা বরফ পড়তে থাকে; রাস্তা আর ঘোড়াদের পিঠ আর কোচোয়ানদের টুপি সাদা হয়ে উঠতে থাকে বরফে। আকাশে আঁধার যতই ঘনিয়ে আসছে

ততই সব জিনিস সাদা হয়ে উঠছে। কাশ্‌তান্‌কার দৃষ্টি আড়াল করে, তাকে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে অচেনা সব 'খদ্দেররা' কেবলি আসছিল আর যাচ্ছিল। (দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে দুটো খুব অসমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল কাশ্‌তান্‌কা: এক হল মনিব, আর হল খদ্দের; দুদলের মধ্যে মোদ্দা তফাৎ হল — ওকে ঠ্যাঙানোর অধিকার ছিল প্রথম দলের, আর ওর ছিল দ্বিতীয় দলের ঠ্যাঙ কামড়ে ধরার অধিকার)। খদ্দেররা তাড়াহুড়ো করে কোথায় যে যাচ্ছে। ওর দিকে কেউ নজরই দেয় না।

যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন ভয় আর হতাশা কাশ্‌তান্‌কাকে পেয়ে বসল। একটা দেউড়ির কাছে গিয়ে ও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। লুকা আলেক্সান্দ্রিচের সঙ্গে সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ও কাবু হয়ে পড়েছিল; কান আর পা জমে গেছে ঠাণ্ডায়, তার ওপর আবার ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। সারাদিনে মাত্র বার দুয়েক ও দাঁতে কাটতে পেরেছে: দপ্তরীর ওখানে খেয়েছিল খানিকটা লেই আর এক সরাইখানায় পেয়েছিল খানিকটা সসেজের খোসা — ব্যস ঐটুকুই। ও যদি মানুষ হত তবে নির্ঘাত ভাবত:

'নাঃ, এমনি করে তো বাঁচা যায় না! এর চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভাল!'

২

রহস্যময় অচেনা লোক

কিন্তু ও কিছুই ভাবছিল না, কাঁদছিল শুধু। যখন ঘন নরম বরফে ওর সারা পিঠ, মাথা লেপটে গেছে আর ক্লান্তিতে গাঢ় ঘুমের মধ্যে ও ডুবে যাচ্ছে তখন হঠাৎ দেউড়ির দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওর গায়ে এসে লাগল। লাফিয়ে উঠল ও। 'খদ্দের' শ্রেণীর একজন লোক খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। কাশ্‌তান্‌কা কেঁউকেঁউ করে তার পায়ের নিচে গিয়ে পড়তে সে ওর দিকে আর লক্ষ্য না করে পারল না। ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল:

'কুকুর, তুই কোত্থেকে রে? মাড়িয়ে দিলাম নাকি? আহা বেচারা... যাকগে, যাকগে, রাগ করিস না... আমারই দোষ।'

চোখের পাতার ওপর ঝুলে-পড়া বরফের ফাঁক দিয়ে কাশ্‌তান্‌কা অচেনা লোকটির দিকে তাকাল — দেখল ওর সামনে একজন বেঁটে, মোটা, দাড়ি-কামানো গোলগাল মুখওয়ালা লোক, মাথায় একটা চোঙাটুপি আর গায়ে বোতাম-খোলা ফারকোট।

হাত দিয়ে ওর পিঠ থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলে চলল, 'কুঁইকুঁই করছিস কেন? তোর মনিব কোথায়? নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছিস! আহা বেচারা! তাহলে কি করা যায়?'

অচেনা লোকটির গলায় একটা উষ্ণ আন্তরিকতার সুর ধরতে পেরে কাশ্‌তান্‌কা তার হাত চাটতে লাগল আর করুণভাবে কুঁইকুঁই করতে লাগল।

অচেনা লোকটি বলল, 'আরে, তুই বেশ ভালো তো, মজার দেখতে! ঠিক শেয়ালের মতো! তা কী আর করা যাবে, আমার সঙ্গেই চলে আয়! কাজেও লেগে যেতে পারিস। নে... চ্চু-চ্চু-চ্চু!'

ঠোঁট দিয়ে শব্দ করল লোকটা। হাত নেড়ে ইশারা করল। সে ইশারার একমাত্র মানে হতে পারে—'চল্ চল্!' কাশ্তান্কাও চলল।

আধঘণ্টার বেশি হবে না, কাশ্তান্কা ততক্ষণে একটা মস্ত আলো-ঝলমল ঘরের মেঝের উপর মাথাটা একদিকে কাত করে বসেছে আর আদুরে আদুরে ভাব করে আগ্রহের সঙ্গে অচেনা লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি তখন টেবিলে বসে রাতের খাবার খাচ্ছে। খাচ্ছিল আর ওর দিকে এক আধটুকরো খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল... প্রথমে সে ওকে দিল রুটি আর পনীরের ওপরের সবুজ পিঠ, তারপর দিল একটুকরো মাংস, আধটুকরো পিঠে, মুরগির হাড়; কিন্তু খিদের চোটে এ-সব ও এত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল যে স্বাদ বোঝার মত সময়ই পেল না। আর যতই খেতে লাগল ততই বেশি করে খিদে পেতে লাগল।

প্রচণ্ড লোভে, না-চিবুনো টুকরোগুলো ও যেভাবে গিলছিল তা দেখে অচেনা লোকটি বলল:

'তোর মনিবরা তো দেখছি তোকে খুবই খারাপ খাওয়ায়! তুই কি রোগা-পটকা রে! হাড্ডি-চামড়া সার...'

কাশ্তান্কা খেল প্রচুর, কিন্তু তবু ওর পেট ভরে খাওয়া হল না; শুধু কেমন একটা নেশা এসে গেল। খাওয়ার পরে ও ঘরের মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল, পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আর বেশ একটা গা ছেড়ে-দেওয়া আমেজে লেজ নাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে ওর নতুন মনিব একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লেগে গেছে; লেজ নাড়তে নাড়তে ও ভাবতে লাগল — কোনটা ভাল? এই অচেনা লোকটির কাছে, না ছুতোর-মিস্ত্রির কাছে? অচেনা এই লোকটির ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম, দেখতেও মোটেই সুন্দর নয়; কয়েকটি ইজিচেয়ার, সোফা, বাতি আর গালিচা ছাড়া তার আর কিছুই নেই। ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিন্তু ছুতোর-মিস্ত্রির ওখানে সারা ফ্ল্যাট একদম জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি: কাঠের কাজের টেবিল, এমনি টেবিল, একগাদা কাঠের ছিল্‌কে, রেঁদা, বাটালি, নানা রকমের করাত, পাখির খাঁচা, গামলা, আরো কত কি। অচেনা লোকটির এখানে কোন গন্ধই পাওয়া যায় না, কিন্তু মিস্ত্রির ফ্ল্যাটে কুয়াশা তো সারাক্ষণ লেগেই থাকে আর লেই, বার্নিশ, কাঠের চাঁছির গন্ধে ভুরভুর করে। অন্যদিকে অচেনা লোকটির কাছে একটা মস্ত সুবিধে আছে — প্রচুর খেতে দেয়। তাছাড়া একটা ন্যায্য কথাও বলা উচিত: যখন কাশ্তান্কা টেবিলের সামনে বসেছিল আর আদুরে আদুরে ভাব করে তার দিকে তাকাচ্ছিল সে তখন একবারও ওকে মারে নি, পা দিয়ে ঠেলে নি, একবারও চেঁচিয়ে বলে নি, 'ভাগ্ এখান থেকে, হ্যাংলা কোথাকার!'

চুরুট খেয়ে নতুন মনিব বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ছোট্ট একটা তোষক হাতে করে সে ফিরে এল। সোফার কাছে এককোণে তোষকখানা পেতে দিয়ে সে বলল:

'ওরে, এই কুকুরটা, এখানে আয়। এখানে শুয়ে থাক। ঘুমো।'

তারপর সে বাতি নিভিয়ে চলে গেল। কাশ্‌তান্‌কা তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল। রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছিল কুকুরের ডাক। ওর ইচ্ছে হল নিজেও সাড়া দেয়, কিন্তু হঠাৎ কি জানি কেন ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। লুকা আলেক্সান্দ্রিচ আর তার ছেলে ফেদ্যুশ্‌কাকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল মিস্ত্রির টেবিলের নিচে আরামের জায়গাটাকেও... ওর মনে পড়ল, শীতের সুদীর্ঘ সন্ধ্যাগুলোতে ছুতোর যখন কাঠ পালিশ করত অথবা জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ত তখন ফেদ্যুশ্‌কা সাধারণত ওর সঙ্গে খেলা করত... সে ওকে পেছনের পা ধরে টেনে বের করে আনত মিস্ত্রির টেবিলের তলা থেকে আর ওর সঙ্গে এমন সব কসরৎ করত যে চোখে একদম সর্ষেফুল দেখত কাশ্‌তান্‌কা। সমস্ত গাঁটে গাঁটে ব্যথা ধরে যেত। ছেলেটা ওকে জোর করে পেছনের পায়ে হাঁটাত, ওকে দিয়ে 'ঘণ্টা বানাত' — মানে প্রচণ্ড টানত লেজ ধরে আর ও কেঁউকেঁউ ঘেউঘেউ করতে থাকত; ওকে শুঁকতে দিত নস্যি... সবচেয়ে যন্ত্রণার ছিল এর পরের কসরৎটা: একটুকরো মাংসের সঙ্গে সুতো বেঁধে খেতে দিত কাশ্‌তান্‌কাকে, ও যখন মাংসটা গিলে ফেলত তখন সে হো-হো করে হাসতে হাসতে সেটাকে সুতো ধরে টেনে বের করত ওর পেটের ভেতর থেকে। যতই স্পষ্ট হয়ে এসব কথা মনে পড়ে, ততই কাশ্‌তান্‌কা করুণ সুরে গোঙাতে থাকে।

কিন্তু একটু বাদে ক্লান্তি আর গরমে ওর বিমর্ষতা চাপা পড়ে যায়... ও ঘুমোতে শুরু করে। স্বপ্ন দ্যাখে, কতগুলো কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে একটা বুড়ো ঝাঁকড়া লোমওয়ালা পুড্‌ল্‌ কুকুরও আছে। আজই ও কুকুরটাকে দেখেছিল রাস্তায় — চোখে সাদা ছিট আর নাকের কাছে ঝাঁকড়া লোম। ফেদ্যুশ্‌কা একটা বাটালি হাতে পুড্‌ল্‌টার পেছনে তাড়া করে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ ওর নিজেরই যেন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম গজিয়ে উঠল। মনের আনন্দে ঘেউঘেউ করতে করতে সে কাশ্‌তান্‌কার কাছে হাজির হল। কাশ্‌তান্‌কা আর সে বন্ধুর মতো শোঁকাশুঁকি করে ছুটল রাস্তা ধরে...

৩

মজাদার মোলাকাত

কাশ্‌তান্‌কার যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে, রাস্তা থেকে ভেসে আসছে এমন গোলমাল — শুধু দিনের বেলাতেই যা শোনা যায়। ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীটিও নেই। কাশ্‌তান্‌কা আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল, তারপর রেগে গিয়ে, মন খারাপ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আসবাবপত্র আর কোণগুলো শুঁকে শুঁকে ও উঁকি দিল হলের মধ্যে, কিন্তু আকর্ষণীয় কিছুই দেখতে পেল না। হলে ঢুকবার দোর ছাড়াও আরেকটা দোর ছিল। ভেবেচিন্তে কাশ্‌তান্‌কা ওর দু'পা দিয়েই আঁচড়ে আঁচড়ে সেটা খুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে

বিছানার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল খদ্দেরটা। কাশ্‌তান্‌কা চিনতে পারল, কালকের সেই অচেনা লোকটাই বটে।

'গর্‌-র্‌-র্‌...' গুমবে ওঠল ও, কিন্তু কালকের রাতের খাওয়াটা মনে পড়ায় লেজ নেড়ে শুধু করে দিল শুঁকতে।

অচেনা লোকটির জামাকাপড় আর জুতো শুঁকে ও দেখল এগুলোর মধ্যে বেজায় ঘোড়ার গন্ধ। শোবার ঘর থেকে বেরোবার আরো একটা দরজা আছে, কিন্তু সেটাও বন্ধ। কাশ্‌তান্‌কা দোরটাকে আঁচড়াতে লাগল, ঠেলতে লাগল বুক দিয়ে, তারপর খুলে ফেলল। তক্ষুনি একটা অদ্ভুত সন্দেহজনক গন্ধ তার নাকে ঢুকল। আশংকা হল বিচ্ছিরি রকমের কাউকে সে দেখতে পাবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকে গরগর করতে করতে কাশ্‌তান্‌কা একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়ল। দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ঘরটায় ঢুকে পড়েই কাশ্‌তান্‌কা ভয়ে ভয়ে পেছিয়ে এল। অপ্রত্যাশিত ও ভয়ংকর কী একটা দেখল সে। মাটির দিকে ঘাড় মাথা গুঁজে, ডানা ছড়িয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে সোজা ওর দিকে ছুটে এল একটা খয়েরি রংয়ের হাঁস। তার কাছ থেকে একটু দূরে একটা ছোট্ট তোষকের ওপর শুয়েছিল একটা সাদা বেড়াল; কাশ্‌তান্‌কাকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, পিঠখানা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে, লেজ গুটিয়ে, লোম খাড়া করে সেও ফোঁস ফোঁস করে উঠল। কুকুরটা কম ভয় পায় নি, তবু সেটা চাপা দেবার জন্য ঘেউঘেউ করে তেড়ে গেল বেড়ালটাকে। বেড়ালটা আরো জোরে পিঠ বাঁকিয়ে, ধাঁ করে কাশ্‌তান্‌কার মাথায় বসিয়ে দিল এক থাবা। কাশ্‌তান্‌কা পেছিয়ে এল, চার পায়ের উপর বসে, বেড়ালের দিকে নাকটা এগিয়ে দিয়ে জোরে জোরে কান-ফাটানো চীৎকার জুড়ে দিল; এমনি সময়ে হাঁসটা পেছন থেকে এসে ঠোঁট দিয়ে ওর পিঠে মারল এক ঠোক্কর। কাশ্‌তান্‌কা লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল হাঁসটার দিকে...

'এসব কি হচ্ছে?' একটা মোটা রাগী গলা শোনা গেল আর চুরুট মুখে, ড্রেসিং-গাউন গায়ে অচেনা লোকটি এসে ঢুকল ঘরে। 'এ সবের মানে কি? যা! যে যার জায়গায় যা!'

বেড়ালটার কাছে গিয়ে সে তার বেঁকে ওঠা পিঠে এক চড় মেরে বলল:

'ফিওদর তিমোফেইচ্‌, এর মানে কি? ঝগড়া পাকিয়েছিস? বুড়ো পাজী কোথাকার! শুয়ে থাক!'

আর হাঁসটার দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'ইভান ইভানিচ্‌, নিজের জায়গায় যা!'

সুবোধ ছেলের মতো বেড়ালটা গিয়ে তার তোষকের উপর শুয়ে পড়ল আর চোখ বুজল। ওর মুখ আর মোছের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে গরম হয়ে উঠে মারামারি করে ফেলায় ও নিজেই ক্ষুব্ধ। কাশ্‌তান্‌কা অভিমানে কেঁউকেঁউ করছিল আর হাঁসটা গলা বাড়িয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে আবেগ ভরে কি সব যেন বলছিল, কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ কিছু বোঝা গেল না।

হাই তুলতে তুলতে মনিব বলল, 'নে হয়েছে, হয়েছে! বন্ধুভাবে শান্তিতে বসবাস করাই

তো উচিত।' সে কাশ্‌তান্‌কার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে চলল, 'আর তুই, লালচে, ঘাবড়াবি না... এরা খুবই ভাল লোক। কাউকে চটায় না। দাঁড়া-দাঁড়া — তোকে ডাকব কি বলে? নাম ছাড়া তো চলবে না ভাই।'

অচেনা লোকটি একটুখানি ভাবল তারপর বলল:

'এই ধর, তুই হবিগে — মাসি... বুঝলি? মাসি!'

বার কয়েক 'মাসি' কথাটা আউড়ে সে বেরিয়ে চলে গেল।

কাশ্‌তান্‌কা বসে বসে দেখতে শুরু করে। বেড়ালটা তোষকের উপর বসে ঘুমোবার ভান করছে। হাঁসটা গলা বাড়িয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে ঠুকতে আবেগ ভরে প্যাঁকপ্যাঁক করে কী যেন সব বলে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছিল সে একজন খুব পণ্ডিত হাঁস; প্রত্যেকটি লম্বা লম্বা বক্তৃতার শেষে সে হকচকিয়ে এক পা পিছিয়ে এসে ভাব করছিল যেন তার বক্তৃতায় সে খুশি। তার বক্তৃতা শুনে — গর্‌-র্‌-র্‌ করে তাকে কী একটা উত্তর দিয়ে কাশ্‌তান্‌কা কোণগুলো শুঁকতে শুরু করে দিল। এক কোণে একটা ছোট্ট গামলায় ও দেখতে পেল ভিজানো মটর আর ভেজা রুটির খোসা। ও মটর চেখে দেখল — ভাল না! তারপর চাখল রুটির খোসা — খেতে শুরু করল সেগুলো। একটা অচেনা কুকুর তার খাবার খেয়ে ফেলছে এতে কিন্তু হাঁসটি একটুও চটল না, বরং আরো আবেগ দিয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল; ভরসা দেবার জন্য গামলার কাছে গিয়ে কতগুলো মটর খেল।

৪

আজব খেলা

খানিক পরে অচেনা লোকটি আবার ঢুকল। তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত জিনিস। সেটা দেখতে দরজার ফ্রেমের মতো। এবড়োখেবড়ো কাঠের ফ্রেমের উপরের কাঠটা থেকে ঝুলছিল একটা ঘণ্টা আর তাতে বাঁধা ছিল একটা পিস্তল। ঘণ্টার দোলক থেকে আর পিস্তলের ঘোড়া থেকে দুটো দড়ি ঝুলছে।

অচেনা লোকটি ফ্রেমটাকে ঘরের মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন সব বাঁধাবাঁধি করল তারপর হাঁসটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'ইভান ইভানিচ্‌, এগিয়ে আয়!'

হাঁসটা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

অচেনা লোকটি বলল:

'আচ্ছা, একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। সবার আগে সকলকে সেলাম কর! জলদি!'

ইভান ইভানিচ্ গলা বাড়িয়ে, সবদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ভদ্রতা দেখাল।

'বহুৎ আচ্ছা!.. এবারে মর!'

হাঁসটা চিত হয়ে শুয়ে ওপরের দিকে পা উঠিয়ে দিল। এই ধরনের আরো কয়েকটা ছোটখাট কসরৎ দেখাবার পর অচেনা লোকটি হঠাৎ নিজের মাথা চেপে ধরে মুখে খুব ভয় ফুটিয়ে চীৎকার করে উঠল:

'বাঁচাও! আগুন! পুড়ে গেলুম!'

ইভান ইভানিচ্ ফ্রেমের দিকে দৌড়ে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে একটা দড়ি তুলে নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

অচেনা লোকটি খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেল। হাঁসটার গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সে বলল:

'বহুৎ আচ্ছা, ইভান ইভানিচ্! এখন মনে কর্ তুই হলি গিয়ে একজন জহুরী, এই সোনাদানা, হীরে মুক্তো বেচিস। এখন ধর্ — তুই দোকানে গেলি, গিয়ে দেখলি চোর ঢুকেছে। এই অবস্থায় তুই কি করবি?'

হাঁসটা ঠোঁট দিয়ে অন্য দড়িটা তুলে নিয়ে টান মারল। তার ফলে তক্ষুনি একটা কান-ফাটানো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ঘণ্টা বাজানোটা কাশ্তান্কার খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু গুলি ছোঁড়াতে সে এত মেতে গেল যে ছোট্ট ফ্রেমটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঘেউঘেউ করতে লাগল।

অচেনা লোকটি চীৎকার করে উঠল:

'মাসি! নিজের জায়গায় যা, চুপ করে থাক!'

গুলি ছুঁড়েই ইভান ইভানিচের কাজ ফুরোল না। তারপর পুরো একঘণ্টা ধরে অচেনা লোকটি ওকে দড়ি বেঁধে চাবুকের আওয়াজ করে তার চারদিকে দৌড় করাল। তার ওপর হাঁসটিকে আবার বেড়া ডিঙোতে হল, আংটার মধ্য দিয়ে গলে যেতে হল, খাড়া হতে হল, মানে লেজের উপর বসে দু'পা নাড়াতে হল। কাশ্তান্কা ইভান ইভানিচের ওপর থেকে একবারও চোখ ফেরায় নি, উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠেছে, মাঝে মাঝে তার পেছনে ঘেউঘেউ করে ছুটে গিয়েছে। হাঁসের সঙ্গে নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে অচেনা লোকটি কপাল থেকে ঘাম মুছে চেঁচিয়ে ডাকল:

'মারিয়া! খাভ্রোনিয়া ইভানোভ্নাকে এখানে নিয়ে এসো!'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ঘোঁৎঘোঁতানি শোনা গেল... কাশ্তান্কা গরগর করে উঠল, ভাব করলে যেন মোটেই ভয় পাচ্ছে না, তাহলেও কী হয় বলা যায় না ভেবে কাছিয়ে গেল অচেনা লোকটির দিকে। দোর খুলে গেল আর কী সব বকতে বকতে উঁকি দিল একটা বুড়ি, ঢুকিয়ে দিল কালো মতো খুবই বদখত একটা শুয়োর। কাশ্তান্কার গোঙানির দিকে কোন নজর না দিয়ে শুয়োরটা মুখ তুলে আনন্দে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছিল তার মনিবকে আর ইভান

ইভানিচ আর বেড়ালটাকে দেখে সে ভারী খুশি হয়েছে। যখন সে বেড়ালটার কাছে গিয়ে তার পেটের তলায় একটুখানি ধাক্কা মারল আর হাঁসের সঙ্গে কী সব কথা বলল তখন তার নড়াচড়ায়, গলার স্বরে, লেজ নাড়ায় বেশ একটা ভালো মানুষির ভাব ফুটে উঠল। কাশ্‌তান্‌কা বুঝতে পারল যে এরকম একজন লোকের পেছনে গরগর করার কোন দরকার নেই।

মনিব ফ্রেমটা সরিয়ে দিল, চেঁচিয়ে ডাকল:

'ফিওদর তিমোফেইচ্‌, এগিয়ে আয়!'

বেড়ালটা উঠে দাঁড়াল, আড়িমুড়ি ভাঙল, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে যেন দয়া করছে এমনিভাবে এগিয়ে গেল শুয়োরটার কাছে।

মনিব শুরু করল:

'আ-চ্ছা, তাহলে মিশরের পিরামিড দিয়েই আরম্ভ করা যাক!'

অনেকক্ষণ ধরে সে কী সব বোঝাল, তারপর হুকুম দিল:

'এক... দুই... তিন!'

'তিন' বলতেই ইভান ইভানিচ্‌ ডানা নেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল শুয়োরের পিঠে। যখন সে ডানা আর গলা দিয়ে টাল সামলে শুয়োরের খোঁচা খোঁচা পিঠের উপর ঠিকঠাক হয়ে বসেছে তখন ফিওদর তিমোফেইচ্‌ কুঁড়ের মতো হেলাফেলা করে শুয়োরের পিঠ বেয়ে উঠে পড়ল, — ভাবখানা যেন নিজের এই বিদ্যায় তার বড়োই অবহেলা, কিছুই তার এসে যায় না; তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁসটার পিঠে চড়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অচেনা লোকটি যাকে 'মিশরের পিরামিড' বলছিল তা করা হয়ে গেল। কাশ্‌তান্‌কা উত্তেজনার চোটে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু এই সময় বুড়ো বেড়ালটা হাই তুলতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে হাঁসের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। ইভান ইভানিচও কাত হয়ে পড়ে গেল। অচেনা লোকটি চীৎকার করে শাসিয়ে উঠল আর আবার কী সব বোঝাতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পিরামিড নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর ক্লান্তিহীন মনিব ইভান ইভানিচকে বেড়ালের উপর চড়তে শেখাল, তারপর শুরু করল বেড়ালকে সিগারেট খাওয়াতে, — চলল এমনি করে।

সব শেখানো শেষ হবার পরে তবেই মনিব কপাল থেকে ঘাম মুছে বেরিয়ে গেল, আর ফিওদর তিমোফেইচ্‌ বিরক্ত হয়ে গরগর করতে করতে গিয়ে তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল আর ইভান ইভানিচ্‌ এগিয়ে গেল খাবারের গামলার দিকে, শুয়োরটাকে বের করে নিয়ে গেল সেই বুড়িটা।

নতুন সব অভিজ্ঞতার দৌলতে দিনটা কাশ্‌তান্‌কার কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল আর সন্ধ্যা বেলা ওকে তোষক সমেত দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ছোট্ট ঘরটাতেই নিয়ে আসা হল। তারপর রাত কাটাল ও ফিওদর তিমোফেইচ্‌ আর হাঁসটার সঙ্গে।

৫

বাহাদ্বর! বাহাদ্বর!

কাটল একমাস।

প্রতি সন্ধ্যায় চমৎকার খাওয়া আর 'মাসি' নামে ডাকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল কাশ্‌তান্‌কা। সেই অচেনা লোকটির সঙ্গে আর ওর ঘরের নতুন সাথীদের সঙ্গে থাকতেও কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না ওর। জীবন কাটছিল একদম নির্ঝঞ্ঝাটে।

প্রত্যেকটি দিন শুরু হত একইভাবে। সাধারণত ইভান ইভানিচ্‌ই ঘুম থেকে উঠত সকলের আগে। তারপর সে এগিয়ে যেত, হয় বেড়ালটার কাছে, নয়তো মাসির কাছে, আর গলাটাকে বে'কিয়ে নিয়ে আবেগ ভরে যুক্তি দিয়ে কী সব বলত, কিন্তু আগের মতোই তা কিছু বোঝা যেত না। মাঝে মাঝে মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে সে লম্বা স্বগতোক্তি করে যেত। যেদিন ওদের প্রথম পরিচয় হয় সেদিন কাশ্‌তান্‌কা ভেবেছিল, সে অত বেশি বকে কারণ সে খুব পণ্ডিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার ওপর ওর সব শ্রদ্ধা উবে গেল। এর পর সে যখন তার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে যেত তখন ও আর মোটেই লেজ নাড়ত না। বরং সকলের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বিরক্তিকর বাচাল বলে তাকে উপেক্ষা করত। কোনো রকম ভদ্রতা না করে খে'কিয়ে উঠত, 'গর্‌-র্‌-র্‌!'

ফিওদর তিমোফেইচ্‌ ছিল অন্য একরকমের ভদ্রলোক। ঘুম থেকে জেগে উঠে সে টুঁ শব্দটিও করত না, নড়ত না, এমন কি চোখটি পর্যন্ত খুলত না। পারলে সে ঘুম থেকেই উঠত না। কেননা দেখাই যেত যে বে'চে থাকা নিয়ে তার তেমন ভাবনাচিন্তা নেই। কোনকিছুর দিকেই তার টান নেই। সব কিছুতেই তার আলস্য, হেলাফেলা। এমন কি অমন চমৎকার খাওয়া খেয়েও সে বিরক্তিতে ফ্যাচ করে উঠত। ঘুম থেকে উঠেই কাশ্‌তান্‌কা ঘরের চারদিকে ঘুরে কোণগুলো শু'কতে শুরু করে দিত। ওকে আর বেড়ালটাকেই শুধু সমস্ত ফ্ল্যাটময় ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হত। নোংরা কাগজ-সাঁটা ঘরটার চৌহদ্দি পার হয়ে যাওয়ার অধিকার হাঁসটার ছিল না, আর খাভ্‌রোনিয়া ইভানোভ্‌না তো উঠোনের মধ্যে কোথায় যেন এক চালার নিচে থাকত, হাজির হত একমাত্র খেলা শেখানোর সময়। মনিবের ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হত; তারপর চা-টা খেয়ে সে শুরু করত তার কসরৎ। প্রতিদিনই সেই কাঠের ফ্রেম, চাবুক, আংটা ইত্যাদি নিয়ে আসা হত। আর রোজই পুনরাবৃত্তি হত প্রায় সেই একই জিনিসের। শেখানো চলত তিন-চার ঘণ্টা ধরে, ফলে ফিওদর তিমোফেইচ্‌ মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে মাতালের মতো টলত আর ইভান ইভানিচ্‌ ঠোঁট ফাঁক করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলত। মনিব লাল হয়ে উঠত, মুছে মুছেও কপাল থেকে তার আর ঘাম যেত না।

খাওয়া-দাওয়া আর খেলা শেখাতে দিনটা মজাতেই কাটত, কিন্তু সন্ধ্যাটাই বড় বিরক্তিকর হয়ে পড়ত। সন্ধ্যার দিকে মনিব সাধারণত বেড়াল আর হাঁসটাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যেত।

একা একা তোষকের উপর পড়ে থেকে থেকে কাশ্‌তান্‌কার মনটা খারাপ হয়ে যেত... ঘরের অন্ধকারের মতো কোথা থেকে অলক্ষ্যে একটা বিমর্ষতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যেন তাকে গ্রাস করে ফেলত। প্রথমটা কুকুরটার খাওয়ার কিংবা ঘেউঘেউ করার কিংবা ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করার সমস্ত ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যেত। এমন কি চোখ মেলতে পর্যন্ত ইচ্ছে করত না। তারপর ওর কল্পনায় ভেসে উঠত দুটি অস্পষ্ট মূর্তি — হয়ত বা কুকুর, হয়ত বা মানুষ, — সুন্দর, মিষ্টি চেহারা, কিন্তু কেমন বোঝা মুশকিল। মূর্তি দুটো আসতেই লেজ নাড়ত সে। ওর মনে হত কোথায় যেন, কখন যেন তাদের ও দেখেছিল, ভালবেসেছিল... আর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে হত লেই, বার্নিশ আর কাঠচাঁছির গন্ধ যেন পাওয়া যায় এই মূর্তি দুটো থেকে।

নতুন জীবনে যখন ও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর একটা রোগা হাড্ডি-সার দো-আঁশলা থেকে ও যখন একটা হৃষ্টপুষ্ট, যত্নলালিত কুকুরে পরিণত হয়েছে, তখন একদিন খেলা শেখানোর আগে মনিব ওকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে বলল:

'এবার কাজকর্মে মন লাগানোর সময় হয়েছে রে মাসি! যথেষ্ট, যথেষ্ট বগল বাজিয়েছিস! আমি তোকে শিল্পী করে গড়ে তুলতে চাই... শিল্পী হবি?'

তারপর সে তাকে তালিম দিতে লাগল নানারকম বিদ্যায়। প্রথম পাঠেই ও পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শিখে গেল। এতে ওর ভীষণ আনন্দ হত। দ্বিতীয় পাঠে ওকে পেছনের পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছিনিয়ে নিতে হল একটুকরো মিছরি, মনিব সেটা ওর মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখত উঁচু করে। এর পরের পাঠগুলোতে ও নাচল, চক্কর দিয়ে দৌড়ে বেড়াল, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে উঁ-উঁ করল, ঘণ্টা বাজাল, গুলি ছুঁড়ল। আর মাসখানেক বাদেই ও বেশ ভালভাবেই ফিওদর তিমোফেইচের জায়গা নিতে পারল 'মিশরের পিরামিড'এ। ও আগ্রহ করেই শিখত আর পেরেছে বলে নিজেই খুশি হত। জিভ বার করে চক্কর দিয়ে ছুট, আংটার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে আর বুড়ো ফিওদর তিমোফেইচের পিঠের উপর চড়ে ও খুব আনন্দ পেত। একেকটা কসরৎ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মহা উৎসাহে ও ঘেউঘেউ করে উঠত আর গুরুও অবাক হয়ে ভারি খুশি হয়ে হাত কচলাত। বলত:

'বাহাদুর! বাহাদুর তুই! নির্ঘাত খেল দেখাবি!'

'বাহাদুর' কথাটা শুনে শুনে মাসির এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে মনিব কথাটা বলতেই ও লাফিয়ে উঠে এমনভাবে তাকাত যেন ওটা ওর ডাক নাম আর কি!

৬

অস্বস্তিকর রাত

মাসি স্বপ্ন দেখছিল যেন জমাদার ওকে ঝাঁটা হাতে তাড়া করছে। ভয়ে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ছোট্ট ঘরখানা চুপচাপ, অন্ধকার, গুমোট। পোকা কামড়াচ্ছে। আগে মাসির কখনো অন্ধকারে ভয় হত না। এখন কিন্তু ওর কেন যেন ছমছম করতে লাগল। ইচ্ছে হল চীৎকার করে। পাশের ঘরে মনিবের সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল; তারপর কিছু পরে শুয়োরটা ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল চালার নিচে; তারপর আবার সব চুপচাপ। খাওয়ার কথা ভাবলেই মনটা কেমন হালকা হয়; তাই মাসিও ভাবতে শুরু করে দিল কেমন করে আজ ও ফিওদর তিমোফেইচের কাছ থেকে মুরগির ঠ্যাং চুরি করে এনে সেটাকে বসবার ঘরের আলমারি আর দেওয়ালের ফাঁকে একগাদা ধুলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। একবার গিয়ে দেখলে হয় ঠ্যাংটা আস্ত আছে কিনা। খুব সম্ভব মনিব ওটা দেখে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু সকালের আগে ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ — এই ছিল নিয়ম। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মাসি চোখ বুজল, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে ওর জানা ছিল যে যত তাড়াতাড়ি ঘুমুবে তত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ ওর ধারেকাছেই এমন একটা অদ্ভুত চীৎকার শোনা গেল যে তাতে ও শিউরে উঠে একেবারে চার-পায়ে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হল। চীৎকারটা করেছিল ইভান ইভানিচ, কিন্তু বরাবরের মতো যুক্তিতর্ক দিয়ে বকবকানি নয়, কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক কান-ফাটানো জংলী চীৎকার, দরজা খোলার সময়কার ক্যাঁচ করে ওঠার মতো। অন্ধকারে কিছু বুঝতে না পেরে আর দেখতে না পেয়ে মাসি আরো ভয় পেয়ে গেল আর গর্জে উঠল:

'গর্-র্-র্-র...'

একটা হাড় কামড়ে খেতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় কাটল, কিন্তু আর চীৎকার হল না। মাসি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল দুটো মস্ত কালো কুকুর, গায়ে তাদের খোঁচা খোঁচা জীর্ণলোম, একটা বড় গামলা থেকে লোভীর মতো বাসন-ধোয়া জল খাচ্ছে। গামলাটা থেকে বেশ সুগন্ধ বেরুচ্ছে আর সাদা ধোঁয়া উঠছে। মাঝে মাঝেই তারা মাসির দিকে তাকাচ্ছে আর দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠছে, 'আমরা তোকে দেব না!' কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে ফার কোট গায়ে একজন চাষী বেরিয়ে এসে চাবুক মেরে ভাগিয়ে দিল; তখন মাসি গামলার কাছে গিয়ে খেতে শুরু করল; কিন্তু যেই না চাষী দরজার বাইরে গেছে, অমনি দুটো কালো কুকুরই ঘেউঘেউ করে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর হঠাৎ আবার শোনা গেল সেই কান-ফাটানো চীৎকার।

'প্যাক... প্যাক... প্যাক!..' চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইভানিচ।

জেগে গেল মাসি, লাফিয়ে উঠল, কিন্তু তোষক না ছেড়েই ঘেউঘেউ করে ডেকে উঠল একটানা

ডাক। ওর যেন মনে হতে লাগল — ইভান ইভানিচ না, চেঁচাচ্ছে অন্য কেউ, বাইরের কেউ। আবার কেন যেন চালার নিচে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল শুয়োরটা।

কিন্তু তারপরই জুতোর খস্‌খসানি শোনা গেল, ড্রেসিং গাউন গায়ে, মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল মনিব।

ঝিকমিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল দেওয়ালের নোংরা কাগজ আর ছাদের গায়ে, তাড়িয়ে দিল অন্ধকার। মাসি দেখল ঘরের মধ্যে বাইরের কেউ নেই। মেঝের উপর বসে আছে ইভান ইভানিচ্, ঘুমোয় নি সে। তার ডানা দুটো নেতিয়ে পড়েছে, ঠোঁটটা হাঁ করা, মোটকথা তাকে দেখতে এমন লাগছিল যেন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর জল খেতে চাইছে। বুড়ো ফিওদর তিমোফেইচ্‌ও ঘুমোয় নি। সেও নিশ্চয়ই চীৎকারের চোটে জেগে গিয়েছিল।

মনিব হাঁসটাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোর, ইভান ইভানিচ? চীৎকার করছিস কেন? অসুখ করেছে?'

হাঁসটা চুপচাপ। মনিব তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে, পিঠে আদর করে বলল:

'তুই একটা খ্যাপা! নিজেও ঘুমুবি না, অন্যকেও ঘুমুতে দিবি না।'

মনিব যখন তার আলো নিয়ে বেরিয়ে গেল তখন আবার ঘনিয়ে এল অন্ধকার। মাসির ভয় ধরে গেল। হাঁসটা অবশ্য আর চীৎকার করছিল না। কিন্তু ফের ধারণা হল অন্ধকারে যেন বাইরের কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার এই বাইরের কাউকে কামড়ানোও মুশকিল, কারণ তাকে দেখা যাচ্ছে না, কোনো আকারও তার নেই। কেন যেন ওর মনে হল যে আজ রাতে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে। ফিওদর তিমোফেইচ্‌ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কেমন করে সে তার তোষকের উপর ছটফট করছে, হাই তুলছে আর মাথা নাড়ছে তা কানে গেল মাসির।

বাইরে — কোথায় যেন ঘা পড়ল ফটকে; চালার নিচে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল শুয়োরটা। মাসি কুঁইকুঁই করে সামনের পা ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজল। দরজার খট্‌খটানি, কেন জানি না-ঘুমনো শুয়োরটার ঘোঁৎঘোঁৎ আর এই নিঝুম অন্ধকারে ওর ভয়ংকর আর অসহ্য লাগছিল, হাঁসটার চীৎকারের মতোই ভয়ংকর। সবকিছুই সশঙ্ক অস্থির, কিন্তু কেন? অদৃশ্য ওটা কে? ঐ যে ওখানে মাসির কাছেই দুটো সবুজ ফুলকি জ্বলে উঠল। চেনাশোনার পর এই সর্বপ্রথম ওর কাছে এগিয়ে এল ফিওদর তিমোফেইচ্। কি তার দরকার? সে কেন এল? জিজ্ঞেস না করেই মাসি ওর থাবাটা চাটল, তারপর অন্যরকম গলায় মৃদু উঁ-উঁ করে উঠল।

'ক্যা-ক... ক্যা-ক!' চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইভানিচ, 'ক্যা-ক!..'

আবার খুলে গেল দরজা, মনিব ঢুকল আলো নিয়ে। আগের মতোই বসে ছিল হাঁসটা, ঠোঁটটা খোলা, এলিয়ে পড়া ডানা। চোখ দুটো বোজা।

মনিব ডাকল, 'ইভান ইভানিচ্!'

হাঁসটা নড়ল না। মনিব বসে পড়ল তার সামনে মেঝের উপরে, চুপচাপ দেখল তাকে খানিকক্ষণ, তারপর বলল:

'ইভান ইভানিচ্! হল কী? মরে যাচ্ছিস নাকি? ওহ্! এখন মনে পড়ল!' সে চেঁচিয়ে উঠল, চেপে ধরল নিজের মাথা। 'জানি কেন এমন হয়েছে! আজ যে তোকে ঘোড়াটা মাড়িয়ে দিয়েছিল! হা ভগবান! হা ভগবান!'

মনিব কী বলছে তা মাসি বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝল যে সেও একটা ভয়ঙ্কর কিছুর আশঙ্কা করছে। অন্ধকার জানালার দিকে নাকটা এগিয়ে দিয়ে ও আওয়াজ করে উঠল; ওর মনে হল ওটার ভেতর দিয়ে অন্য কে আরেকটা যেন উঁকি মারছে।

হতাশার ভঙ্গিতে দুহাত উলটে মনিব বলে উঠল, 'ও মরে যাচ্ছে রে মাসি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরে যাচ্ছে! তোদের এই ঘরে মরণ ঢুকেছে। কী করা যায়?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মাথা নাড়তে নাড়তে, ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মনিব ফিরে গেল তার শোবার ঘরে। অন্ধকারে থাকতে মাসির ভয় হল; সেও চলল তার পিছু পিছু। বিছানায় বসে কেবলই সে বলতে লাগল:

'হে ভগবান! করা যায় কী?'

মাসি তার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল; ও বুঝতে পারছিল না কেন ওর এমন মন খারাপ লাগছে আর কেনই বা সবাই এমন ছটফট করছে, আর তা বোঝার জন্য তার প্রত্যেকটা নড়াচড়া লক্ষ করতে লাগল। ফিওদর তিমোফেইচ্ বড়ো একটা ওঠে না, সেও এবার তার তোষক ছেড়ে মনিবের শোবার ঘরে ঢুকল আর তার পায়ের কাছে গা ঘষতে লাগল। বেড়ালটা মাথা নেড়ে উঠছিল যেন তার দুশ্চিন্তাগুলোই ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছে, আর সন্দিগ্ধভাবে উঁকি দিচ্ছিল বিছানার নিচে।

একটা প্লেট বের করে আনল মনিব; হাত-মুখ ধোয়ার কল থেকে তাতে জল ঢালল। তারপর আবার গেল হাঁসটার কাছে।

প্লেটটা তার সামনে রেখে নরম করে সে বলল:

'খা ইভান ইভানিচ্! খা লক্ষ্মী সোনা।'

ইভান ইভানিচ্ কিন্তু নড়লও না, চোখও খুলল না। মনিব ওর মাথাটা ধরে এগিয়ে দিল প্লেটের দিকে, ঠোঁটটা ডুবিয়ে দিল জলের মধ্যে, হাঁসটা কিন্তু জল খেল না, আরো আলগা হয়ে এলিয়ে পড়ল তার ডানা, মাথাটা অমনিই পড়ে রইল প্লেটের মধ্যে।

'নাঃ, আর কিছু করার নেই!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মনিব, 'সব শেষ! চলে গেল ইভান ইভানিচ!'

তার গালের উপর দিয়ে চিক্‌চিক্ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল — বৃষ্টির সময় শার্সি বেয়ে যেমন পড়ে। কী হয়েছে বুঝতে না পেরেও ফিওদর তিমোফেইচ্ আর মাসি তার কাছে ঘেঁসে এসে সভয়ে তাকিয়ে দেখল হাঁসটাকে।

করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মনিব বললে, 'বেচারা ইভান ইভানিচ্! আমি এদিকে ভাবছিলাম বসন্তকালে তোকে নিয়ে চলে যাব গাঁয়ের বাড়িতে, ঘুরে বেড়াব তোর সঙ্গে সবুজ ঘাসে ঘাসে। আমার আদরের সাথী রে! তুইও ছেড়ে গেলি! তোকে বাদ দিয়ে আমার চলবে কি করে?'

মাসির মনে হল ওরও যেন তাই হবে, ঠিক অমনিভাবে অজানা কী কারণে ওরও চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, পা দুটো ছড়িয়ে পড়ে মুখটা হাঁ হয়ে যাবে আর সবাই ওর দিকেও অমনি ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকবে। বোঝাই যাচ্ছিল ঐ একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল ফিওদর তিমোফেইচেরও মনে। বুড়ো বেড়ালটা আগে কখনো এখনকার মতো এমন মনমরা হাঁড়িমুখ হয় নি।

ভোর হয়ে এল, আর সেই অদৃশ্য ওটা, মাসি যাকে এত ভয় পাচ্ছিল সেও আর রইল না। যখন একদম ফর্সা হয়ে গেছে তখন জমাদার এসে হাঁসটার ঠ্যাং ধরে কোথায় যেন নিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে হাজির হল বুড়িটা, গামলাটা নিয়ে গেল সে-ই।

মাসি বসবার ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে তাকিয়ে দেখল: নাঃ, মনিব মুরগির ঠ্যাংটা খেয়ে ফেলে নি, ওটা ধুলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে জায়গা মতোই আছে। কিন্তু মাসির মন খারাপ লাগছিল, বিরক্তি লাগছিল, কাঁদতে ইচ্ছে করল। ঠ্যাংটা ও শুঁকে পর্যন্ত দেখল না; সোফার নিচে ঢুকে বসে রইল আর করুণ গলায় আস্তে আস্তে কেঁউকেঁউ করতে শুরু করল:

'কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ...'

৭

খেলা ভণ্ডুল

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মনিব দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে হাত ঘষতে ঘষতে বলল:

'তাহলে এবার...'

সে নিশ্চয়ই কিছু একটা বলতে চাইছিল, কিন্তু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তালিম নেওয়ার সময় থেকেই মনিবের মুখ আর গলার স্বরকে মাসি চিনেছিল খুব ভাল করে: ওর মনে হল সে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন তো হয়েছেই, চটেও গিয়েছে। খানিকক্ষণ পরে সে ঘুরে এসে বলল:

'আজ আমি আমার সঙ্গে মাসি আর ফিওদর তিমোফেইচ্‌কে নিয়ে যাব। মাসি, তুই আজকে 'মিশরের পিরামিড'এ স্বর্গীয় ইভান ইভানিচের জায়গা নিবি। কি যে হবে তা শয়তানই জানে! কিছুই তৈরি নেই, অভ্যাস করা হয় নি, মহড়া হয়েছে কম! মুখে চুণকালি পড়বে, নাম ডুববে!'

তারপর সে আবার বেরিয়ে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই চোঙাটুপি আর ফারকোট পরে ঘুরে এল। বেড়ালটার কাছে এসে সে তাকে সামনের ঠ্যাং ধরে তুলে নিয়ে ফারকোটের তলায় বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। ফিওদর তিমোফেইচ্ এতেও খুবই নির্লিপ্ত ভাব দেখাল, এমন কি চেষ্টা করে চোখ দুটোও একবাব খুলল না। কিছুতেই যেন ওর কিছু এসে যায় না, শুয়ে থাকলেই বা কি আর ঠ্যাং ধরে ওকে তুলে নিলেই বা কি; তোষকে পড়ে থাকাই বা কি আর ফারকোটের নিচে মনিবের বুকে থাকাই বা কি — সবই সমান।

মনিব বলল, 'মাসি চল!..'

কিছু না বুঝেই লেজ নাড়তে নাড়তে মাসি তার পেছন পেছন চলল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ও এসে স্লেজ গাড়ির মধ্যে মনিবের পায়ের কাছে বসে পড়ল আর শুনতে লাগল শীতে আর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে কেমন বিড়বিড় করে চলেছে:

'মুখে চুণকালি পড়বে! নাম ডুববে!'

স্লেজখানা এসে দাঁড়াল ওল্টানো কড়াইয়ের মতো মস্ত একটা অদ্ভুত বাড়ির সামনে। তিনটে কাঁচের দরজাওয়ালা এই বাড়ির লম্বা করিডরটা ডজনখানেক উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল। ঝনঝন করে এক একবার দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে আর যেন হাঁ-করে গিলে খাচ্ছে দরজার কাছে জোটা মানুষগুলোকে; লোক অনেক; বারে বারেই করিডরের দিকে এগিয়ে আসছে এক একটা ঘোড়া; কিন্তু কুকুরের দেখা মিলল না।

মনিব মাসিকে ধরে ফারকোটের নিচে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল; ফিওদর তিমোফেইচ্ও ওখানেই ছিল। জায়গাটা গুমোট আর অন্ধকার হলেও বেশ গরম। মুহূর্তের জন্য দুটো আবছা সবুজ আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল, পড়শীর ঠান্ডা শক্ত থাবায় গা লাগতে চোখ মেলল বেড়ালটা। মাসি তার কান চেটে দিল, তারপর সম্ভবত আরেকটু আরামদায়ক জায়গা খুঁজতে গিয়ে ছটফট করে নড়েচড়ে উঠল, ওর ঠান্ডা পায়ের নিচে একদম চেপ্টে দিল বেড়ালটাকে। তারপর দৈবাৎ ফারকোটের তলা থেকে মাথা বার করে ফেলেই রাগে গরগর করে আবার ডুব মারল ফারকোটের নিচে। ওর মনে হয়েছিল যেন দৈত্যদানব ভর্তি মস্ত একটা আধা অন্ধকার ঘর ও দেখতে পেয়েছে; ঘরের দুপাশে লাগানো লম্বা গরাদে আর পার্টিশনগুলোর পেছন থেকে উঁকি মারছিল কেমন ভয়ঙ্কর সব মুখ: কোনটা ঘোড়ার মতো, কেউ শিংওয়ালা, কারো লম্বা কান, আর একটা প্রকান্ড মোটা বদন — তার নাকের জায়গায় একটা লেজ, মুখ থেকে বেরিয়ে আছে দুটো চাঁছাছোলা লম্বা লম্বা হাড়।

বেড়ালটা মাসির পায়ের নিচে ভাঙা গলায় ডেকে উঠল; কিন্তু তখনি খুলে গেল ফারকোটটা আর মনিব বলে উঠল, 'নামো!' ফিওদর তিমোফেইচ্ মাসির সঙ্গেই লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝের উপর। ওরা তখন ছেয়ে রঙের তক্তার দেওয়ালওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে। ওখানে আয়না লাগানো একটা টেবিল, একটা টুল, কোণে ঝোলানো কতকগুলো ন্যাকড়া ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র ছিল না; হারিকেন বা মোমবাতির বদলে দেওয়ালে লাগানো একটা পাইপ থেকে পাখার মতো

ছড়িয়ে জ্বলছিল একটা ঝলমলে আলো। মাসির চাপে দুমড়ানো লোমগুলো চেটে নিয়ে ফিওদর তিমোফেইচ্ টুলের তলায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। মনিব তখনো উদ্বিগ্ন, হাত ঘষতে ঘষতে কাপড় ছাড়তে শুরু করল সে... বাড়িতে কম্বলের তলায় শোবার জন্য তৈরি হতে গিয়ে সাধারণত যেমনি করে কাপড় ছাড়ে তেমনি করেই সে কাপড় ছাড়ল, তার মানে অন্তর্বাস ছাড়া খুলে ফেলল আর সবকিছুই, তারপর টুলের উপর বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের উপর অদ্ভুত সব কারিকুরি করতে শুরু করল। প্রথমে সে মাথায় পরল একটা পরচুলা, সেটা দুদিকে পাট করা, পাকিয়ে পাকিয়ে দুটো শিংয়ের মতো উপর দিকে উঠে গিয়েছে; তারপর মুখময় পুরু করে সাদা সাদা কি যেন মাখল, শেষে সেই সাদার ওপরে ভুরু আঁকল, গোঁফ আঁকল, আর লাগাল লাল রং। কারিকুরি কিন্তু ওখানেই শেষ হল না। মুখ আর ঘাড় নোংরা করে সে একটা কিম্ভূতকিমাকার পোষাক গায়ে চড়াতে লাগল। এমন পোষাক মাসি আগে কখনো দেখে নি, না বাড়িতে, না রাস্তায়। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, মধ্যবিত্ত গেরস্তঘরে পর্দা আর আসবাবপত্রের ঢাকনার জন্য যা ব্যবহার করা হয় তেমনিতরো মস্ত মস্ত ফুলকাটা সুতী কাপড় জুড়ে একটা বেদম ঢোলা প্যাণ্টুলুন, তার বোতামের ঘরগুলো একেবারে বগলের নিচে গিয়ে উঠেছে, একখানা পা সেলাই করা হয়েছে বাদামী রঙের কাপড়ে, আরেকখানা পা ঝলমলে হলুদ রঙের কাপড়ে। ওটার মধ্যে গা-ডুবিয়ে মনিব আরেকটা ছিটের জামা গায়ে চড়াল, তাতে একটা মস্ত বড় কুঁচি দেয়া কলার আর পিঠের ওপর মস্ত একটা সোনালি তারা। পরল নানা রঙের মোজা, সবুজ রঙের জুতো...

মাসির চোখে মনে রঙবেরঙের ঘোর লাগল। সাদামুখো, বস্তামার্কা মূর্তিটা থেকে মনিবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তার গলার স্বরটাও পরিচিত, মনিবের মতোই, কিন্তু সময় সময় মাসির সন্দেহ ঘোরতর হচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল এই রঙবেরঙের মূর্তিটার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘেউঘেউ করে ওঠে। নতুন জায়গা, পাখার মতো ছড়িয়ে জ্বলা আলো, গন্ধ, মনিবের এই অদ্ভুত চেহারা বদল — এই সব মিলিয়ে ওর মধ্যে এমন একটা অনিশ্চিত ভয় আর আশঙ্কা জেগে উঠল যে নাকের জায়গায় লেজওয়ালা সেই মোটা মুখটার মতো নির্ঘাত একটা ভয়ঙ্কর কিছুর সামনে পড়ে যাবে বলে ওর মনে হল। তাতে আবার দেওয়ালের ওপারে দূরে কোথায় যেন বিদ্ঘুটে বাজনা বাজছিল আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল দুর্বোধ্য গর্জন। একটি মাত্র জিনিসই ওকে ভরসা দিল -- সেটি হল ফিওদর তিমোফেইচের নির্বিকার ভাব। সে নির্বিঘ্নে টুলের তলায় ঘুম মারছিল, এমন কি টুলটা নড়ে উঠলেও চোখ মেলছিল না।

সাদা ওয়েস্টকোট আর সান্ধ্য পোষাকপরা কে একজন লোক ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল: 'এখন যাচ্ছেন মিস্ আরাবেল্লা। তার পরেই — আপনি।'

মনিব কোন উত্তর দিল না; টেবিলের তলা থেকে টেনে বের করল একটা ছোট্ট সুটকেস, তারপর বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকল। তার ঠোঁট আর হাত দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে বিচলিত হয়ে আছে; মাসি শুনতে পাচ্ছিল কীরকম কেঁপে কেঁপে তার নিঃশ্বাস পড়ছে।

দোর থেকে কে যেন হাঁক দিল, 'আসুন! মিঃ জর্জ!'

মনিব দাঁড়িয়ে উঠে নিজের উপর তিনবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল তারপর টুলের তলা থেকে বেড়ালটাকে বের করে এনে সুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

নিচু গলায় সে ডাকল, 'মাসি! আয়!'

মাসি কিছুই বুঝতে না পেরে এগিয়ে গেল তার হাতের কাছে; সে ওর মাথার উপর একটা চুমু দিয়ে ওকেও ফিওদর তিমোফেইচের সঙ্গেই ভরে নিল। তারপরেই অন্ধকার... মাসি বেড়ালটার গা মাড়িয়ে দিল, আঁচড়াতে লাগল সুটকেসের ভেতরটা, কিন্তু ভয়ের চোটে টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। সুটকেসটা দুলে উঠতে লাগল ঢেউয়ের মতো, কাঁপছিল...

'এই যে, আমি এসে গেছি!' জোরে চেঁচিয়ে উঠল মনিব, 'এই যে, আমি এসে গেছি!'

মাসি বুঝতে পারল যে এই চীৎকারের পরই সুটকেসটা একটা শক্ত কিছুর সঙ্গে ঠোক্কর খেল আর দুলুনিও থামল। একটা বিরাট গর্জন শোনা গেল: কাউকে লক্ষ্য করে কিসের ওপর যেন চাপড়ানোর আওয়াজ হল এবং এই একটা কেউ সম্ভবত সেই নাকের জায়গায় লেজওয়ালা দানবটাই হবে, চীৎকার করে এমন করে সেই কেউ একটা হেসে উঠল যে সুটকেসের তালাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। এই গর্জনের উত্তরে মনিব খিলখিল করে হেসে উঠল। এমনি করে বাড়িতে সে কখনও হাসে না।

গর্জনকেও ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় সে চেঁচিয়ে বলল, 'হাঁ! মাননীয় সজ্জনবৃন্দ! আমি এইমাত্র স্টেশন থেকে এলুম! আমার দিদিমা স্বর্গে গেছেন কিনা, আমার জন্য এই সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন! এই সুটকেসটায় খুব ভারী কিছু জিনিস আছে! নিশ্চয়ই সোনাদানা... হাঁ! হয়ত লাখ টাকাই আছে! দেখি, এখানেই খুলে দেখি!..'

সুটকেসের তালাটা খুট্ করে উঠল। ঝলমলে আলোতে মাসির চোখ ধাঁধিয়ে গেল; লাফিয়ে বেরিয়ে এল ও সুটকেস থেকে; চীৎকারের চোটে ওর কানে তালা লেগে যাওয়ায় মনিবের চারদিকে ও যত জোরে পারে ছুটতে শুরু করে দিল আর একটানা ঘেউঘেউ করে চলল।

মনিব চেঁচাল, 'হাঁ! ফিওদর তিমোফেইচ্ খুড়ো! আমার আদরের মাসি মণি! সোহাগী সব কুটুম, জাহান্নামে যাও সব!'

বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে বেড়ালটাকে আর মাসিকে ধরে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে শুরু করল। সেই ফাঁকে মাসি দেখে নিল এই নতুন জগৎটাকে যেখানে ও পাকেচক্রে এসে পড়েছে; আর তার এত জাঁকজমক দেখে অবাক হয়ে মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে আনন্দে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর নিজেকে মনিবের কোলাকুলি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাট্টুর মতো একই জায়গায় ঘুরতে শুরু করল। এই নতুন জগৎটা বিরাট আর ঝলমলে আলোয় ভরা; যেখানেই তাকাও না কেন মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায়ই দেখা যাচ্ছে খালি মুখ আর মুখ, আর কিছুই না।

মনিব চেঁচিয়ে উঠল, 'মাসিমা, দয়া করে বসুন!'

এর মানে কী তা মনে পড়ায় মাসি লাফিয়ে চেয়ারে উঠে বসল। মনিবের দিকে তাকিয়ে

রইল ও। মনিবের চোখ দুটো বরাবরের মতোই গম্ভীর আর আদর মাখানো, কিন্তু মুখখানা, বিশেষ করে মুখের কোণ আর দাঁতগুলো একটা স্থির গালভরা হাসিতে কদর্য। নিজেই সে হেসে ফেটে পড়ছিল, লাফালাফি করছিল, কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিল আর ভান করছিল যেন এই হাজার হাজার মুখের সামনে তার খুব খুশি-খুশি লাগছে। মাসি এই হাসি-খুশিকে সত্যি বলে বিশ্বাস করল, তারপর হঠাৎ সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করল যে এই হাজার হাজার মুখ ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। শেয়ালমুখো মুখটা তুলে ও আনন্দের সঙ্গে উঁ-উঁ করে উঠল।

মনিব ওকে বলল, 'মাসিমা, আপনি বসে থাকুন, আমরা এখন খুড়োর সঙ্গে একটু নাচব।'

কখন ওকে ওই সব ন্যাকামিগুলো করতে হবে সেই অপেক্ষায় ফিওদর তিমোফেইচ্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরাসক্তভাবে আশেপাশে তাকাতে লাগল। নির্জীব ভঙ্গিতে হেলাফেলা করে গোমড়া মুখে সে নাচল; তার নড়াচড়া, লেজ আর গোঁফ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সে ঘৃণা করে এই ভিড়কে, ঝলমলে আলোকে, মনিবকে, এমন কি নিজেকেও... তার নিজের নাচটুকু নেচে সে হাই তুলে বসে পড়ল।

মনিব বলল, 'এবার তাহলে মাসিমা আসুন, একটু গান করা যাক, তারপর নাচা যাবে, কেমন?'

পকেট থেকে সে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে লাগল। মাসি বাজনা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে চেয়ারের উপর ছটফট করতে করতে চাপা আওয়াজ করে উঠল। চারদিক থেকে গর্জন আর হাততালি শোনা গেল। মনিব সেলাম করল — তারপর যখন সব চুপচাপ হয়ে গেল তখন আবার বাজাতে লাগল... একটা খুব চড়া সুর বাজানোর সময় ওপরের লোকজনের মধ্যে কে যেন জোরে জোরে হায়-হায় করে উঠল।

একটা বাচ্চা ছেলের গলা চীৎকার করে উঠল, 'বাবা! এ যে কাশ্‌তান্‌কা!'

একটা মাতাল খনখনে সরু গলা সায় দিল, 'হ্যাঁ, কাশ্‌তান্‌কাই তো! কাশ্‌তান্‌কা! এই ফেদ্যুশ্‌কা, এটা যে, হে ভগবান, কাশ্‌তান্‌কা! শি-শি!'

কে যেন গ্যালারীর উপর থেকে সিটি মারল আর দুটো গলা — একটা বাচ্চার আরেকটা মরদের — জোরে জোরে হেঁকে উঠল:

'কাশ্‌তান্‌কা! কাশ্‌তান্‌কা!'

মাসি শিউরে উঠল আর যেদিক থেকে চীৎকার আসছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল; যেমনি করে ঝলমলে আলোগুলি প্রথমে ওকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল তেমনি করেই দুটো মুখ ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। একটা মুখ এক মাতাল নেশাখোরের — গোঁফদাড়িতে ভরা; আরেকটা মুখ ঘাবড়ে-যাওয়া এক বাচ্চার ফুলো ফুলো গোলাপী গালওয়ালা... ওর মনে পড়ে গেল; চেয়ার থেকে পড়ে গেল বালির মধ্যে। তারপর লাফিয়ে উঠে আনন্দে ঘেউঘেউ করে ছুটল মুখ দুটোর দিকে। কানে তালা লাগানো গর্জন আর তীক্ষ্ন সিটির মধ্য দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলের তীব্র চীৎকার শোনা গেল:

'কাশ্‌তান্‌কা! কাশ্‌তান্‌কা!'

মাসি লাফিয়ে বেড়া পার হল, কার একটা কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে পেঁছিল বক্সে। পরের সারিতে যাওয়ার জন্য একটা উঁচু দেওয়াল পেরোতে হল। মাসি লাফাল, কিন্তু ওটা ডিঙোতে পারল না, ফের দেওয়াল বেয়ে ঘেঁষটে নেমে এল। তারপর লোকের হাত থেকে হাতে উঠে যেতে লাগল সে, কার যেন হাত আর মুখ চেটে দিলে, উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে উঠতে শেষকালে সে গ্যালারীতে গিয়ে পেঁছিল...

আধ ঘণ্টাখানেক পরেই কাশ্‌তান্‌কা একদম রাস্তায় সেই লোক দুটোরই পেছন পেছন যাচ্ছিল, যাদের গা থেকে লেই আর বার্নিশের গন্ধ বেরোয়। লুকা আলেক্সান্দ্রিচ টলছিল, কিন্তু ঠেকে শেখা সহজ বোধে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল নর্দমাগুলো।

সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'পড়ে আছে সব পাপের অতল গর্ভে... আর তুই কাশ্‌তান্‌কা... তুই একটা ধাঁধা! মানুষের সঙ্গে তোর যা তফাৎ সে ধর এই যেমন ছুতোরের সঙ্গে কাঠের মিস্ত্রির!'

বাবার টুপি মাথায় দিয়ে সঙ্গে হেঁটে চলছিল ফেদ্যুশ্‌কা। তাদের দুজনেরই পেছনটায় তাকিয়ে দেখল কাশ্‌তান্‌কা। ওর মনে হল যেন বহুকাল ধরেই ও তাদের পেছন পেছন যাচ্ছে। আর মুহূর্তের জন্যও যে তার জীবনে ছেদ পড়ে নি, তাতে সে খুশি।

দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা ছোট্ট ঘরখানা ওর মনে পড়ল; মনে পড়ল ফিওদর তিমোফেইচকে, হাঁসটাকে; মনে পড়ল সেই চমৎকার খাওয়া, তালিম নেওয়া; মনে পড়ল সার্কাসের কথা, কিন্তু এখন এই সব কিছুই ওর কাছে মনে হল যেন একটা মস্ত, গোলমেলে দুঃস্বপ্ন...

ইভান তুর্গেনেভ

বেঝিন মাঠ



১৮৫২ সনে যখন 'শিকারীর রোজনামচা' প্রকাশিত হল তখন ইভান তুর্গেনেভ পাঠকসমাজে স্বল্প পরিচিত। যে সব গল্প গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয় তাতে সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মধ্য রাশিয়ার কৃষ্ণমৃত্তিকার অঞ্চল আর তার যব-গমের খেত, বিধ্বস্তপ্রায় ঘরবাড়ি, নোংরা সরাইখানা, উজ্জ্বল বনভূমি, শান্ত নদী, গাঁয়ের অবারিত পথ এবং 'জনগণ থেকে' নির্গত বর্ণবহুল লোকজন, বিশেষ করে ভূমিদাস চাষী — যারা নিরক্ষর অথচ প্রতিভাবান, যাদের আছে বিশুদ্ধ হৃদয় ও প্রজ্ঞা। এই বইটি রচয়িতাকে খ্যাতিমান করে তোলে। 'বেঝিন মাঠ' গল্পটিও এরই অন্তর্ভুক্ত। গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে কৃষক বালকদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং লৌকিক কাহিনী ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যরূপ।

এটি ছাড়াও 'শিকারীর রোজনামচা' থেকে শিশুপাঠ্য রূপে পরিগণিত হয়েছে 'বিরিউক' 'লগোভ' ও 'দুই গায়ক' গল্প। শিশুদের জন্য তুর্গেনেভের রচিত গল্পগুলির মধ্যে ক্লাসিক রচনা হয়ে দাঁড়ায় 'মুমু'। এতে বর্ণিত হয়েছে এক কুকুরের কাহিনী। নিজের প্রভু — জমিদারনীর খামখেয়ালি হুকুমে কুকুরটির মালিক — ভূমিদাস চৌকিদার গেরাসিম তাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়।

লেভ তলস্তয়ের অনুরোধক্রমে তুর্গেনেভ 'শিশু-অবকাশ' পত্রিকার জন্য 'তিতির' গল্প লেখেন। তিনি ফরাসী লেখক শার্ল পেরোর রূপকথাও রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নিজের ভূমিকাসমেত প্রকাশ করেন।

ইভান সের্গেয়েভিচ্ তুর্গেনেভের জীবৎকাল ১৮১৮ থেকে ১৮৮৩ সন।



জুলাই মাসের উজ্জ্বল একটা দিন। আবহাওয়া যখন একটানা ভালো থাকে কেবল তখনই এমন এক একটা দিনের সাক্ষাৎ মেলে। ভোর থেকেই আকাশ পরিষ্কার, প্রভাতসূর্য আগুন ছড়াচ্ছে না। পূবের আকাশ কোমল একটা গোলাপী আভায় রঙীন। সূর্য আগুনের মতো নয়, অনাবৃষ্টির সময় দম আটকানোর মতো তাতানো লাল টকটকে নয়, আবার ঝড়ের পূর্বের সেই মেটে তামাটেও নয়, লম্বা সরু এক চিল্‌তে মেঘের আড়াল থেকে উজ্জ্বল আর নম্র দ্যুতিময় সূর্য উঠছে শান্তিতে, মেঘের কোল থেকে তরুণ সূর্য ঝকঝক করে উঠছে, আবার লালচে-সাদা কুয়াশার মধ্যে ডুব দিচ্ছে। মেঘের উপরের অতি সূক্ষ্ম পাড়টুকুন, সাপের আঁকাবাঁকা বর্ণে বর্ণে তা ঝলমল করে উঠছে; রজতের মতো তার দীপ্তি... কিন্তু ঐ দেখো, নৃত্যময়ী রশ্মিমালা আবার ঝলমলিয়ে উঠেছে; গভীর এক আনন্দে ঊর্ধ্বলোকে উড্ডীন হবার মতো উদিত হচ্ছে বিশাল একটি জ্যোতির্মণ্ডল। দুপুরের দিকে সচরাচর দেখা যায়, আকাশে দূর শূন্যে অসংখ্য মেঘকুণ্ডলীর মেলা, সোনা মাখানো ধূসর তাদের বর্ণ, আর পাড়গুলোতে কোমল শুভ্রতা। কূলপ্লাবী নদী ইতস্তত ছড়ানো ছোটো ছোটো দ্বীপগুলিকে যেমন তার স্বচ্ছ ঘন সুনীল অখণ্ডতায় স্নান করিয়ে দেয়, এ মেঘখণ্ডগুলিও তেমনি দ্বীপের মতো, প্রায় একটুও নড়ে না; আরো দূরে আকাশের গায়ে নিচু দিকটায় মেঘ গতিময়, খণ্ড খণ্ড ঘন হয়ে জমে উঠছে; এই বার ওই মেঘগুলির মাঝখানে আর নীলের চিহ্ন নেই, কিন্তু মেঘগুলিই প্রায় আকাশের মতো নীল হয়ে গেছে, আলোকে উত্তাপে



পূর্ণ হয়ে উঠছে। দিগন্তের লালচে-সাদা রঙটি বদলায় না সারাদিন, সমগ্র দিকবলয় জুড়ে সেই একই রঙের সমারোহ; কোথাও ঝড় জমাট বেঁধে উঠছে না, ঝড়ে কালো হয়ে উঠছে না; কোথায় যেন কেবল আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে নীলাভ বর্ণের রশ্মিমালা, প্রায় বোঝা যায় না এমনি মৃদু বৃষ্টি সেটা। সন্ধ্যায় এ মেঘমালা অদৃশ্য হয়ে যায়, শেষ মেঘখন্ডগুলি থাকে কালচে ধোঁয়ার মতো আকৃতিহীন হয়ে, তাতে ছিট ছিট পাটল রঙের দাগ ছড়ানো, অস্তরবিব মুখোমুখি থাকে সে মেঘগুলি; ঠিক যেভাবে উদয় হয়েছিল তেমনি শান্তভাবে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে সেখানে অন্ধকার হয়ে-ওঠা পৃথিবীর উপরিতলে অল্পকাল লেগে থাকে একটি রক্তিম দীপ্তি, আর তারপর সাবধানে সঞ্চালিত মোমবাতির মতো ধীরে ধীরে সান্ধ্য আকাশে ঝকমক করে ওঠে সন্ধ্যাতারা। এমনি দিনে সমস্ত বর্ণলেপ থাকে মৃদু, তা উজ্জ্বল কিন্তু চোখ ধাঁধানো নয়; সবকিছু যেন একটি কমনীয় মমতার স্পর্শে ছেয়ে থাকে। এমন দিনে মাঝে মাঝে গরম লাগে ভয়ানক; প্রায়ই মাঠ প্রান্তরের ঢালুতে এমন কি যেন 'ধোঁয়া' উড়তে থাকে, কিন্তু এই জমাট হতে থাকা গুমোট উড়িয়ে নেয় হাওয়ায়, আর — স্থির, চমৎকার আবহাওয়ার নিশ্চিত সংকেত — সেই ধুলোর ঘূর্ণীপাক উঁচু সাদা স্তম্ভের আকারে রাস্তার ওপর দিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। নির্মল শুকনো হাওয়ায় গন্ধ পাওয়া যায় সোমরাজের, কাটা রাইয়ের আর বাকহুইটের; রাত্রি সমাগমের একঘণ্টা আগেও বাতাসে আর্দ্রতার লেশমাত্র থাকে না। গম কাটার জন্য এমনি আবহাওয়ারই প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষক...

এমনই একটি দিনে আমি একবার তুলা প্রদেশের চের্ন জেলায় বনমোরগ শিকারে বেরিয়েছিলাম। বেশ কিছু শিকার করলাম; শিকারের ঝোলাটা ভর্তি হয়ে আমার কাঁধে একেবারে নির্মমভাবে কেটে বসেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সায়াহ্নের দীপ্তিটুকু নিভে গেছে, প্রদোষের স্নিগ্ধ ছায়া ঘন হয়ে উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে, সে আকাশ তখনো উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে অস্তরবির রশ্মির আলোর আভা আর নেই, আমি তখন বাড়ি ফিরব ঠিক করলাম। দ্রুত পা চালিয়ে পার হয়ে এলাম ঝোপঝাপের 'স্কোয়ার'*, হেঁটে উঠলাম একটা টিলার ওপরে, কিন্তু সেই পরিচিত সমতলভূমিটি কোথায় গেল, যার ডান পাশে সেই ওক বন আর দূরে সেই ছোটো সাদা গির্জাটি! সামনে দেখি সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃশ্য, সে দৃশ্য আমার অচেনা। আমার পদপ্রান্তে সরু একটি উপত্যকা আর ঠিক আমার সামনে একটা পুরু প্রাচীরের মতো খাড়া উঠে গেছে আস্পেন গাছের একটি ঘন নিবিড় অরণ্য। স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম হতভম্ব হয়ে, চারদিকে তাকালাম... ভাবলাম, 'আহা! রাস্তা ভুল হয়ে গেছে কী করে, খুব বেশি ডান দিকে এসে গেছি।' ভুলের জন্য খানিকটা অবাক হলাম, তারপর তাড়াতাড়ি টিলা বেয়ে নামতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিত একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে ডুবে গেলাম, ঠিক যেন একটা চোরকুঠুরীতে প্রবেশ করেছি; উপত্যকার তলদেশে উঁচু নিবিড় ঘাসবন শিশিরে ভিজে গেছে, দেখাচ্ছে সাদা, মসৃণ একখানি টেবিল ক্লথের

* অরিওল প্রদেশের বিশাল বিশাল নিরেট ঝোপঝাড়ের চাপকে স্কোয়ার বলা হয়। (টীকা লেখকের।)

মতো; ওর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে কেমন ভয় লাগে। অন্য দিকটায় যাবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালালাম, হাঁটতে লাগলাম আস্পেন বনের পাশ দিয়ে, চললাম বাঁ দিক ঘেঁসে। তন্দ্রামগ্ন তরুশীর্ষে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বাদুড়ের সঞ্চরণ, মুক্ত আকাশের অস্পষ্টতায় ওরা রহস্যজনকভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, কাঁপছে; একটি তরুণ বিলম্বিত বাজপাখি দ্রুতপক্ষে সোজা উড়ে গেল ঊর্ধ্বদিকে, কুলায় ফিরে গেল তাড়াতাড়ি। মনে মনে ভাবলুম, 'এই যে, এই বার আমি এই কোণটিতে যাব, এখুনি পেয়ে যাব পথ; কিন্তু আমার রাস্তা ছেড়ে ভার্স্টখানেক দূরে সরে এসেছি!'

অবশেষে বনের প্রান্তে এসে পেঁাছলাম, কিন্তু সেখানে কোনো রকম পথ নেই, সম্মুখে দেখলাম নিচু, না-কাটা ঝোপ দূর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে; তার পেছনে দূরে, অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় পরিত্যক্ত ভূমির রেখা। আবার থামলাম। 'আচ্ছা!.. কোথায় আমি?' সারাদিন কী ভাবে এবং কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছি ভাবতে লাগলাম মাথা ঘামিয়ে... তারপর শেষকালে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওঃ হো! এতো সেই পারাখিনের ঝোপ-জঙ্গল! হ্যাঁ ঠিক! তাহলে এটা নিশ্চয় সিন্দেয়েভ বন। কিন্তু কী করে এলুম এখানে? এত দূরে?.. আশ্চর্য! এবার আমাকে আবার চলতে হবে ডান দিক ঘেঁসে।'

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়েই ডান দিকে চললাম। ততক্ষণে রাত হয়ে এসেছে, ঝড়ের মেঘের মতো জমাট হয়ে উঠেছে; মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার সেই কুয়াশার সঙ্গে অন্ধকার চারদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ওপর থেকে ঝরে পড়ছে। একটা ছোটো অব্যবহৃত জংলা পথের মতো জায়গায় এসে পড়লাম; সে পথ দিয়েই হেঁটে চললাম সামনে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে। অনতিবিলম্বে আমার চতুর্দিকে ঘিরে উঠল ঘন কালো আর নিবিড় নীরবতা — কেবল থেকে থেকে ভারুই পাখির ডাক শোনা যেতে লাগল। ছোটো একটি কী রাত-পাখি নরম পাখায় ভর করে নিঃশব্দে মাটির কাছ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে প্রায় আমার গায়ে এসে আছড়ে পড়ল, তারপর ভয় পেয়ে ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে চলে গেল। ঝোপঝাড়ের প্রান্তে বেরিয়ে এলাম, তারপর পা চালালাম বেড়ার পাশ দিয়ে মাঠ বরাবর। এতক্ষণে দূরের জিনিস প্রায় দেখাই যায় না, চারিপাশে মাঠখানাকে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট সাদা, আর তা ছাড়িয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে বিরস অন্ধকার, মনে হয় তা প্রতি মুহূর্তে বিশাল স্তরে স্তরে সামনে ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে। হাওয়া ধীরে শীতল, আরো শীতল হয়ে উঠছে, সেই শীতল বাতাসে আমার পদশব্দে কেমন একটা চাপা শব্দ হচ্ছে। ফ্যাকাশে আকাশটা আবার নীল হয়ে উঠতে লাগল — কিন্তু সেটা রাত্রির নীল রঙ। ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি নীল আকাশে ঝকমক করছে, টিপ টিপ করছে।

যাকে বন মনে করছিলাম আসলে তা দেখলাম কালো গোল একটি টিলা। 'কিন্তু কোথায় তাহলে আমি?' বলে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, এই তিন বারের মতো স্থির হয়ে দাঁড়ালাম, তাকালাম জায়গাটার দিকে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে, প্রশ্নভরা চোখ নিয়ে তাকালাম ফুট ফুট দাগওয়ালা হলদে ইংরেজী কুকুরটার দিকে — যার নাম দিয়াঙ্কা, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে সব থেকে যে বুদ্ধিমান। কিন্তু সব থেকে বুদ্ধিমান চতুষ্পদটি কেবল ল্যাজটা নাড়ল, নিরুৎসাহে ক্লান্ত চোখ দুটি পিট পিট করল, আমাকে কোনো কান্ডজ্ঞান-সম্পন্ন উপদেশ দিল না। ওর চোখে ছোটো হয়ে গিয়েছি মনে হল,

মরিয়া হয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলাম, যেন হঠাৎ ঠিক পথ ঠাহর করে নিতে পেরেছি, টিলা টপকে এসে দেখলুম একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছি, জায়গাটা গভীর বেশি নয়, চার দিকে চষা। অদ্ভুত একটি শিহরণ জাগল আমার।

ফাঁকা জায়গাটার আকৃতি অবিকল কটাহের মতো, পাশগুলো ঢালু হয়ে নেমেছে; তলদেশে বড়ো বড়ো সাদা একরকম পাথর সোজা খাড়া হয়ে রয়েছে — মনে হচ্ছে ওরা যেন একটা গোপন পরামর্শ-সভার জন্য গুড়ি মেরে এসেছে ওখানে — আর কী নৈঃশব্দ আর অন্ধকার, ওর ওপরে উদ্যত আকাশটাকে মনে হচ্ছে এমন চিতানো এবং মূক মৌন, এমন ভয়ংকর এবং অনৈসর্গিক যে আমার বুকটা দমে গেল। কী একটা ক্ষুদ্র প্রাণী পাথরগুলোর মধ্যে মৃদু এবং করুণভাবে ঘ্যান ঘ্যান করল। তাড়াতাড়ি আবার টিলার উপরে উঠে আসতে চেষ্টা করলুম। তখন পর্যন্ত বাড়ি ফেরার পথ পাবার সব আশা ত্যাগ করি নি, কিন্তু সেই মুহূর্তে একেবারে শেষ বারের মতো স্থির করে বসলাম যে না, হারিয়েই গেছি আমি। তখন চারিদিক অন্ধকারে ডুবে গেছে, আশপাশের কোনো কিছু দেখে বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমি হাঁটলুম সোজা সামনে, দিকবিদিক খেয়াল না রেখে, শুধু তারার আলোর সাহায্যে... প্রায় আধঘণ্টা চললুম এই ভাবে, যদিও এক পায়ের সামনে আর এক পা এগিয়ে দিতে পারছিলাম না প্রায়। মনে হল জীবনে কখনো এমন শূন্য পরিত্যক্ত জায়গায় আর আসি নি; কোথাও আগুনের একটি আভা চোখে পড়ে না, কোথাও শোনা যায় না একটি শব্দ। একটির পর একটি ঢালু পাহাড়গাত্র, মাঠের বিস্তার অন্তহীন; ঝোপঝাড়গুলো যেন আমার নাকের ডগার সামনে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আসছে। হাঁটছি তো হাঁটছিই, ভাবছি সকাল না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকব কোথাও, সহসা দেখি ভয়ংকর একটা অতলস্পর্শ গহ্বরের একেবারে কিনারে এসে পড়েছি।

পা তুলেছিলাম, তাড়াতাড়ি পেছিয়ে নিলাম, চারদিকে ঘোর অন্ধকার, তারই মধ্য দিয়ে দেখলাম বহু নিচে বিস্তৃত একটি বিরাট সমতলভূমি। তাকে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে একটি চওড়া নদী, সেটি আমার দিক থেকে দূরে বেঁকে গেছে; জলের স্বচ্ছ কালো প্রতিফলন তখনো আবছাভাবে এখানে ওখানে চকচকিয়ে উঠছে, ওই দেখে নদীর গতিপথ বুঝতে পারা যেত। যে পাহাড়টির উপর আমি রয়েছি সেটি আচমকা এসে শেষ হয়েছে প্রায় খাড়া ঝুলে-পড়া একটি পাড়ে, তার বিশাল আকৃতি-রেখাটি আকাশের গাঢ় নীল শূন্যের পটভূমিকায় কালো হয়ে উঠেছে, ঠিক আমার নিচু দিয়ে কালো নিথর আরশির মতো নদীটি কাছের সমতলভূমি এবং খাড়া পাড়ের মাঝখানে একটি যে কোণ তৈরি হয়েছে সেখানে, পাহাড়ের রক্ষিত আশ্রয়স্থলের নিচে পাশাপাশি দুটো আগুন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর রক্তশিখা লকলক করে উঠছে। আগুনের চারদিকে নড়াচড়া করছে লোকজন, তাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে, কাঁপছে, আর কখনো কখনো ছোটো একটি কোঁকড়া চুলভর্তি মাথার সামনের দিকটা আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে উঠছে...

অবশেষে বুঝতে পারলুম কোথায় এসে পড়েছি। এই সমতলভূমিটি আমাদের অঞ্চলে বেঝিন মাঠ নামে সুপরিচিত... কিন্তু বাড়ি ফেরার কোনো সম্ভাবনাই নেই, বিশেষ করে রাত্রিবেলা;

ক্লান্তিতে পা দুটো ভেঙে আসছে। ঠিক করলাম নিচে নেমে যাব আগুনের কাছে, তারপর ওই লোকগুলোর সাহচর্যে প্রতীক্ষা করব প্রত্যুষের, লোকগুলিকে আমি গোরু-মোষ বেচা রাখাল বলে আন্দাজ করে নিলাম। নামলুম বিনা বিঘ্নে, কিন্তু হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকা শেষ শাখাটি ছেড়ে দিতে না দিতে হঠাৎ দুটো বড়ো লোমশ সাদা কুত্তা ক্রুদ্ধ চীৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে এল। আগুনের কাছ থেকে বালক কণ্ঠের মুখর স্বর শোনা গেল; দু'তিনটি ছেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মাটি থেকে। তাদের প্রশ্নভরা চীৎকারের জবাবে আমি জানান দিলুম চেঁচিয়ে। ওরা দৌড়ে এল আমার কাছে, কুকুর দুটোকে ডেকে সরিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ, কুত্তা দুটো বিশেষ করে অবাক হয়ে গেল আমার দিয়াঙ্কাকে দেখে। আমি নেমে এলুম ওদের কাছে।

আগুন ঘিরে বসে থাকা ওদের রাখাল মনে করে ভুল করেছিলাম। ওরা পাশের গ্রামের কৃষক ছেলে কয়েকটি মাত্র, এক পাল ঘোড়ার ভার পড়েছে ওদের ওপর। তপ্ত গ্রীষ্মের রাত্রিতে ঘোড়া নিয়ে এসে মাঠে চরায় ওরা: দিনের বেলা মাছি আর ডাঁশ একদণ্ড শান্তি দেয় না; সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার পাল বার করে নিয়ে আসে আর সকালে ফিরিয়ে নিয়ে যায় — চাষী ছেলেদের এ একটা মহা স্ফূর্তির ব্যাপার। খালি মাথায়, ভেড়ার লোমের পুরোনো কোট গায়ে দিয়ে তারা তেজী ঘোড়ায় চেপে ইতস্তত ছুটে বেড়ায় এবং খুশির চীৎকারে, হুট হুট শব্দে, আর হাসিতে মেতে উঠে হাত-পাগুলো ঘোরাতে থাকে আর লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। পাতলা ধুলো উড়ে যায় হলুদ মেঘের মতো, পথ ধরে ধুলিস্তর এগিয়ে চলে; দূরে একতালে শব্দ-প্রতিশব্দ হয় ঘোড়ার খুরের; ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে ছুটে চলে; সবার সামনে বেগে লাফায় একটা বাদামী লোমশ ঘোড়া, ল্যাজটা তার খাড়া আর জট পাকানো কেশরে কাঁটা গাছ লাগানো, যত চলে তত তার গতি বদলায়।

ছেলেদের বললুম আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তারা আমাকে একটু জায়গা করে দিল, আমি বসে পড়লুম তাদের সঙ্গে। আমি কোত্থেকে আসছি জিজ্ঞেস করল ওরা, তারপর চুপ করে রইল একটুক্ষণ। আবার আমরা একটু কথাবার্তা বললুম এরপর। আমি শুয়ে পড়লুম একটি ঝোপের নিচে, ঝোপটির নতুন পাতা অঙ্কুর সব ছেঁটে ফেলা হয়েছে; শুয়ে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগলুম। চমৎকার একটি দৃশ্য: আগুন ঘিরে আলোর একটি রক্তিম বেষ্টনী নাচছে, আর মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারের পটভূমিকার আলিঙ্গনে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে; মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে উঠছে, আর এই বেষ্টনীটির পরিধি ছাড়িয়ে ঝলকে ঝলকে আলোর রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে, আলোর একটি সরু লকলকে জিহ্বা শুকনো ডাল লেহন করে নিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য দেখা দিচ্ছে দীর্ঘ সরু ছায়া, একেবারে আগুন পর্যন্ত গিয়ে নাচছে ছায়াগুলি; আলোর সঙ্গে লড়াই চলছে অন্ধকারের। কখনো, আগুনের তেজ যখন নিচু, আলোর বেষ্টনীটি যখন সংকুচিত, হঠাৎ তখন ক্রম অগ্রসরমান অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়ার মাথা, বাদামী রঙের ডোরাকাটা, কিংবা পুরো সাদা, শূন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘোড়াটা তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, দ্রুত চিবোচ্ছে লম্বা লম্বা ঘাস তারপর পরমুহূর্তেই মাথাটা সরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেবল ওর ঘাস চিবোনোর শব্দ আর ঘোঁৎঘোঁৎ শোনা যায়। আলোর বেষ্টনীর মধ্য থেকে বোঝা

শক্ত কী হচ্ছে অন্ধকারে; হাতের কাছের প্রত্যেকটি জিনিস যেন প্রায় নিকষ কালো যবনিকায় মুছে গেছে মনে হয়; আরো কিছু দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় দিগন্তে দীর্ঘ অস্বচ্ছ ছায়ার মতো পাহাড় আর বন। মেঘশূন্য কালো আকাশটা কল্পনাতীত বিশাল, আমাদের মাথার উপর তার সমস্ত রহস্যমাখা মহিমায় গৌরবে স্থির হয়ে আছে। হৃদয়ে অনুভব করা যায় একটি মিঠে যন্ত্রণা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাওয়া যায় সেই বিচিত্র, অভিভূত করা, তাজা সৌরভটি — রাশিয়ার গ্রীষ্ম রাত্রির সৌরভ। একটিও শব্দ প্রায় শোনা যায় না চারদিকে। কেবল কখনো কখনো কাছের নদীতে বড়ো মাছ লাফিয়ে ওঠার আওয়াজ আর ক্ষুদ্র তরঙ্গ স্পর্শে সঞ্চালিত নদীতটের নলখাগড়া নড়ে উঠবার আবছা শব্দ কানে আসে। আগুনের মধ্যে কেবল মৃদু একটি চড়চড় শব্দ লেগে থাকে।

ছেলেগুলি আগুন ঘিরে বসে আছে; সেখানে বসে রয়েছে কুকুর দুটোও, যারা আমাকে গিলে খাবার জন্য অমন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওরা আমার উপস্থিতি মেনে নিতে পারছিল না, তন্দ্রায় জড়ানো পিটপিটে চোখে তাকাচ্ছিল আগুনের দিকে, আর মাঝে মাঝে আপন মর্যাদার একটি প্রখর অনুভূতি নিয়ে গরগর করে উঠছিল; প্রথমে গরগর করল, তারপর কেঁউকেঁউ করে কোঁকাল একটু, যেন ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব দেখে আক্ষেপ করছে। ছেলে ছিল সবসুদ্ধ পাঁচটি: ফেদিয়া, পাভলুশা, ইলিউশা, কোস্তিয়া আর ভানিয়া। (ওদের কথাবার্তা থেকে নামগুলো জেনেছি, এবার ওদের পরিচিত করিয়ে দিতে চাই পাঠকের কাছে।)

সব থেকে বড়োটি ফেদিয়া, ওর বয়স চোদ্দ বছর বলে মনে হবে। বেশ সুগঠিত দেহ, নাক মুখ চোখ ক্ষুদ্র, নম্র, সুদর্শন, কোঁকড়া হালকা রঙের চুল, উজ্জ্বল দৃষ্টি চোখের, আর সব সময় মুখে তার লেগে আছে একটি অর্ধ প্রফুল্ল, অর্ধ অসতর্ক হাসি। দেখে শুনে মনে হয় সে সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, মাঠে এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে নয়, মজা করার জন্য। গায়ে তার ঝকঝকে ছিটের শার্ট, তার চারদিকে হলুদ রঙের বেড় দেওয়া; গায়ে ঝোলানো হ্রস্ব নতুন ওভারকোট ছোটো কাঁধটি থেকে প্রায় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল; নীল বেল্টে গোঁজা রয়েছে একটি চিরুণী। বুটজুতো দুটো পায়ে একটু উপরেই উঠেছে, কিন্তু জুতো নিশ্চয় তারই — তার বাবার নয়। দ্বিতীয় ছেলেটি পাভলুশা, চুলগুলো এলোমেলো কালো, চোখ ধূসর কটা, চোয়াল প্রশস্ত, মুখখানা ফ্যাকাশে, তাতে বসন্তের দাগ, বড়ো কিন্তু সুসমঞ্জস মুখ, সব মিলিয়ে তার মাথাটি বড়ো — যাকে বলা হয় 'ডেকচির মতো মাথা' — আর আকৃতি তার চৌকো এবং কী রকম যেন আনাড়ির মতন। ও ছেলেটি সুদর্শন নয় — সে কথা অস্বীকার করা যায় না! — কিন্তু তবু ওকে আমার ভালো লাগল: ওকে দেখে মনে হয় বেশ কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন সরল অকপট প্রকৃতির ছেলে, তার গলার স্বরে বেশ সতেজ সুর আছে। সাজপোষাকে গর্ব করার তার ছিল না কিছু: গায়ে সামান্য একটি বাড়িতে তৈরি কাপড়ের শার্ট আর পরনে তালি-দেওয়া পাৎলুন। তৃতীয়টি ইলিউশা, তার মুখমণ্ডলে আকর্ষণের তেমন কিছু বিশেষ নেই: লম্বা মুখখানা, পিটপিটে চোখ, আর নাকটা বাঁকা: সবকিছুর মধ্যে একটা নিরানন্দ, খুঁতখুঁতে অস্বস্তি; চেপে-আঁটা ঠোঁট দুটিকে শক্ত অনড় বলে মনে হয়; ভ্রূ জোড়া কুঁচকেই আছে, কখনো সোজা হয় না; আগুনের

আলোয় যেন সে অনবরত মিটমিট করছে মনে হয়। তার শণের মতো প্রায় সাদা চুলগুলি নিচু ফেল্টের টুপির তলা দিয়ে ঝুলে পড়েছে সরু সরু আঁটি হয়ে, আর থেকে থেকে টুপিটা সে দু'হাত দিয়ে টেনে নামাচ্ছে কানের উপর। পায়ে তার ছালবাকলে বোনা নতুন জুতোর ভেতরে কাপড় জড়ানো; একটি মোটা দড়ি গায়ের সঙ্গে তিন পাক জড়িয়ে রয়েছে, তাতে বাঁধা তার পরিচ্ছন্ন, কালো কুর্তি। তাকে কিংবা পাভলুশাকে দেখলে বারো বছরের বেশি বলে মনে হয় না। চতুর্থটি কোস্তিয়া, দশ বছরের ছেলেটি তার গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। সারা মুখখানা তার ছোটো, পাতলা, দাগে ভরা, থুতনির কাছটিতে সুঁচলো কাঠবিড়ালীর মতো; ঠোঁট প্রায় দেখাই যায় না; কিন্তু তার বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটি আর তার তরল দীপ্তিময়ী দৃষ্টি অদ্ভুত একটি রেখাপাত করে: মনে হয় সে চোখ এবং তার দৃষ্টি এমন কিছু একটা ব্যক্ত করতে চাইছে মুখে — অন্তত তার মুখে — যার কোনো ভাষা নেই। আকৃতি তার ক্ষুদ্র এবং সে দুর্বল, সাজপোষাক অকিঞ্চিৎকর। বাকি ছেলেটি, ভানিয়াকে, আমি লক্ষ্য করি নি প্রথমটা; সে মাটিতে একটি বিদঘুটে মাদুরের তলায় শান্তিতে শুয়েছিল, কেবল মাঝে মাঝে বার করছিল বাদামী কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাটি, এই ছেলেটির বয়স খুব বেশি হলে সাত বছর।

এমনি করে ঝোপের নিচে একপাশে আমি শুয়ে তাকিয়ে রইলাম ছেলেদের দিকে। আগুনের একটি কুণ্ডের ওপর ঝুলছে ছোটো একটি ডেকচি, ওতে আলু রান্না হচ্ছে। ওটা দেখাশুনা করছে পাভলুশা, আর মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে ফুটন্ত জলে এক টুকরো কাঠ ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে হল কিনা। ফেদিয়া কনুইয়ে ভর করে শুয়ে ছিল, তার কোটের ধারগুলো ছড়িয়ে আছে। ইলিউশা বসে আছে কোস্তিয়ার পাশে, তখনো কেমন যেন বাধ্য হয়ে চোখ পিটপিট করে চলেছে। কোস্তিয়ার মাথাটি নিরাশ হয়ে ঝুঁকে পড়েছে, সে তাকিয়ে রয়েছে সুদূরের পানে। ভানিয়া মাদুরের তলায় নড়ছে না একটুও। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম। ধীরে ধীরে ছেলেরা আবার শুরু করল কথাবার্তা।

প্রথমে তারা এটা ওটা নিয়ে, কালকের কাজ, কিংবা ঘোড়াগুলোর বিষয়ে গালগল্প করে চলল; কিন্তু হঠাৎ ফেদিয়া ফিরল ইলিউশার দিকে, যেন পুরোনো কথার জের টেনে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'বল্ এবার, বাস্তু ভূতটাকে দেখেছিস তুই?'

ইলিউশা জবাব দেয় দুর্বল ভাঙা গলায়, 'না, আমি দেখি নি, কেউ দেখতে পায় না তাকে।' তার গলার স্বরের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তির অদ্ভুত মিল দেখা গেল; বলল, 'আমি তার শব্দ শুনেছি। হ্যাঁ, আর আমি শুধু একলা নয়।'

পাভলুশা প্রশ্ন করল, 'কোথায় থাকে সে — তোদের বাড়িতে?'

'পুরোনো কাগজ-কলে।'

'বা, তুই কি ফ্যাকটরীতে যাস নাকি?'

'যাই বৈকি। আমার ভাই আভদিউশকা আর আমি যাই, আমরা কাগজ প্লেন করার কাজ করি।'

'তাই নাকি? — ফ্যাক্‌টরী মজুর!..'

ফেদিয়া প্রশ্ন করল, 'বেশ, তারপর শব্দ শুনলি কী করে তার?'

'বলছি শোন। ব্যাপার হল এই যে, আমি আর আমার ভাই আভদিউশকা, আর ফিওদর মিখেয়েভস্কি আর ট্যারা ইভাশকা, আর লাল পাহাড়ের সেই আর এক ইভাশকা, আর ইভাশকা সুখরুকভ — আরো আরো ছেলেরাও ছিল সঙ্গে — সবসুদ্ধ আমরা ছিলুম দশজন — মানে পুরো শিফট্‌টা আর কি — ব্যাপার হল এই যে, আমরা রাত কাটালুম কাগজ-কলে; মানে, এমনি এমনি কাটাই নি, ওভারসিয়ার নাজারভ আমাদের আটকে রেখেছিল। বলল, 'ওহে ছেলেরা, বাড়ি গিয়ে সময় নষ্ট করবে কেন? কালকে কাজ আছে অনেক, কাজেই, ছেলেরা, বাড়ি আর যেয়ো না।' কাজেই থেকে গেলুম আমরা, সবাই একসঙ্গে শুয়ে পড়লুম, তারপর আভদিউশকা শুরু করল বলতে, 'আচ্ছা, এখন যদি বাস্তুভূত আসে?..' বলা তার শেষ হবার আগেই কে যেন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল; আমরা নিচে শুয়েছিলাম, আর সে হাঁটতে লাগল আমাদের ওপরতলায়, যেখানে চাকা আছে। আমরা শুনলাম কান পেতে; সে হেঁটে চলল; পাটাতন এমন ক্যাঁচ্‌কোচ করছে, মনে হয় তার ভারে দুমড়ে যাচ্ছে, তারপর আমাদের মাথার ওপর দিয়েই সে এল অন্য দিকটায়; হঠাৎ চাকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল; চাকাটা ঘড়ঘড় করেই চলল আর আবার আরম্ভ করল ঘুরতে, যদিও ওপরকার জলের নলের স্লুইসগুলো নামিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম, কে তুলল ওগুলো, যাতে জল গড়িয়ে যেতে পারে! যাই হোক, চাকাটা কিন্তু আর একটু একটু ঘুরল, তারপর থেমে গেল। তখন সে গেল ওপরের দরজার কাছে, নিচে নেমে আসতে লাগল, নিচে নেমে এল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি না করে; সিঁড়িগুলিও যেন তার ভারে কাতরে উঠল... যাই হোক, সে এল তো এক্‌কেবারে আমাদের দোরের কাছে, তারপর অপেক্ষা করল, অপেক্ষাই করল... তারপর হঠাৎ দোরটা একেবারে সাঁ করে খুলে গেল কেবল। আমরা ভয় পেয়ে গেছি, তাকালাম ওদিকে — না, কিছু নেই... হঠাৎ একটি বড়ো ভাণ্ডের উপরকার জাল নড়তে লাগল; ওটা উঠল ওখান থেকে, শূন্যে উঠতে লাগল, ডুবতে লাগল, চলতে লাগল, যেন ওটার সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে কেউ, তারপর আবার জায়গামতো গিয়ে স্থির হয়ে রইল ওটা। তারপর আর একটি ভাণ্ডের আঙটা পেরেক থেকে খুলে এল, একটু পরে আবার গিয়ে আটকে রইল পেরেকে; তারপর মনে হল কে যেন এসেছে দরজায় আর ভেড়ার মতো কেশে সে হেঁচকি খেল, কিন্তু এত জোরে!.. আমরা তো একেবারে দলা পাকিয়ে এ ওর গায়ে গায়ে লেগে রইলাম। ওঃ, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম সে রাত্রে!'

পাভলুশা বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা! সে কাশল কেন?'

'তা আমি জানি না; সম্ভবত ঠাণ্ডার জন্য।'

সবাই চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

ফেদিয়া শুধাল, 'কী, আলু সেদ্ধ হয়েছে?'

পাভলুশা দেখল পরীক্ষা করে।

'না, এখনো কাঁচা আছে...' তারপর বলল নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে, 'বাপ, কী ঝপাৎ শব্দ। নিশ্চয় একটা পাইক-মাছ... ওই দ্যাখ একটা তারা পড়ছে খসে।'

কোস্তিয়া বলল সরু তীক্ষ্ম গলায়, 'শোন্, আমি তোদের বলতে পারি একটা কথা, শোন্, আমার বাবা সেদিন কী বলেছিলেন।'

ফেদিয়া একটু মাতব্বরির ঢং-এ বলল, 'বল্, আমরা শুনছি।'

'গাভ্রিলাকে জানিস বোধহয়, সেই যে বড়ো গ্রামের ছুতোর গাভ্রিলা।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'কিন্তু জানিস কেন সে সব সময় বিষণ্ণ, কখনো কথা বলে না কেন? জানিস? কেন এমন বিষণ্ণ সে, বলছি শোন্: একদিন, বাবা বলেছেন, বুঝলি, একদিন ও বনে গেছল বাদাম কুড়োতে। বনে বাদাম কুড়োতে কুড়োতে পথ হারিয়ে ফেলল; কিন্তু চলতেই লাগল — ঈশ্বরই জানেন যাচ্ছে কোথায়। কেবল চললই, চললই, বুঝলি — কিন্তু কোনো লাভ হল না! -- পথ ও খুঁজে পেল না; সেই বাইরে থাকতে থাকতেই রাত্রি এসে পড়ল। ও তখন বসে পড়ল একটি গাছের তলায়। ভাবল, 'সকালবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। এমনি করে ঘুমিয়ে পড়ছে যখন হঠাৎ তখন শুনল কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। চোখ খুলে তাকাল ও— না, কেউ নয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ল, আবার সেই ডাক! বার বার ও তাকিয়ে দেখল: এবার সামনে দেখে গাছের শাখায় বসে বসে দুলছে এক মৎস্যকন্যা, ওকে ডাকছে কাছে আর হেসে আকুল হয়ে যাচ্ছে; সে কী তার হাসি!.. চাঁদের আলো ফুটফুট করছিল, এমন পরিষ্কার, স্বচ্ছ ফুটফুটে জোৎস্না — সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়, বুঝলি। ওকে ডাকল, আর শাখায় বসা তাকেও দেখা যাচ্ছিল বাটা মাছের মতো, নয়ত শোল মাছের মতো কিংবা ছোটো পুঁটি মাছের মতো, চকচকে আর সাদা, এমন সাদা আর চকচকে... ছুতোর গাভ্রিলা, বুঝলি কিনা, প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে না থেমে হেসেই চলল, আর ওকে এমনি করে কাছে ডাকতে লাগল। তখন গাভ্রিলা উঠে সেই মৎস্যকন্যার কাছে যেতে মনস্থ করছিল, কিন্তু — নিশ্চয়ই ঈশ্বর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন — ও নিজের বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল... আর সে ক্রুশ আঁকা কী যে শক্ত হয়েছিল তার পক্ষে, ভাই! ও বলেছে, 'হাতটা আমার যেন একেবারে পাথর একখানা, যেন নড়বে না।' উঃ, কী সাংঘাতিক ডাইনী!.. তারপর বুঝলি, ও যখন ক্রুশ আঁকল তখন সেই মৎস্যকন্যা, ভাই, সে হাসি বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি কান্না তার!.. সে কাঁদে, বুঝলি, আর চুল দিয়ে চোখের জল মোছে, তার সেই চুল ছিল ভাঙের মতো সবুজ। গাভ্রিলা তখন তার দিকে বার বার দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে, শেষে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'তুমি কাঁদছ কেন, বনের অপদেবী?' মৎস্যকন্যা তখন তাকে বলতে লাগল এই রকম, 'যদি নিজের বুকে তুমি ক্রুশ চিহ্ন না দিতে, তাহলে সারা জীবন ধরে তুমি আমার সঙ্গে বাস করতে পারতে মনের আনন্দে; আমি কাঁদছি, কারণ তুমি ক্রুশ এঁকেছ বলে আমি মর্মাহত হয়েছি; কিন্তু দুঃখু আমার একলারই হবে না; তুমিও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুঃখু করবে।'

এই বলেই না ভাই, সে তো গেল অদৃশ্য হয়ে, আর গাভ্রিলারও সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে বেরুবার পথ স্পষ্ট মনে পড়ল... তারপর থেকেই সে সর্বদা বিষণ্ণ, যেমনটি তোরা দেখিস।'

অল্প একটু নীরব থেকে ফেদিয়া বলল, 'উঃ! কিন্তু বনের অপদেবী একটা ক্রিশ্চানের মনকে নষ্ট করে দেয় কী করে — সে তো তার কথা শোনে নি?'

কোস্তিয়া বলল, 'বোঝ তা হলে! গাভ্রিলা বলেছে তার গলার স্বর ছিল ঠিক কোলাব্যাঙের মতো সরু আর করুণ।'

ফেদিয়া বলল, 'তোর বাবা নিজে এ কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তক্তপোষের ওপর শুয়েছিলাম, সব কথা আমি শুনেছি।'

'অদ্ভুত কান্ড! অমন বিষণ্ণ সে হবে কেন?.. বোধহয় কন্যা তাকে পছন্দ করেছিল, নইলে ডাকবে কেন?'

ইলিউশা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, পছন্দ করেছিল! বটেই তো! সে তাকে কাতুকুতু দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তা-ই ছিল তার ইচ্ছে। এই সব মৎস্যকন্যারা তাই করে থাকে।'

ফেদিয়া মন্তব্য করল, 'এখানেও মৎস্যকন্যারা হয়ত আছে আমার মনে হয়।'

কোস্তিয়া বলল জবাবে, 'না। এ জায়গাটা খোলামেলা পরিচ্ছন্ন। অবশ্য একটা জিনিস — নদীটা কাছে।'

সবাই চুপ। অকস্মাৎ দূর থেকে ভেসে এল একটা দীর্ঘ, প্রতিধ্বনিত, প্রায় বিলাপের ধ্বনি; রাত্রির সেই অবর্ণনীয় শব্দের একটি, যা গভীর নিঃশব্দের উপর সহসা ভেঙে পড়ে, ঊর্ধ্ব আকাশে ছড়িয়ে যায়, লেগে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর শেষে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। কান পেতে শোন: মনে হয় কোথাও কিছু নেই, তবু তখনো তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেন ঠিক দিগন্তে একজন কেউ টেনে টেনে কেঁদে উঠেছে, যেন আর একজন তার জবাবে বনের মধ্যে তীক্ষ্ন কর্কশস্বরে হেসে উঠেছে খল খল করে, আর তারপর একটি যেন মৃদু অথচ ভাঙ্গা গলার হিস্-হিসানি নদীর ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। ছেলেরা শিউরে উঠে তাকাল এদিক ওদিক...

ফিসফিস করে ইলিউশা বলল, 'যীশু আমাদের রক্ষা করুন!'

পাভলুশা বলল চেঁচিয়ে, 'আঃ, কাপুরুষ ভীতু কাক কোথাকার! ভয়টা পেলি কিসে? দ্যাখ্, আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে।' (ওরা সবাই এগিয়ে এল ডেকচিটার দিকে, গরম গরম ধোঁয়া-ছড়ানো আলু খেতে লাগল, কেবল ভানিয়া নড়ল না।) পাভলুশা বলল, 'কি রে, তুই যে আসছিস না?'

কিন্তু সে মাদুরের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এল না বেরিয়ে। শিগ্গিরই খালি হয়ে গেল ডেকচিটি।

ইলিউশা শুরু করল, 'জানিস তোরা, ভারনাভিৎসীতে কী হয়েছিল আমাদের?'

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল, 'বাঁধের কাছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁধের কাছে, ভাঙা বাঁধটার কাছে। সে একটা ভূতুড়ে জায়গা, এমন একটা ভূতুড়ে জায়গা, আর কী নির্জন। চারদিকে কেবল গর্ত আর খাদ, গর্তে আবার সাপ থাকে সব সময়।'

'আচ্ছা, কী হয়েছিল? বল্ তো।'

'বলছি, হ্যাঁ, ঘটনাটা এই। ফেদিয়া, তুই বোধহয় জানিস না, ওখানে কবর দেওয়া হয়েছিল জলে ডুবে-মরা একটি লোককে; লোকটি মরে অনেক অনেক দিন আগে, জল তখন গভীর ছিল; এখন কেবল কবরটা দেখা যায়, কোনক্রমে দেখা যায়... সামান্য একটা ছোটো স্তূপ মাত্র... যাই হোক, একদিন কুকুর তদারককারী ইয়েরমিলকে ডেকে নাজির বলল, 'ইয়েরমিল, ডাকে যাও।' ইয়েরমিল আমাদের হয়ে বরাবর ডাকে যায়; নিজের সবগুলো কুকুর যেন কী করে মরে গেছে; কেন কে জানে, তার কুকুর আর বাঁচে না, তার সঙ্গে তাই কোন কালেও কুকুর থাকত না, যদিও সে খুব ভালো একজন শিকারী, সব ব্যাপারেই পারগ। ইয়েরমিল তো গেল ডাকে, শহরে কাল কাটাল একটু, ফিরে যখন এল তখন সে একটু মাতাল। রাত্রি হয়েছে, চমৎকার রাতটি; চাঁদ হাসছে... ইয়েরমিল বাঁধ বরাবর আসছিল; ওখান দিয়েই তার পথ। ওখান দিয়ে সে আসছে, এমন সময় চোখে পড়ল সেই জলে ডুবে-মরা লোকটির কবরের ওপর একটি ভেড়ার বাচ্চা ছুটোছুটি করছে, চমৎকার সাদা সুন্দর বাচ্চা, গায়ের লোম কোঁকড়া। ইয়েরমিল ভাবল, 'ওটাকে নেব আমি,' এই ভেবে নামল ঘোড়া থেকে আর ভেড়ার বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। ওটার কিন্তু কোনো খেয়াল নেই। ইয়েরমিল ফিরে গেল ঘোড়াটার কাছে, ঘোড়াটা কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, নাক ঘোঁৎঘোঁৎ করল, মাথা নাড়াল; কিন্তু সে ঘোড়াটাকে বলল 'উয়ো,' তারপর বাচ্চা ভেড়াটাকে নিয়ে চেপে বসল ঘোড়ায়, আবার চলতে লাগল; বাচ্চা ভেড়াটাকে ধরে রাখল সামনে। সে ওটার দিকে তাকায় আর বাচ্চাটিও তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সোজা, এই রকম করে। শিকারী ইয়েরমিল বিচলিত বোধ করল। ভাবল, 'ভেড়া এমনি করে কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এ রকম ব্যাপার তো মনে পড়ে না।' যাই হোক, সে তো ওর লোমে এমনি করে চাপড় মারতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'টাক্! টাক্!' হঠাৎ তখন সেই ভেড়ার বাচ্চাটা দাঁত দেখাল আর বলে উঠল, 'টাক্! টাক্!..''

ছেলেটি গল্প বলতে বলতে শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করতে-না-করতেই সহসা দুটো কুকুরই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, এবং ক্ষেপার মতো ঘেউঘেউ করতে করতে আগুনের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেরা সবাই গেল ভয় পেয়ে। ভানিয়া মাদুরের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। পাভলুশা চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল কুকুর দুটোর পেছনে। দূরে ঘেউঘেউ শব্দটা মিলিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি... আতঙ্কিত ঘোড়ার পালের এলোমেলো অস্বস্তিতে ভরা পায়ের শব্দ কানে এল। পাভলুশা জোরে চীৎকার করে উঠল, 'হেই, সেরী! জুচ্কা!' কয়েক মিনিটের মধ্যে কুকুরের ডাক গেল থেমে; দূরে তখনো পাভলুশার গলা শোনা যাচ্ছে... আরো একটুখানি সময় কেটে গেল; ছেলেগুলি হতচকিত হয়ে তাকাচ্ছিল এ ওর দিকে, যেন কিছু একটা ঘটবার জন্য অপেক্ষা করছে... সহসা একটা ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ শোনা গেল; কাঠের

স্তূপের সামনে এসে থেমে গেল ওটা, আর ঘোড়ার কেশর ধরে পাভলুশা দ্রুতবেগে লাফিয়ে পড়ল। কুকুর দুটোও ছুটে এসে পড়ল আগুনের দীপ্তির রেখা-বেষ্টনীর মধ্যে, তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল, ঝুলিয়ে দিল লাল জিভ।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? ব্যাপার কী?'

ঘোড়াটার দিকে হাত বাড়িয়ে পাভলুশা বলল, 'কিছু না। মনে হয়, কুকুর দুটো কোনো গন্ধ পেয়েছিল।' তারপর ধীরে শান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম একটা নেকড়ে বোধহয়।'

পাভলুশার তারিফ না করে পারি নি। সেই মুহূর্তে সে চমৎকার। তার কুশ্রী মুখ দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে জীবন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাতে কঠোরতা এবং দৃঢ়তার আভা। হাতে একটি ছড়ি না নিয়েও, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে রাত্রির অন্ধকারে ছুটে গিয়েছিল একলা একটা নেকড়ের মোকাবিলা করতে। তার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলুম, 'কী চমৎকার ছেলেটা!'

কাঁপতে কাঁপতে বলল কোস্তিয়া, 'তাহলে এখানে কেউ কি নেকড়ে দেখেছিল?'

পাভলুশা বলল, 'এখানে বরাবরই তো অনেক নেকড়ে; কিন্তু জ্বালাতন করে কেবল শীতকালেই।'

আবার সে আগুনের সামনে গুটিসুটি মেরে বসল। মাটিতে বসে একটা কুকুরের লোমশ মাথায় হাতখানা রাখল। অনেকক্ষণ পশুটা আদর পেয়ে মাথাটা আর ঘোরাল না, পাভলুশার দিকে তাকিয়ে একপেশে হয়ে রইল কৃতজ্ঞতা মেশানো গর্ব নিয়ে।

ভানিয়া আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল মাদুরের তলায়।

ফেদিয়া — সম্পন্ন কৃষকের ছেলে, তার ভূমিকা হল কথাবার্তা চালিয়ে নেওয়া; সে শুরু করল, 'কী সব ভয়ানক গল্প আমাদের বলছিলি, ইলিউশা?' (ফেদিয়া নিজে কথা বলে কম; নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় পাছে স্পষ্টত এই ভয়ে।) 'আর তারপর কোন দত্যিদানা কুকুর দুটোকে ডাকিয়ে তুলল... হ্যাঁ, আমি শুনেছি তোদের ওই জায়গাটা ভূতের বাসা।'

'ভারনাভিৎসী?.. আমারও মনে হয় জায়গাটা ভূতুড়ে! লোকে বলে, একাধিকবার তারা সেখানে বুড়ো কর্তাকে দেখেছে — বুড়ো কর্তা যিনি মারা গেছেন। তারা বলে, তিনি পরে থাকেন একটি লম্বা ঝুলনো কোট, আর এমনি করে কোঁকান, আর কী যেন খুঁজে বেড়ান মাটিতে। একবার তাঁর সঙ্গে ত্রফিমিচ দাদুর দেখা হয়েছিল। সে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা ইভান ইভানিচ, মাটিতে আপনি আজ্ঞে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন?''

ফেদিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করল?'

'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করল তাঁকে।'

'আচ্ছা! এরপর ত্রফিমিচকে বীর পুরুষই বলতে হয়... তারপর?.. তিনি কী বললেন?'

'তিনি বললেন, 'সেই শেকড়টা খুঁজছি যাতে সবকিছু ফেটে চৌচির হয়ে যায়।' কিন্তু এমন ভারী গলায় কথা বলেন তিনি, এমন ভারী গলায়। 'কিন্তু হুজুর, সব-ফাটানো ও রকম

শেকড় আপনি চাইছেন কেন?' 'কবরটা আমার ওপর চেপে বসেছে; চেপে বসেছে আমার ওপর, ত্রফিমিচ: আমি বেরিয়ে আসতে চাই — পরিত্রাণ পেতে চাই।''

ফেদিয়া বলল, 'শোন কথা! বোধহয় বেঁচে থাকতে সব সাধ তাঁর পূরণ হয় নি।'

কোস্তিয়া বলল, 'বা রে মজা! আমি ভেবেছিলাম মড়াদের দেখা যায় কেবল মা-বাবার স্মৃতি তর্পণের দিনে।'

ইলিউশা মাঝখান থেকে বলে উঠল দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, 'মড়াদের যে কোনো সময় দেখা যায়।' যা লক্ষ্য করলাম তাতে মনে হল অন্যান্যদের চেয়ে গ্রামের কুসংস্কারগুলি ও বেশি জানে। 'কিন্তু স্মৃতি তর্পণের দিনে জীবিতদেরও দেখা যায়, মানে, যারা সে বছর মারা যাবে সেই সব জীবিতকে। কেবল গির্জার অলিন্দে বসে থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে। রাস্তা ধরে তারা চলে যাবে পাশ দিয়ে, মানে যারা আর কি মারা যাবে সে বছর। গতবার বুড়ী উলিয়ানা গেছল অলিন্দে।'

কোস্তিয়া কৌতূহলভরে প্রশ্ন করল, 'সে কি দেখেছিল কাউকে?'

'অবশ্য। প্রথমটা সে বসে রইল অনেক, অনেকক্ষণ ধরে, কাউকে দেখল না, শুনল না কিছু... কেবল মনে হতে লাগল যেন কোথায় একটা কুকুর কেঁউকেঁউ করে চলেছে, কেঁউকেঁউ করে চলেছে... হঠাৎ সে তাকাল চোখ তুলে: রাস্তা দিয়ে শুধু শার্ট গায়ে দিয়ে একটি ছেলে আসছে। তার দিকে তাকাল। ছেলেটি ইভাশকা ফেদসেয়েভ...'

ফেদিয়া বলল, 'যে সেই বসন্তকালে মারা গেল?'

'হ্যাঁ, সে-ই। সে হেঁটে এগিয়ে এল, কিন্তু একবারও মাথাটা তুলল না... কিন্তু উলিয়ানা তাকে চিনত। এরপর সে আবার চোখ তুলে তাকাল: একটি মেয়ে এল হেঁটে... সে তার দিকে তাকিয়ে রইল, আবার তাকাল... আহা! হা ঈশ্বর!.. রাস্তা ধরে সে যে নিজেই আসছে, হ্যাঁ, উলিয়ানা নিজেই।'

ফেদিয়া বলল, 'সে-ই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন, সে-ই।'

'বেশ, কিন্তু ও তো এখনো মারা যায় নি?'

'বছর এখনো শেষ হয় নি! আর, ওকে চেয়ে দেখিস না কেন, ওর তো এখন তখন অবস্থা।'

আবার সবাই নীরব। পাভলুশা এক মুঠো শুকনো ডালপালা আগুনে ফেলে দিল। অকস্মাৎ লক্‌লক্‌ করে ওঠা আগুনের শিখায় ওগুলো শীঘ্রই পুড়ে উঠল, কট্‌ কট্‌ করে উঠল কাঠগুলো, ধোঁয়া উঠল, তারপর জ্বলন্ত দিকগুলো বেঁকে উঠে কাঠগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যেতে লাগল। চারদিকে, বিশেষ করে ওপর দিকে ঝলক দিতে লাগল আগুনের ভাঙা ভাঙা ঝকঝকে শিখাগুলি। সহসা সাদা একটি ঘুঘু উড়ে এল একেবারে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে, লাল আভায় রক্তিম হয়ে চারদিকে ভয়ে ঘুরতে লাগল পাখা ঝটপট করে, তারপর পাখা ফুর্‌র্‌ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাভলুশা বলল, 'বোধহয় বাসা হারিয়ে ফেলেছে পাখিটা। এখন উড়েই চলবে যতক্ষণ না কোথাও একটু আশ্রয় পায়, যেখানে ভোরবেলা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পারে।'

কোস্তিয়া বলল, 'কেন পাভলুশা, এটি স্বর্গে উড়ে যাওয়া কোন পুণ্যাত্মা হতে পারে না?'

পাভলুশা আর এক মুঠো কাঠ ফেলে দিল আগুনে।

শেষে বলল, 'হয়ত।'

ফেদিয়া শুরু করল, 'কিন্তু পাভলুশা, বল্ তো, তোরা কি শালামভোতেও স্বর্গীয় অলক্ষণ* দেখেছিস?'

'যখন সূর্য আর দেখা যায় না? হ্যাঁ, দেখেছি বটে।'

'ভয়ও পেয়েছিস?'

'পেয়েছিলাম, কিন্তু কেবল আমরাই ভয় পাই নি। আমাদের কর্তা আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন এক স্বর্গীয় অলক্ষণ দেখা দেবে, কিন্তু যখন আঁধার হল তখন, লোকে বলে, ভয়ে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছল। চাকর-বাকরদের কুটিরটায় বুড়ীটা অন্ধকার হতে-না-হতেই শিক দিয়ে উনুনে সবগুলো পাত্র ভেঙে ফেলেছিল। বলেছিল, 'কে আর খাবে এখন? শেষের সে দিন তো এসেছে।' সারা বাড়িতে ঝোল তরকারী সবকিছুর স্রোত বয়ে গেল। আর গ্রামে আমাদের মধ্যে কত রকম সব গল্প: সাদা নেকড়ে সব পৃথিবী চষে বেড়াবে আর মানুষ ধরে খাবে, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে একটা শিকারী পাখি, তাছাড়া এমন কি ত্রিশকাকেও** দেখা যাবে।'

কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ত্রিশকা কী?'

বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে ইলিউশা বলল, 'কেন, জানিস না? কী ভাই, এমন কোথায় মানুষ হয়ে উঠেছিস যে ত্রিশকা জানিস না? তোদের গাঁয়ের লোকজন ঘরকুনো, একেবারেই ঘরকুনো! ত্রিশকা আশ্চর্য লোক, একদিন সে আসবে, আর এমন আশ্চর্য লোক সে যে অন্য লোকে তাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না, কেউ কখনো তার কিছু করতে পারবে না, এমন আশ্চর্য লোক। লোকজন তাকে ধরবার চেষ্টা করবে: যেমন ধর্, লাঠি নিয়ে তারা ধাওয়া করবে, ঘিরে ধরবে তারা, কিন্তু সে তাদের চোখে ধুলো দেবে, আর অন্ধের মতো তারা এর ওর গায়ে গিয়ে পড়বে। কিংবা ধর্, তাকে ওরা হাজতে দেবে; সে তখন একটি বাটিতে করে খাবার জল চাইবে: নিয়ে আসবে বাটি, আর সে তখন ওতে ডুব দিয়ে তাদের কাছে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার হাত বাঁধবে শেকল দিয়ে, কিন্তু সে কেবল হাততালি দেবে — আর শেকল খুলে পড়ে যাবে। এমনি করে ত্রিশকা যাবে গ্রামে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, আর এই ত্রিশকা হবে সেয়ানা; সে খ্রীস্টসন্তানদের বিপথে নিয়ে যাবে... আর তারা তার কিছুই করতে পারবে না... এমন আশ্চর্য আর চালাক সে।'

পাভলুশা ধীরে সুস্থে বলতে থাকল, 'আচ্ছা বেশ, তাহলে সে হচ্ছে ওই রকম। আর তাই আমাদের অঞ্চলে লোকে মনে করছিল সে আসবে। বুড়োরা বলল, 'যেমনি শুরু হবে স্বর্গীয়

* আমাদের অঞ্চলে কৃষকরা সূর্যগ্রহণকে এই নামে অভিহিত করে। (টীকা লেখকের।)

** সম্ভবত খ্রীস্টদ্রোহী বিষয়ে কোনো কাহিনী থেকে ত্রিশকা সম্পর্কে লোকেদের ধারণা জন্মেছে। (টীকা লেখকের।)

অলক্ষণ অমনি আসবে ত্রিশকা।' শুরু হল স্বর্গীয় অলক্ষণ। গ্রামের সব লোক ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায় রাস্তায়, মাঠে প্রান্তরে, কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের অঞ্চলটা, জানিস তো, খোলামেলা অঞ্চল। লোকেরা তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বড়ো গ্রামের পাহাড়ের পাশ বেয়ে কেমন ধরনের একটা লোক আসছে; এমন অদ্ভুত লোকটা, এমন অপূর্ব তার মাথা যে সবাই চীৎকার করে ওঠে, 'ওই ত্রিশকা আসছে! ঐ, ত্রিশকা আসছে!' এই না বলে সবাই সব দিকে ছুটতে থাকল! আমাদের মোড়ল হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন একটা গড়খাই-এ; তাঁর স্ত্রী গেটের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন; তাতে তাঁর উঠোনের কুকুরটা এমন ভয় পেয়ে গেল যে শেকল ছিঁড়ে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে চলে গেল বনে; আর কুজ্‌কার বাবা দরফেইচ ছুটে ওটের খেতে গিয়ে ঢুকে সেখানে বসে পড়লেন, আর ভারুই পাখির মতো কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, 'দুশমনটা, শয়তানটা হয়ত অন্তত পাখি-পাখালীদের রেহাই দেবে।' তারা সব এমনি ভয় পেয়ে গেল! কিন্তু রাস্তা দিয়ে আসছিল আসলে আমাদের পিপে তৈরি করে যে, সেই ভাভিলা; সে একটা নতুন কলসী কিনেছে আর মাথার ওপর সেইটি বসিয়ে নিয়ে আসছিল।'

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল, আবার একটু নীরবতা। খোলা ময়দানে লোকজন যখন কথাবার্তা বলে তখন এমনিই হয়। রাত্রির গম্ভীর নিঃশব্দ মহিমার দিকে তাকালাম: সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতে যে একটি শিশিরসিক্ত সজীবতা ছিল, মধ্যরাত্রিতে তার বদলে দেখা দিয়েছিল শুকনো উত্তাপ; নিদ্রামগ্ন প্রান্তরের ওপরে নরম যবনিকায় এই উত্তাপ আরো বহুক্ষণ আটকে থাকবে; ঊষার প্রথম গুঞ্জন, প্রথম শিশিরকণা দেখা দেবার আরো অনেক দেরী আছে। আকাশে চাঁদ ছিল না: এই সময় বিলম্বিত চাঁদ উঠত। অসংখ্য সোনালী তারা যেন ঝিকমিক করছে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে, মনে হচ্ছে সবাই যেন ভারি অবলীলাক্রমে ছুটে চলেছে ছায়াপথের দিকে, আর সত্যি, ওদের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর বিরামবিহীন, ঘূর্ণায়মান গতি যেন প্রায় স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়... অদ্ভুত একটা কর্কশ করুণ কান্নার শব্দ দুবার শোনা গেল নদীর ওপর, কয়েক মুহূর্ত পরে, আরো খানিকটা দূরে শব্দটা আবার শোনা গেল...

কোস্তিয়া কেঁপে উঠল থরথর করে। 'ও কী?'

পাভলুশা শান্তস্বরে বলল, 'ও একটা বড়ো বকের চীৎকার।'

কোস্তিয়া পুনরাবৃত্তি করল, 'বক...' একটুখানি থেমে আবার বলল, 'কাল সন্ধ্যায় যা শুনেছিলাম সেটা তাহলে কী, পাভলুশা? তুই বোধহয় জানিস...'

'কী শুনেছিলি?'

'কী শুনেছিলাম বলছি। আমি কামেন্নায়া গ্রিয়াদা থেকে যাচ্ছিলাম শাশকিনোতে। প্রথমে আমাদের আখরোট ঝোপের মধ্য দিয়ে গেলাম, তারপর ছোটো একটি ঝিলের পাশ দিয়ে — তুই জানিস, যেখান থেকে পাথরের নালার দিকে যেতে একটা খাড়া বাঁক আছে — সেখানে একটা গভীর জলা আছে, জানিস নলখাগড়ায় প্রায় ভর্তি, আমি বুঝলি, জলাটার কাছে গেছি, এমন সময় হঠাৎ ওটা থেকে শব্দ এল একটা, যেন কেউ কোঁকাচ্ছে, আর কী করুণ সে সুর, কী করুণ:

'উ-উ, উ-উ!' আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম ভাই, তখন বেলা গাড়িয়ে গেছে, আর স্বরটা এমন করুণ, দুঃখে ভরা। আমার মনে হল আমি নিজেই কে'দে ফেলব... ওটা কী হতে পারে বল তো, অ্যাঁ?'

পাভলুশা বলল, 'ওই জলাতেই গত গ্রীষ্মকালে চোরেরা বন-রক্ষক আকিমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, বোধহয় তার আত্মাই বিলাপ করছিল।'

কোস্তিয়ার চোখ দুটি তো একেই গোল, তার ওপর সেগুলো বিস্ফারিত করে সে বলল, 'ও মা, তাই নাকি ভাই? আমি তো জানতুম না যে আকিমকে ওই গর্তেই ডুবিয়ে দিয়েছিল। জানলে আমি নিশ্চয় আরো বেশি ভয় পেতুম!'

পাভলুশা এরপর বলল, 'কিন্তু লোকে বলে, ছোটো ছোটো ক্ষুদে ব্যাঙ আছে, ওরা অমনি করুণ সুরে চীৎকার করে।'

'ব্যাঙ? না, না, ব্যাঙ নয় তা... কক্ষনো না...' (নদীর ওপর আবার চীৎকার করে উঠল বড়ো বকটা।) কোস্তিয়া অনিচ্ছায় বলে উঠল জোরে, 'উঃ, ওই যে — ঠিক যেন বুনো-ভূত চে'চাচ্ছে।'

ইলিউশা বলল, 'বুনো-ভূত চে'চায় না, ও বোবা; শুধু হাততালি দেয় আর খটখট করে...'

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল বিদ্রূপ মিশিয়ে, 'তুই তাহলে বুনো-ভূত দেখেছিস?'

'না, দেখি নি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, ও যেন আমার না দেখতে হয়; কিন্তু অন্য লোকে দেখেছে। কী বলব, একদিন আমাদের ওদিকে বুনো-ভূত একটি চাষীকে পথ ভুলিয়ে বন-বাদাড় পার করে একটা মাঠের মাঝখানে ঘুরিয়েছিল... বাড়ি পে'ছিতে প্রায় রাত কাবার।'

'আচ্ছা, চাষীটা দেখেছিল ওকে?'

'হ্যাঁ। সে বলে, ভূতটা প্রকাণ্ড, বিরাট, কালো, কোনো আকৃতি নেই, যেন একটা বড়ো গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল; ভালো করে বোঝা যায় না, যেন চাঁদের আলো থেকে লুকিয়ে ছিল ভূতটা, প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে তো আছেই, আর পিট্‌পিট্ করছে চোখ...'

ফেদিয়া একটুখানি কে'পে উঠে বলল, 'উঃ!' ঘাড়টা একটু ঝাঁকিয়ে বলল, 'ফু-উ!'

পাভলুশা বলল, 'আর কী করে যে এ রকম নোংরা জীব আসে পৃথিবীতে, সে আশ্চর্য!'

ইলিউশা বলল, 'নিন্দা করিস না ওর, সাবধান, শুনতে পাবে।'

আবার একটু নীরবতা।

হঠাৎ ভানিয়ার ছেলেমানুষি গলা শোনা গেল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, ভাই, ভগবানের ঐ ছোটো ছোটো তারাগুলোর দিকে দ্যাখ; মৌমাছিদের মতো থোপা বে'ধেছে তারাগুলো!'

ঢাকনা থেকে সে তার ছোটো সজীব মুখখানা বার করল, ছোটো মুঠির ওপর ভর করে ধীরে ধীরে বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ দুটি তুলে ধরল। সব ছেলেদেরই চোখ তখন আকাশ পানে, তাড়াতাড়ি চোখ নামাল না তারা।

ফেদিয়া আদরের সুরে বলতে শুরু করল, 'আচ্ছা ভানিয়া, তোর বোন আনিউৎকা ভালো আছে?'

অল্প একটু আধো-আধো ভাব নিয়ে ভানিয়া জবাব দিল, 'হ্যাঁ, খুব ভালো আছে।'

'জিজ্ঞেস করিস তো, আমাদের ওখানে ও আসে না কেন?'

'তা আমি জানি না।'

'তাকে আসতে বলিস।'

'বেশ।'

'বলিস, ওর জন্য একটা উপহার আছে আমার কাছে।'

'আমার জন্যও?'

'হ্যাঁ, তোর জন্যও।'

ভানিয়া দীর্ঘশ্বাস টানল।

'না, আমার চাই নে। ওকেই দিস উপহার: আমাদের সে বড্ড ভালো!'

ভানিয়া আবার মাটিতে মাথাটি নামিয়ে রাখল। পাভলুশা উঠে দাঁড়াল, হাতে করে নিল খালি ডেকচিটি।

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললি তুই?'

'নদীতে, জল আনতে; একটু জল খাব।'

কুকুর দুটো উঠে গেল তার পেছন পেছন।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল ইলিউশা, 'সাবধান, দেখিস নদীতে পড়ে যাস না যেন!'

ফেদিয়া বলল, 'পড়বে কেন? ও সাবধানে যাবে।'

'হ্যাঁ, সাবধান হবে। কিন্তু কত রকম সব ঘটনা ঘটে; জল ভরতে গিয়ে হয়ত একটু নুয়ে পড়বে, আর তখন জল-ভূত ওর হাত ধরে টেনে একেবারে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবে। লোকে তখন বলবে, 'ছেলেটা জলে পড়ে গেছল।' পড়েই গেছল বটে!..' কান পেতে শুনে সে বলল তারপর, 'এই দ্যাখ, ও গেছে নলখাগড়া বনে।'

নলখাগড়া বনে পথ কেটে চলবার সময় শব্দ উঠল -- আমরা যাকে 'সড়সড়্' বলি — সেই রকম শব্দ।

কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ও কথা কি সত্যি যে জলে পড়ে যাওয়ার পর থেকে আকুলিনা পাগল হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, তারপর থেকেই... এখন সে কী ভয়ানক হয়ে উঠেছে! কিন্তু সবাই বলে ওর আগে সে আশ্চর্য সুন্দরী ছিল। জল-ভূত তাকে যাদু করেছিল। আমার মনে হয় জল-ভূতটা বুঝতে পারে নি যে লোকজন তাকে অত তাড়াতাড়ি তুলে ফেলবে জল থেকে। তাই ওইখানে জলের তলায় সে তাকে মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

(আমি এই আকুলিনাকে দেখেছি একাধিকবার। তার পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া, অসম্ভব রোগা, মুখটা কয়লার মতো কালো, দৃষ্টি ক্ষীণ। আর সব সময় দাঁত বার করে থাকে, এই আকুলিনা রাজপথের একটি জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, পা দাপায়, অস্থিচর্মসার হাত

দ্বটো দিয়ে চেপে ধরে ব্বকটা, আর ধীরে ধীরে খাঁচায় পোরা ব্বনো জানোয়ারের মতো এক পা থেকে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তাকে যা বলা হত তার কিছ্বই সে বোঝে না, কেবল মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো করে হাসে।)

কোস্তিয়া বলে চলল, 'কিন্তু লোকে বলে আকুলিনা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল নিজেই, তার প্রেমিক তাকে ঠকিয়েছিল বলে।'

'হ্যাঁ, তাই।'

কোস্তিয়া এর পর বলল কর্বণভাবে, 'আর ভাসিয়াকে মনে আছে তোর?'

ফেদিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোন ভাসিয়া?'

কোস্তিয়া জবাবে বলল, 'কেন, যে ডুবে গেছল! ডুবেছিল এই নদীতেই। আঃ, কী ছেলেই না ছিল! কী ছেলেই না ছিল, আহা! তার মা ফেকলিস্তা, কী ভালোই বাসতেন ছেলেকে, ভাসিয়াকে! আর তাঁর, হ্যাঁ ফেকলিস্তার কেমন একটা ভয় ছিল যে ছেলের বিপদ আসবে জল থেকে। মাঝে মাঝে গরমের দিনে ভাসিয়া যখন আমাদের সঙ্গে দল বেঁধে নদীতে চান করতে যেত, তখন তিনি থরথর করে কাঁপতেন। অন্যান্য মেয়েরা কিছ্ব মনেই করত না; তারা ঘড়া নিয়ে পাশ দিয়ে হেলে দ্বলে বাড়ির দিকে চলে যেত, আর ফেকলিস্তা ঘড়া মাটিতে নামিয়ে রেখে ছেলেকে ডাকতে থাকতেন, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়, আমার মাণিক; সোনা, ফিরে আয়!' তারপর কী করে সে জলে ডুবল তা কেউ জানে না। পাড়ে সে খেলছিল, আর তার মা সেখানে খড় শ্বকোচ্ছিলেন; সহসা শ্বনলেন তিনি যেন জলের মধ্য দিয়ে কেউ ব্বড়ব্বড়ি কাটছে, তারপর একি! নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে কেবল ভাসিয়ার টুপিটা। সেদিন থেকে জানিস, ফেকলিস্তার মাথার ঠিক নেই: ভাসিয়া যেখানে নদীতে ডুবে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে শ্বয়ে থাকেন তিনি; ওখানে শ্বয়ে শ্বয়ে, ভাই, তিনি গান করেন একটা — তোদের বোধহয় মনে আছে ভাসিয়া সব সময় ও রকম গান গাইত — তাই তিনিও গান করেন, আর কাঁদেন, কেবল কাঁদেন, আর ভগবানকে তিক্ত নালিশ জানান।'

ফেদিয়া বলল, 'ওই যে পাভল্বশা আসছে।'

পাভল্বশা একটা প্বর্ণ ডেকচি হাতে নিয়ে আগ্বনের কাছে চলে এল।

একটু নীরব থেকে সে শ্বর্ব করল, 'শ্বনছিস, একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

'কী, কী?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

'আমি ভাসিয়ার গলা শ্বনতে পেলাম।'

সবাই তারা যেন শিউরে উঠল।

তোতলাতে তোতলাতে কোস্তিয়া বলল, 'তার মানে কী? কী বলছিস?'

'জানি নে। আমি শ্বধ্ব জলের কাছে ন্বয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শ্বনলাম ভাসিয়ার গলায় আমার নাম ধরে ডাকছে, যেন জলের তলা থেকে আসছে ডাকটা। 'পাভল্বশা, পাভল্বশা, এসো এখানে।' আমি চলে এলাম সরে। অবশ্যি জল নিয়ে এসেছি।'

ছেলেরা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলল, 'আহ্, ভগবান দয়া করুন আমাদের!'

ফেদিয়া বলল, 'তোকে ডাকছিল জল-ভূত, পাভলুশা, আমরা এই এক্ষুনি ভাসিয়ার কথা বলছিলাম।'

ইলিউশা বলল জোর দিয়ে, 'আহ্, এটা অমঙ্গলের লক্ষণ।'

'থাকগে, ভাবিস না কিছু!' পাভলুশা বলল বলিষ্ঠ সুরে, তারপর বসল আবার, 'কেউ তো আর নিয়তি এড়াতে পারে না।'

ছেলেগুলি নীরব নিঃশব্দ। স্পষ্ট বোঝা গেল, পাভলুশার কথাগুলো গভীর রেখাপাত করেছে তাদের মনে। আগুনের সামনে ওরা শুয়ে পড়তে লাগল, যেন ঘুমুনোর জন্য তৈরি হচ্ছে।

সহসা মাথা তুলে কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল:

'ও কী?'

শোনে পাভলুশা।

'কোঁচ-বক উড়ছে আর শিস্ দিচ্ছে।'

'কোথায় যাচ্ছে উড়ে?'

'এমন একটি দেশে যেখানে, লোকে বলে, শীত নেই।'

'কিন্তু এ রকম দেশ কি আছে?'

'আছে।'

'অনেক দূরে?'

'অনেক, অনেক দূরে, উষ্ণ সমুদ্র ছাড়িয়ে।'

কোস্তিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

ছেলেদের মধ্যে এসে জোটার পর তিন ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেছে। অবশেষে চাঁদ উঠল; প্রথমে আমি লক্ষ্য করি নি, এমন ছোটো বাঁকা চাঁদ। আগের মতোই চন্দ্রহীন এই রাত্রি ছিল স্তব্ধ গম্ভীর নিথর... কিন্তু অনেক অনেক তারা, কিছুক্ষণ আগে ঊর্ধ্ব আকাশে সেগুলি ছিল, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অন্ধকার বেষ্টনী ছাড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে; চারদিকে সবকিছু একেবারে নিথর নিস্পন্দ, ভোরের ঠিক আগে যেমন হয়ে থাকে; সবাই ঘুমুচ্ছে একটানা ঘুম যা আসে প্রত্যূষের পূর্বে। বাতাসের সৌরভ এর মধ্যেই আরো অনেকটা মৃদু হয়ে গেছে, আর একবার যেন শিশির ঝরে পড়ছে... গ্রীষ্মকালে রাত কত ছোটো!.. আগুন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের কথাবার্তা থেমে গেছে। এমন কি কুকুর দুটো পর্যন্ত ঝিমুচ্ছে, তারার আবছা, প্রায় অস্পষ্ট আলোর আভায় যতটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে দেখা গেল ঘোড়াগুলো মাথা নিচু করে ঘুমিয়ে পড়েছে... আমার কী রকম একটা ক্লান্ত আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল, তারপর তা নিদ্রায় প্রসারিত হয়ে গেল।

মুখের ওপর দিয়ে তাজা হাওয়া বয়ে গেল। চোখ খুললাম — ভোর হচ্ছে। প্রভাত আলোক এখনো আকাশ রাঙিয়ে তোলে নি, কিন্তু পূর্বাচল ফর্সা হতে শুরু করেছে। চারদিকে সবকিছুই দৃশ্যমান, যদিও একটু আবছা। ফ্যাকাশে-ধূসর আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে, শীতল হচ্ছে, নীলচে

হয়ে যাচ্ছে; তারাগুলি আরো ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে, কিংবা অদৃশ্য, লুপ্ত হয়ে গেছে; মাটি ভেজা, গাছের পাতায় পাতায় শিশির জমেছে; দূর থেকে আসছে জীবনের সাড়া, আসছে কণ্ঠস্বর, ভোরের নরম হাওয়া পৃথিবীর ওপর দিয়ে ফুরফুর করে বয়ে গেল। একটি মধুর কোমল আনন্দের শিহরণে তাতে সাড়া দিল আমার দেহ। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম ছেলেদের কাছে। ওরা সব ধিকি ধিকি আগুন ঘিরে ঘুমুচ্ছে, যেন একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে; কেবল পাভলুশা শরীরটা অর্ধেক উঠিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একাগ্রভাবে।

তার উদ্দেশে মাথা নেড়ে কুয়াশায় ঢাকা নদীর পাশ দিয়ে বাড়িমুখো চললাম। দুই ভার্স্ট‌ও হাঁটি নি, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই আমার চারিদিকে, প্রসারিত শিশির-ভেজা প্রান্তরের ওপর দিয়ে, সামনে, বন থেকে বনে বনান্তরে, যেখানে পাহাড়গুলো আবার সবুজ হয়ে উঠেছে, পিছনে, দীর্ঘ ধুলো-মাখা পথে আর ঝকঝকে ঝোপঝাড়গুলোর ওপরে, একেবারে সবকিছু — রক্ত আভায় রঙীন হয়ে উঠল। নদীটা কুয়াশা কেটে নীলাভ হয়ে উঠেছে, আর তাতে বয়ে চলেছে তরল আলোর নতুন নতুন স্রোত, প্রথমে তা পাটল, তারপর লাল আর সোনালী... সবকিছু স্পন্দিত হতে শুরু করেছে, শুরু করেছে জেগে উঠতে, গেয়ে উঠতে, ঝটপট করতে, কথা কইতে। চারদিকে বড়ো বড়ো শিশিরকণা হীরেরমতো ঝকঝক করছে; আমাকে অভ্যর্থনার জন্য বেজে উঠল যেন প্রভাতের সজীবতায় স্নান করে ওঠা শুচিশুদ্ধ, পরিষ্কার স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি, আর হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল চেনা ছেলেগুলির তাড়া খাওয়া জিরিয়ে নেওয়া হৃষ্ট সতেজ ঘোড়ার পালটা...

দুঃখের কথা, তাও আমায় বলতে হয়, সে বছর পাভলুশা মারা গেল। সে জলে ডোবে নি; ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। বড়ো আক্ষেপের কথা! চমৎকার ছিল ছেলেটি!

দ্‌মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক

শিকারী এমেলিয়া



'শিকারী এমেলিয়া' গল্পটি লেখা হয় ১৮৮৪ সনে। এই গল্পের লেখক দ্‌মিত্রি নার্কিসভিচ্‌ মামিন-সিবিরিয়াক জন্মগ্রহণ করেন উরালে এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটান সেখানে — বনজঙ্গল আর অনুচ্চ পাহাড়ে আচ্ছন্ন অঞ্চলে। এরই মাঝখানে সেই পিটার দি গ্রেটের আমলেই রুশ বণিকেরা সেখানে গড়ে তোলে লোহা ঢালাই আর লৌহ নির্মাণের কারখানা। লেখক স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলছেন, 'আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই কাঠের তৈরী পুরনো বাড়িটা, চত্বরের দিকে তার বড় বড় পাঁচটি জানলা। বাড়িটার অসাধারণত্ব ছিল এখানেই যে তার জানলাগুলোর মুখ এক দিকে ইউরোপের অভিমুখে, অন্য দিকে — এশিয়ার।

'ঐ যে পাহাড়গুলো দেখছিস, ওগুলো পড়ে এশিয়ায়,' দূর দিগন্তে বিরাট বিরাট পাহাড়ের পরিলেখ দেখিয়ে বাবা আমাকে বললেন। 'আমরা আছি একেবারে সীমান্তে...'

লেখকের পিতা ছিলেন কারখানার ধর্মযাজক। বইয়ের দারুণ ঝোঁক ছিল তাঁর। মাইনের একটা বড় অংশ তিনি বই কেনার পেছনে খরচ করতেন। তাঁর এই সাহিত্যপ্রেম পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মামিন-সিবিরিয়াক উপন্যাস রচনা করেন উরালের বণিক আর কারখানা-মালিকদের নিয়ে এবং সেই সব চাষীদের নিয়ে, যারা খেত চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে খনিতে, কলকারখানায়ও কাজ করত। 'এই লেখকের রচনায় রিলিফ চিত্রের মতো ফুটে ওঠে উরালের বিশেষ জীবনযাত্রা প্রণালী,' মন্তব্য করেন লেনিন।

শিশুদের জন্য মামিন-সিবিরিয়াক প্রায় একশ তিরিশটি রচনা লেখেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল পশুদের সম্পর্কে মজার গল্পগ্রন্থ – 'আলিওনুশকার গল্প', 'স্থুদিওন্নায়ায় শীতযাপন', 'পুষ্যি' আর 'শিকারী এমেলিয়া' নামে গল্প। এই সব গল্পে উরালের প্রকৃতি এবং রুশ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের উ'চু নীতিবোধের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে।

১৯১২ সনে ষাট বছর বয়সে মামিন-সিবিরিয়াকের মৃত্যু হয়।



১

দূরে, বহু দূরে, উরাল পর্বতমালার দক্ষিণাংশে, দুর্গম অরণ্যের গহনে লুকিয়ে আছে ছোট গাঁ তিচ্‌কি। তাতে মোট এগারোটি বাড়ির আঙ্গিনা — বলতে গেলে দশটি, কেননা এগারো সংখ্যক কুটিরটি একেবারে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বনের পাশে। গ্রামের চারধারে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে চিরহরিৎ দেওদার বনের দাঁতাল দেয়াল। ফার আর সিলভার ফারগাছের মাথার আড়াল থেকে নজরে পড়ে কয়েকটি পাহাড়। পাহাড়গুলো ঠিক যেন ইচ্ছে করেই চারধার থেকে নীলাভ-ধূসর বিশাল বিশাল বাঁধ দিয়ে তিচ্‌কিকে ঘিরে রেখেছে। তিচ্‌কির সবচেয়ে কাছের পাহাড়টি হল ধপধপে ঝাঁকড়া চুড়োওয়ালা, কুঁজ ওঠা রুচিওভা পাহাড়। মেঘলা দিনে এই পাহাড় ঘোলাটে ছাইরঙা মেঘের আড়ালে সম্পূর্ণ লুকিয়ে পড়ে। রুচিওভা পাহাড় থেকে নীচে নামছে বহু ঝরনা আর ছোট নদী। এই রকমই এক ছোট নদী ফুর্তিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে তিচ্‌কির দিকে। কী শীতে, কী গ্রীষ্মে নদীটি সকলকে যুগিয়ে চলে চোখের জলের মতো টলটলে, ঠাণ্ডা পানীয় জল।

তিচ্‌কিতে কুঁড়ে ঘর বানানোর মধ্যে কোন পরিকল্পনার বালাই নেই — যে যেমন পারে খাড়া করেছে। দুটি কুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে নদীর ঠিক পাড়ের ওপর, একটি — পাহাড়ের খাড়া ঢালে, আর বাদবাকি সব ভেড়ার পালের মতো তীর ধরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিচ্‌কিতে রাস্তা অবধি নেই, কুটিরগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে জরাজীর্ণ পায়ে-চলা-পথ। তাছাড়া তিচ্‌কির





অধিবাসী চাষীদের রাস্তারও বোধহয় একেবারেই দরকার পড়ে না, কেন না কিসে চড়েই বা তার ওপর দিয়ে যাবে? — তিচ্‌কিতে একটি ঘোড়ায় টানা গাড়িও কারও নেই। গরমকালে এই গাঁটিকে ঘিরে থাকে জলাভূমি, বিল আর বুনো ঝোপঝাড় — ফলে এখানে একমাত্র বনের পায়ে-চলা সরু পথ ধরে কোন রকমে হেঁটে প্রবেশ করা যায়, তা-ও আবার সব সময় নয়। বৃষ্টি-বাদলার দিনে পাহাড়ী নদীগুলো দারুণ ক্রীড়াচঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন প্রায়ই এমন ঘটে যে নদীর জল নামার জন্য তিচ্‌কির অধিবাসীদের দিন তিনেক ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

তিচ্‌কির লোকেরা সকলেই মার্কা-মারা শিকারী। শীত-গ্রীষ্ম — কোন সময়ই তারা প্রায় বন থেকে বেরোয় না, হাত বাড়ালেই শিকার। বছরের যে কোন সময় তারা ভালো ভালো শিকার নিয়ে আসে: শীতকালে মারে ভালুক, নেউল, নেকড়ে, শেয়াল; শরৎকালে — কাঠবিড়ালি; বসন্তকালে — বুনো ছাগল; গ্রীষ্মকালে — হরেক রকমের পাখি। এক কথায়, সারা বছরই চলে কঠিন কাজ, সে কাজ সময় সময় বিপজ্জনকও বটে।

বনের ঠিক ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা, সেখানে থাকে বুড়ো শিকারী এমেলিয়া তার ছোট্ট নাতি গ্রিশাকে নিয়ে। এমেলিয়ার কুঁড়ে ঘর একেবারে মাটিতে গাঁথা, মাত্র একটি জানলা দিয়ে দেখছে স্নিগ্ধ জগৎকে। কুটিরের চাল বহু আগেই পচে গেছে, চিমনি বলতে অবশিষ্ট আছে কেবল ধসে পড়া ইট। না বেড়া, না ফটক, না গোলাবাড়ি — এমেলিয়ার কুটিরে এসবের কোন বালাই নেই। কেবল কদর্য কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী দেউড়ির নীচে রাতভর আর্তনাদ করে চলে ক্ষুধার্ত লিস্‌কো — তিচ্‌কির সবচেয়ে সেরা শিকারী কুকুরগুলোর একটি। প্রতিবার শিকারের আগে আগে লিস্‌কোকে এমেলিয়া দিন তিনেক খিদেয় শুকিয়ে মারে, যাতে সে আরও ভালো করে শিকার খোঁজে এবং সব রকম জন্তুজানোয়ারের পিছু নিতে পারে।

'দাদু... ও দাদু...' অতি কষ্টে বাচ্চা গ্রিশা এক সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করল। 'এখন হরিণেরা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না দাদু?'

'বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গ্রিশা,' পায়ের জন্য নতুন ছালবাকলের জুতোজোড়া বোনা শেষ করতে করতে এমেলিয়া জবাব দিল।

'হরিণের বাচ্চা শিকার করতে পারলে বেশ হত, দাদু... অ্যাঁ?'

'সবুর কর, শিকার করব... গরম পড়েছে, হরিণেরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে ডাঁশের হাত থেকে ঘন জঙ্গলে লুকোবে, এই সময় তোর জন্য হরিণছানাও শিকার করে আনব, গ্রিশা!'

ছেলেটা কোন জবাব দিল না, কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গ্রিশার বয়স মোটে বছর ছয়েক, এদিকে সে আজ দু মাস হতে চলল চওড়া কাঠের তক্তপোষের ওপর গরম হরিণের চামড়ায় গা ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে। বসন্তকাল থাকতেই — যখন বরফ গলছিল — সেই সময় তার ঠান্ডা লেগে যায়, কিছুতেই আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারছিল না। তার তামাটে ছোট্ট মুখটি ফেকাসে ও লম্বাটে হয়ে গেছে, চোখজোড়া বড় বড় হয়ে জেগে আছে, আর খাড়া হয়ে উঁচিয়ে আছে তার

নাক। এর্মোলিয়া দেখতে পাচ্ছিল, নাতি শুকিয়ে যাচ্ছে — দিনে দিনে বললে ভুল হবে — যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়। অথচ কী করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে তাকে গাছ-গাছড়ার ওষুধ খাওয়াচ্ছিল, দুবার স্নান ঘরে নিয়ে স্নানও করায় — কিন্তু রোগীর তাতে ভালো কিছু হল না। ছেলেটা প্রায় কিছুই খায় না। খাওয়া বলতে কেবল কালোরুটির পিঠ সামান্য চিবোনো। বসন্তকালে যে ছাগলের মাংস নুন দিয়ে জারিয়ে রাখা হয়েছিল তা ছিল, কিন্তু সে দিকে তাকিয়ে দেখারও প্রবৃত্তি গ্রিশার নেই।

'ইস্, কী জিনিসই চাই — হরিণছানা!' বুড়ো এর্মোলিয়া জুতো বোনা শেষ করতে করতে ভাবল। 'পরে শিকার করতেই হবে দেখছি।'

এর্মোলিয়ার বয়স প্রায় সত্তর। সে রোগা, কুঁজো, তার চুল সাদা, হাত দুটো লম্বা লম্বা। এর্মোলিয়ার হাতের আঙুলগুলো সিধে হয় না বললেই চলে — দেখে মনে হয় যেন গাছের ডালপালা।

কিন্তু চলাফেরায় সে এখনও চাঙ্গা, এটা ওটা শিকারও করে থাকে। কেবল চোখ দুটো বুড়োর সঙ্গে বড় বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে দিয়েছে — বিশেষত শীতকালে, যখন বরফ থেকে ফুলকি ঠিকরে পড়ে, যখন চারদিকে হীরের মতো গুঁড়ো চকচক করে। এর্মোলিয়ার চোখের দোষেই চিমনি ধসে পড়েছে, ঘরের চাল পচে গেছে, আর সে প্রায়ই বসে থাকে নিজের কুঁড়ে ঘরে, যখন অন্যেরা যায় বনে।

বুড়ো এখন কোথায় একটু স্বস্তিতে থাকবে, গরম চুল্লীর ওপর আয়েস করবে, কোথায় অন্য কেউ তার জায়গা নেবে, তা নয় ঠিক এমন সময় কিনা গ্রিশা তার কোল জুড়ে বসল — এখন তাকেই দেখাশোনা করতে হয়... গ্রিশার বাবা তিন বছর আগে জ্বরবিকারে মারা যায়, মা যখন ছোট্ট গ্রিশাকে নিয়ে শীতের এক সন্ধ্যায় গাঁ থেকে নিজের কুটিরে ফিরছিল তখন নেকড়ের পাল তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। বাচ্চাটা কেমন যেন আশ্চর্যভাবে রক্ষা পায়। নেকড়েরা যখন মা'র পা চিবিয়ে খেতে থাকে তখন সে বাচ্চাকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখে, গ্রিশা বেঁচে যায়।

বুড়ো দাদুর কাজ হয় নাতিকে মানুষ করে তোলা, তায় আবার রোগ এসে ধরল। বিপদ একা আসে না...

২

জুন মাসের শেষাশেষি, তিচ্‌কিতে সবচেয়ে গরমের সময়। ঘরে থেকে যায় বুড়োরা আর বাচ্চারা। শিকারীরা অনেক আগেই হরিণের সন্ধানে বনের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে। এর্মোলিয়ার কুটিরে আজ তিন দিন হল বেচারি লিস্‌কো শীতকালের নেকড়ের মতো খিদেয় কাতরাচ্ছে।

'দেখা যাচ্ছে, এমেলিয়া শিকারে যাওয়ার তোড়জোড় করছে,' গাঁয়ের মেয়েরা বলাবলি করে।

কথাটা সত্যি। বাস্তবিকই, এমেলিয়া শিগ্‌গিরই তার গাদা বন্দুক হাতে নিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে এলো, লিস্‌কোর বাঁধন খুলে দিল এবং বনের দিকে যাত্রা করল। তার পায়ে ছালবাকলের তৈরী নতুন জুতো, পিঠে রুটির পুঁটলি, গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া ঢিলে জামা আর মাথায় হরিণের চামড়ার গরম টুপি। বুড়ো আজ বহুকাল হল হ্যাট পরে না — কি শীতে কি গ্রীষ্মে হরিণের চামড়ার টুপি মাথায় ঘোরাফেরা করে। তার এই টুপি শীতের ঠান্ডা আর গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম থেকে তার টাক মাথাকে চমৎকার রক্ষা করে।

'তাহলে, গ্রিশা, আমি ফিরে আসতে আসতে ভালো হয়ে ওঠ,' বিদায় নিতে গিয়ে এমেলিয়া নাতিকে বলল। 'আমি যতক্ষণ হরিণছানা শিকারে যাচ্ছি ততক্ষণ বুড়ি মালানিয়া তোর দেখাশোনা করবে।'

'হরিণছানা নিয়ে আসবে ত দাদু?'

'বলেছি ত নিয়ে আসব।'

'হল্‌দে?'

'হল্‌দে...'

'আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষা করব... দেখো, গুলি করার সময় যেন ফসকে না যায়।'

এমেলিয়া বহুকাল হল হরিণশিকারে যাওয়ার মতলব করছিল, কিন্তু বারবারই তার কষ্ট হত এই ভেবে যে নাতিকে একা ফেলে রেখে যেতে হবে। এখন কিন্তু তার বেশ ভালোই লাগছিল, বুড়ো ঠিক করল ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। তাছাড়া বুড়ি মালানিয়া ছেলেটার দেখাশোনা ত করবেই — একা একা কুটিরে পড়ে থাকার চেয়ে ভালো বটে।

বন যেন এমেলিয়ার ঘর বাড়ি। আর এ বন তার জানা থাকবেই বা না কেন, যখন সে সারা জীবন বন্দুক ও কুকুর নিয়ে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারপাশের একশ ভার্স্ট দূরত্বের মধ্যে সমস্ত পায়ে-চলা-পথ, সমস্ত নিশানা — সবই বুড়োর জানা ছিল।

আর এখন, জুনের শেষে, বনে বিশেষ করে ভালো লাগে: ফুটন্ত ফুলে ঘাস সুন্দর বর্ণবৈচিত্র্য ধারণ করেছে, বাতাসে ভাসছে সুগন্ধী ঘাসের অপূর্ব ঘ্রাণ, আর আকাশে উঁকি মারছে গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ সূর্য — উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে বনভূমি ও তৃণদল, নলখাগড়ার বনে কুলুকুলু ছোট্ট নদী আর দূর পাহাড়ের সারি।

সত্যিই চারপাশে অপরূপ আর সুন্দরের সমারোহ। হাঁপ ছেড়ে পেছন ফিরে তাকানোর উদ্দেশ্যে এমেলিয়া কয়েকবার থমকে দাঁড়ায়।

যে পায়ে-চলা-পথ ধরে এমেলিয়া চলেছে সেটি বড় বড় পাথর আর খাড়া খাঁজ পেরিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাহাড়ে উঠে গেছে। বড় গাছের জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে, পথের পাশে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে কচি বার্চগাছ, ঝুমকো লতার ঝোপঝাড়, শ্যামল চাঁদোয়া

ছড়িয়ে দিচ্ছে অ্যাশবেরি গাছ। এখানে ওখানে চোখে পড়ে কচি ফারের ঘন ঝোপ — পথের ধারে ধারে সবুজ বুরুশের মতো মাথা উ'চিয়ে আছে, খুশির আমেজে খোঁচা খোঁচা বার করে রেখেছে ঝাঁকড়া ডালপালার থাবা। পাহাড়ের মাঝামাঝি থেকে, এক জায়গায় চোখে পড়ে দূর পাহাড়-পর্বত আর তিচ্‌কির বিস্তৃত দৃশ্য। ছোট্ট গাঁটি পাহাড়ের গহ্বরের গভীর অতলে একেবারে লুকিয়ে আছে, চাষীদের কুটিরগুলো এখান থেকে দেখা যায় কালো কালো বিন্দুর মতো। এমেলিয়া রোদ থেকে চোখ আড়াল করে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নিজের কুটির, ভাবল নাতির কথা।

'এইবারে, লিস্‌কো, খোঁজ কর,' পাহাড় থেকে নেমে পায়ে-চলা-পথ থেকে বাঁক নিয়ে তারা নিরেট, নিবিড় ফারের অরণ্যে প্রবেশ করতে এমেলিয়া বলল।

লিস্‌কোকে দ্বিতীয়বার আদেশ করতে হত না। সে নিজের কাজ চমৎকার জানত, তাই ছুঁচালো মুখটাকে মাটিতে গুঁজে সে সবুজ ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল কিছুক্ষণের জন্য ঝলক দিল তার হলুদ ছোপ ধরা পিঠটা।

শিকার শুরু হয়ে গেল।

বিশাল বিশাল ফারগাছ তাদের তীক্ষ্ণ চূড়া উ'চিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে। ঝাঁকড়া ডালপালা একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে শিকারীর মাথার ওপর এমন এক নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন খিলান রচনা করছে যা ভেদ করে কেবল কোথাও কোথাও খুশিতে উ'কি মারছে সূর্যের কিরণ, সোনালী ছোপ ধরিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে হলদেটে শেওলা কিংবা ফার্নের চওড়া পাতা। এ ধরনের বনে ঘাস জন্মায় না। এমেলিয়া গালিচার মতো নরম হলদেটে শেওলার ওপর দিয়ে চলল।

শিকারী কয়েক ঘণ্টা ধরে এই বনে ঘোরাঘুরি করল। লিস্‌কো যেন বিলকুল হাওয়া হয়ে গেছে। কেবল থেকে থেকে পায়ের নীচে ডালপালা মড়মড় করে কিংবা এখান থেকে ওখানে উড়ে যায় বিচিত্র বর্ণের কাঠঠোকরা। এমেলিয়া চারধারে সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখল: কোথাও কোন চিহ্ন আছে কিনা, হরিণ শিঙ দিয়ে ডালপালা ভেঙেছে কিনা, শেওলার ওপর চেরা খুরের দাগ পড়েছে কিনা, উ'চু জায়গায় ঘাস উপড়ে খেয়েছে কিনা। অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। বুড়ো ক্লান্তি বোধ করল। রাতের আশ্রয়ের কথা ভাবতে হয়। 'সম্ভবত অন্য শিকারীরা হরিণদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে,' এমেলিয়া ভাবল। এমন সময় লিস্‌কোর ক্ষীণ কে'উকে'উ আওয়াজ কানে এলো, সামনের ডালপালা সড়সড় করে উঠল। এমেলিয়া ফারগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এটা ছিল হরিণ। সত্যিকারের, দশ শিঙওয়ালা সুন্দর হরিণ, বনের সবচেয়ে অভিজাত প্রাণী। সে তার ডালপালাওয়ালা শিঙকে একেবারে পিঠের সঙ্গে ঠেকাল, বাতাস শুঁকতে শুঁকতে মনোযোগ দিয়ে কান পাতল যাতে পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে পড়া যায় সবুজ গহন বনে।

বুড়ো এর্মোলিয়া হরিণকে দেখতে পেল, কিন্তু সে তার কাছ থেকে অনেক দূরে: গুলি ছুঁড়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। লিস্‌কো ঘন জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে আছে, সাহস করে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না — গুলির অপেক্ষা করছে; সে হরিণের আওয়াজ পাচ্ছে, তার ঘ্রাণ টের পাচ্ছে...

গুড়ুম করে গুলির আওয়াজ হল, হরিণও সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে সামনের দিকে ছুট দিল। এর্মোলিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, এদিকে লিস্‌কো খিদের জ্বালায় গরগর করে উঠল। বেচারি কুকুর সবে অনুভব করছিল ঝলসানো হরিণের মাংসের গন্ধ, দেখতে পাচ্ছিল লোভনীয় হাড়, যা তার প্রভু তার দিকে ছুঁড়ে দেবে। তার বদলে কিনা খিদে পেটে নিয়ে ঘুমোতে যেতে হচ্ছে! বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড...

'ওটাকে না হয় ছেড়েই দিলাম,' সন্ধেবেলায় একশ বছরের এক ঘন ফারগাছের নীচে আগুনের ধারে বসে থাকার সময় এর্মোলিয়া মনে মনে আলোচনা করে উঁচু গলায় বলল। 'আমাদের দরকার হল হরিণছানা শিকার করা, লিস্‌কো... শুনতে পাচ্ছিস?'

কুকুরটা কেবল ছুঁচালো মুখ সামনের দু থাবার মাঝখানে রেখে করুণভাবে লেজ নাড়তে লাগল। এর্মোলিয়া তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে রুটির শক্ত শুকনো পিঠ। কুকুরটার ভাগ্যে আজ এ ছাড়া আর কিছু জোটে নি।

৩

তিন দিন এর্মোলিয়া লিস্‌কোকে নিয়ে বনে ঘুরল — কিন্তু বৃথাই: বাচ্চাসুদ্ধ হরিণ চোখে পড়ল না। বুড়ো অনুভব করছিল যে হয়রান হয়ে পড়ছে, কিন্তু খালি হাতে ঘরে ফিরবে না বলে মনস্থ করল। লিস্‌কো নিস্তেজ হয়ে পড়ল, সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল যদিও ইতিমধ্যে একজোড়া ছোট ছোট খরগোস সে সাঁটিয়েছে।

তৃতীয় রাত বনে আগুনের ধারে কাটাতে হল। স্বপ্নের মধ্যেও বুড়ো এর্মোলিয়া বারবার দেখতে পেল হলদে হরিণছানা, যা তার কাছে চেয়েছিল গ্রিশা। বুড়ো অনেকক্ষণ তার শিকারের অনুসরণ করল, তার দিকে তাক করল, কিন্তু হরিণ প্রত্যেকবারই তার নাকের ডগার ওপর দিয়ে পালিয়ে যায়। হরিণের ঘোর সম্ভবত লিস্‌কোরও পেয়ে বসেছিল, কেন না কয়েক বার সে চেঁচিয়ে ওঠে, চাপা গর্জন শুরু করে।

কেবল চতুর্থ দিনে, শিকারী ও কুকুর — দুজনেই যখন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন তারা দৈবাৎ হরিণ আর তার বাচ্চার পায়ের চিহ্ন খুঁজে পেল। জায়গাটা ছিল পাহাড়ের ঢালের ওপর, ফারের ঘন ঝোপের ভেতর। লিস্‌কো সর্বপ্রথম খুঁজে বার করল সেই জায়গাটা যেখানে হরিণ রাতের আশ্রয় নিয়েছিল, তারপর ঘাসের মধ্যে গুলিয়ে যাওয়া পায়ের চিহ্নও শুঁকে শুঁকে বার করল।

'মাদী আর বাচ্চা,' ঘাসের ওপর ছোট আর বড় খুরের চিহ্ন ঠাহর করে এমেলিয়া ভাবল। 'আজ সকালে এখানে ছিল। লিস্‌কো, খোঁজ লক্ষ্মীটি!'

অসহ্য গরমের দিন। সূর্য কোন রকম করুণা না দেখিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। কুকুর জিভ বার করে ঝোপঝাড় আর ঘাস শুঁকছিল; এমেলিয়া কোনক্রমে পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলছিল। এমন সময় পরিচিত মড়মড় ও খসখস আওয়াজ। লিস্‌কো ঘাসের ওপর পড়ে গেল, নড়াচড়া করল না। এমেলিয়ার কানে বাজছে নাতির কথাগুলো: 'দাদু হরিণের বাচ্চা শিকার করে আন। হলদে যেন হয়ই।' ঐ ত মাদীটা। এটা ছিল জমকাল মাদী হরিণ। সে বনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকাচ্ছিল এমেলিয়ার দিকে। এক ঝাঁক পোকামাকড় পিন্ পিন্ শব্দ করতে করতে তার মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাতে সে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

'না, তুই আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না,' নিজের ওৎ পাতা জায়গা থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসতে আসতে এমেলিয়া ভাবল।

হরিণ অনেকক্ষণ যাবৎই শিকারীর উপস্থিতি টের পেয়েছিল, কিন্তু সে সাহসের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

'এই মাদীটা দেখছি বাচ্চার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে,' গুড়ি মেরে ক্রমাগত আরও কাছে আসতে আসতে এমেলিয়া ভাবল।

বুড়ো যখন হরিণকে তাক করতে যাবে তখন হরিণ সন্তর্পণে দৌড়ে কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। এমেলিয়া আবার তার বন্দুক নিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে চলল। আবার ধীরে ধীরে চুপিসারে এগিয়ে যাওয়া, এবারেও এমেলিয়া গুলি করতে যাবে — এমন সময় হরিণ গা ঢাকা দিল।

'বাচ্চাটার কাছ থেকে যাবি না দেখছি,' কয়েক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে জন্তুটার ওপর নজর রাখতে রাখতে এমেলিয়া ফিসফিস করে বলল।

পশুর সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম চলল একেবারে সন্ধে অবধি। বাচ্চাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেখান থেকে শিকারীর নজর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় মহৎ চরিত্রের প্রাণীটি দশ বার জীবন বিপন্ন করল। বুড়ো এমেলিয়া তার শিকারের সাহসে যেমন রেগে গেল তেমনি অবাকও হল। যা-ই হোক না কেন, সে তার কাছ থেকে সরবে না। কতবারই না এভাবে শাবকের মা তার হাতে প্রাণ দিয়েছে! লিস্‌কো ছায়ার মতো তার প্রভুর পেছন পেছন গুড়ি মেরে চলেছে, হরিণ যখন প্রভুর একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল তখন সে তার গরম নাক দিয়ে প্রভুকে সন্তর্পণে খোঁচা মারল।

বুড়ো পিছু ফিরে তাকিয়ে আলগোছে বসল। তার দশ হাত দূরে ঝুমকো লতার ঝোপের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সেই হলদে হরিণছানাটি, যার জন্য পুরো তিন দিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এটা ছিল দিব্যি সুন্দর এক হরিণছানা, মোটে কয়েক সপ্তাহের — হলুদ রোঁয়া, সরু সরু ঠ্যাঙ;

তার সুন্দর মাথাটা পেছন দিকে সামান্য হেলান, যখন একটু উঁচু ডাল মুখে ধরার চেষ্টা করছিল তখন সে তার সরু ঘাড় বাড়িয়ে দিচ্ছিল সামনের দিকে।

শিকারী রুদ্ধ নিশ্বাসে বন্দুকের ঘোড়া বাগিয়ে ধরে ছোট্ট অসহায় প্রাণীটির দিকে লক্ষ্য ঠিক করল...

আর একটি পলক, এখনই ছোট হরিণছানাটি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের করুণ আর্তনাদ করতে করতে ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো শিকারীর মনে পড়ে গেল কী দারুণ সাহস দেখিয়েই না মা তার শাবককে রক্ষা করছে, মনে পড়ে গেল গ্রিশার মা কী ভাবে নিজের জীবন দিয়ে নেকড়ের পালের কবল থেকে ছেলেকে বাঁচায়। বুড়ো এর্মোলিয়ার বুক যেন ভেঙ্গে গেল, সে বন্দুক নামিয়ে রাখল। হরিণছানাটি কিন্তু আগের মতোই ঝোপের ধারে হাঁটছিল, খুঁটে খুঁটে পাতা খাচ্ছিল, ঘাসপাতার সামান্যতম খসখসে আওয়াজও কান খাড়া করে শুনছিল। এর্মোলিয়া তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শিস দিল — ছোট্ট প্রাণীটি বিদ্যুৎগতিতে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

'ওঃ কী দৌড়বাজ রে তুই!' বুড়ো অন্যমনস্কভাবে মৃদু হেসে বলল। 'এই মাত্র ওকে দেখলাম — আর একেবারে তীরের মতো... আমাদের হরিণছানা ত পালিয়ে গেল রে লিস্‌কো! তা ওর, দৌড়বাজটার, আরও বড় হওয়া দরকার। ওঃ কী চটপটে রে!'

বুড়ো অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, দৌড়বাজটাকে মনে করে তার কেবলই হাসি পেতে লাগল।

পরদিন এর্মোলিয়া তার কুটিরের দিকে এগোল।

'ও দাদু, হরিণছানা এনেছ?' গ্রিশা জিজ্ঞেস করল। সে সারাটা সময় অধীর আগ্রহে বুড়োর অপেক্ষায় ছিল।

'না, গ্রিশা... ওকে দেখেছি...'

'হল্‌দে?'

'ওর শরীরটা হলদে, আর মুখ কালো। দেখলাম ঝোপের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কচি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি তাক করলাম...'

'ফসকে গেল?'

'না, গ্রিশা, মায়া হল... বাচ্চা জন্তুটার জন্য... মাদীটার জন্য মায়া হল। যেই শিস দিলাম, অমনি হরিণছানাটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এমন তড়াক করে লাফ দিল! — ওকে আমরা দেখলামই শুধু। অ্যায়সা দুষ্টু... পালিয়ে গেল।'

বুড়ো কী ভাবে তিন দিন বনে হরিণছানা খুঁজেছে, কী করে সেটা তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল — অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটিকে সে তার বিবরণ দিল। শুনতে শুনতে বুড়ো দাদুর সঙ্গে গ্রিশাও ফুর্তিতে হাসতে লাগল।

'আমি কিন্তু তোর জন্য বনমোরগ নিয়ে এসেছি গ্রিশা,' বৃত্তান্ত শেষ করে এমেলিয়া যোগ করল। 'এটা অমনিতেই নেকড়েদের পেটে যেত।'

বনমোরগ ছাড়িয়ে হাঁড়িতে চড়ানো হল। অসুস্থ ছেলেটা তৃপ্তির সঙ্গে বনমোরগের ঝোল খেল, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কয়েক বার বুড়োকে জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে, ও — ঐ হরিণের বাচ্চাটা — পালিয়ে গেল ত?'

'পালিয়ে গেল, গ্রিশা।'

'হলদে?'

'পুরো হলদে, কেবল মুখ আর খুর কালো।'

গ্রিশা শেষকালে ঘুমিয়ে পড়ল, সারারাত স্বপ্নে দেখল ছোট্ট হলদে হরিণছানা — ফুর্তিতে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মা'র সঙ্গে; এদিকে বুড়োও চুল্লীর ওপর শুয়ে ঘুমের ঘোরে হাসছিল।

নিকোলাই তেলেশোভ

বাড়ির পথে



নিকোলাই দ্মিত্রিয়েভিচ্ তেলেশোভ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম — ১৮৬৭ সনে -- রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা অবসানের মাত্র ছয় বছর বাদে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৭ সনে -- মহান অক্টোবর বিপ্লবের চল্লিশ বছর পরে।

যৌবনে তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মে লিপ্ত হন· শিশুদের জন্য গল্প ও কবিতার সংগ্রহ প্রকাশ করেন, মস্কোর উপকণ্ঠে পাব্লিক স্কুল সংগঠন করেন। ১৮৯৪ সনে আন্তন চেখভের পরামর্শক্রমে জনগণের জীবন ভালো করে জানার উদ্দেশ্যে তেলেশোভ সাইবেরিয়ায় যান।

এই সময় জার সরকার রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের দরিদ্র কৃষকদের জনবসতিহীন সাইবেরিয়ার জমিতে স্থানান্তরিত করছিল। তখনকার কালে উরালের ওপারে রেল লাইন ছিল না বললেই চলে। কৃষকেরা সপরিবারে ঘোড়ায় চড়ে যায়। দীর্ঘ পথযাত্রায় তারা ক্ষুধায় পীড়িত হয়, রোগের কবলে পড়ে, মারা যায়, শিশুদের হারায়। সাইবেরিয়ার কেন্দ্রে তেলেশোভ দেখতে পান নিরাশ্রয় শিশুতে পরিপূর্ণ ব্যারাক। ফিরে এসে তিনি লেখেন: 'এই সব শিশুর মা-বাবারা হয় পথে প্রাণ হারায়, নয়ত অসুস্থ শিশুর অবস্থা নৈরাশ্যজনক বিবেচনা করে পরিবারের বাদবাকিদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাকে বিসর্জন দেয়। তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার মতো তাদের না আছে শক্তি, না আছে আর্থিক সামর্থ্য। তাই শিশু অমনিতেই প্রাণ হারিয়েছে ধরে নিয়ে তারা ওকে ছেড়ে আরও দূরে এগিয়ে চলে। বলাই বাহুল্য যে ছেড়ে যাওয়া শিশুদের বেশির ভাগই সুস্থ হয়ে ওঠে না, তবে এমন ঘটনাও ঘটে যখন শিশু সেরে ওঠে -- সেক্ষেত্রে তাকে 'অনাথ শিশুদের' শ্রেণীভুক্ত করা হয়।'

শিশুদের জন্য তেলেশোভের লেখা সেরা গল্পগুলির বিষয়বস্তু হল এই সব বাসবদলকারী হতভাগ্য শিশুদের জীবন। বাবা-মা'র ছেড়ে-যাওয়া অসুস্থ নিকোলাই সুস্থ হয়ে ওঠার পর হল 'বেওয়ারিস'। তাকে নিয়ে লেখক লিখলেন 'দারিদ্র্য' নামে গল্প। হতভাগ্য শিশুদের ওপর করুণাপরবশ হয়ে অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো সৈনিক মিত্রিচ্ কী ভাবে নিজের যৎসামান্য অর্থে তাদের জন্য নববর্ষের ফারগাছের ব্যবস্থা করল সে বিবরণ আছে 'মিত্রিচের ফারগাছ' গল্পে। 'বাড়ির পথে' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সনে। মা-বাবা-হারা এক ছেলের জন্ম-গাঁয়ে ফেরার চেষ্টা নিয়ে এর কাহিনী।



১

গ্রীষ্মকালের ফুটফুটে রাত। চাঁদ খুশিতে শান্ত দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে; তার রুপোলি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে বনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা আর রাস্তা-ঘাট, কিরণ ভেদ করছে বনভূমিকে, নদীতে লেগেছে সোনার রঙ। ঠিক এমনই এক রাতে বাসবদলকারীদের ব্যারাকের দরজা থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এলো সিওম্‌কা। সিওম্‌কা হল বছর এগারো বয়সের একটি ছেলে। তার চুল রুক্ষ, খাড়া-খাড়া, মুখ ফেকাসে। সে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ক্রুশ করল, তারপর আচমকা প্রাণপণে ছুট দিল মাঠের দিকে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়ার পথ। তাড়া খাওয়ার ভয়ে সে বারবার পিছু ফিরে দেখে, কিন্তু তাকে কেউ ধাওয়া করল না। সে স্বচ্ছন্দে প্রথমে বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল, তারপর গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। এখানে সে থমকে দাঁড়াল, কী যেন ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে রাস্তা বরাবর চলল।

বাসবদল করতে এসে যাদের ছেলেমেয়ে অনাথ হয়ে যায়, ও ছিল সেই রকম এক ঘরছাড়া ছেলে। সিওম্‌কার মা-বাবা পথে টাইফয়েডে মারা যেতে সে জন্মভূমি থেকে বহু দূরে, অপরিচিত লোকজন আর অপরিচিত প্রকৃতির মাঝখানে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। জন্মভূমি বলতে তার মনে পড়ে কেবল শ্বেতপাথরের গির্জা, বাতাসে চালানো যাঁতাকল আর উজিউপ্‌কা নদী, যেখানে সে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাঁতার কাটত, এবং সেই গাঁ, যার নাম ছিল বেলোয়ে। কিন্তু কোথায় সেই জন্মস্থান, সেই গাঁ আর উজিউপ্‌কা নদী — তা ওর কাছে একই রকম রহস্যময়, যেমন রহস্যময় এই জায়গাটি, যেখানে এখন সে আছে। একটি কথাই তার মনে আছে: ঠিক এ পথেই ওরা



এখানে এসেছিল, আগে তারা আড়াআড়ি পার হয় কোন এক চওড়া নদী, তারও আগে অনেকক্ষণ ধরে স্টীমারে যায়, গাড়িতে চেপে যায়, আবার স্টীমারে, তারপর আবার গাড়িতে। তার মনে হচ্ছিল যে এই রাস্তাটা পেরোলেই হল — পাওয়া যাবে নদী, তারপর গাড়ি, আর সেখানেই আছে উজিউপ্‌কা নদী ও বেলোয়ে গাঁ, নিজেদের বাড়ি, যে বাড়িতে থাকতে সে বড় অভ্যস্ত; গাঁয়ের ছেলেবুড়ো প্রত্যেকের সঙ্গেই তার রীতিমতো জানাশোনা আছে। তার আরও মনে পড়ল মা ও বাবার মারা যাওয়ার ঘটনা — কফিনে শুইয়ে দিয়ে ছোট বনের ওপারে কোথায় যেন, কোন এক অজানা কবরখানায় ওদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সিওম্‌কার এ-ও মনে পড়ে যে সে খুব কাঁদে, বাড়ি যাওয়ার জন্য বায়না ধরে, কিন্তু তাকে জোর করে এখানে, ব্যারাকে ধরে রাখা হল, তাকে কালো রুটি ও বাঁধাকপির ঝোল খেতে দেওয়া হত আর সব সময় বলা হত, 'তোকে নিয়ে এখন পড়ে থাকার সময় নেই।' এমন কি কর্তা আলেক্সান্দ্র ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌ — যিনি সব ব্যাপারের তদবির-তদারক করতেন — তিনিও তার ওপর চোটপাট করে উঠে হুকুম দিলেন, তাকে এখানেই থাকতে হবে, আর এই বলে ভয় দেখালেন যে গোলমাল করলে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবেন। সিওম্‌কা তাই ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক থেকে গেল, তার মন খারাপ করতে লাগল। ওর সঙ্গে ব্যারাকে থাকত আরও তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে — ওদের মা-বাবা ভুল করে ওদের এখানে ফেলে চলে গেছে — কোথায় কে জানে। কিন্তু ঐ বাচ্চারা এতই ছোট ছিল যে তাদের সঙ্গে না যায় খেলা, না যায় দুষ্টুমি করা।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, সিওম্‌কাও থেকে যায় জঘন্য ব্যারাকে, ব্যারাক ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার সাহস তার হয় না। শেষে তার বিরক্তি ধরে গেল। আরে ঐ ত সেই পথ যে পথ ধরে তারা রাশিয়া থেকে এখানে এসেছিল! ভালোয় ভালোয় ছেড়ে না দেয়, সে নিজেই পালাবে। কতক্ষণ আর? আবার সে দেখতে পাবে তাদের উজিউপ্‌কা, তাদের বেলোয়ে, আবার দেখতে পাবে মালাশ্‌কা, ভাসিয়াত্‌কা আর মিত্‌কাকে, তার প্রাণের বন্ধুবান্ধবকে, যাবে দিদিমণি আফ্রোসিনিয়া ইয়েগোরভ্‌নার কাছে, পুরুতবাড়ির ছেলেদের কাছে — ওদের ওখানে অনেক চেরি আর আপেল ফলে...

অবশ্য ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও বহু দিন সিওম্‌কাকে ধরে রেখেছিল। তবে নিজের নদীটিকে, নিজের বন্ধুবান্ধবকে আর জন্ম-গাঁকে দেখার আশা এতই বড় ও প্রলোভনজনক ছিল যে সিওম্‌কা তার বাঞ্ছিত স্বপ্নকে মনে মনে পুষে রেখেছিল — তাই সুযোগ বুঝে বিনি পয়সার বাঁধাকপির ঝোল চিরকালের জন্য বর্জন করে সে পালাল। সে বড় সুখ অনুভব করছিল এই ভেবে যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল যে বেলোয়ের মতো ভালো জায়গা আর কোথাও নেই, সারা দুনিয়ায় নেই উজিউপ্‌কার মতো এত ভালো নদী।

দেখতে দেখতে চাঁদ দিগন্তের কাছাকাছি ঢলে পড়ছিল, সকাল হয়ে আসছে, সিওম্‌কা তখনও পথ ধরে চলছে ত চলছেই, বুক ভরে নিচ্ছে তাজা, শিশিরভেজা বাতাস, তার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে বাড়ির কাছাকাছি নিয়ে আসছে।

২

মনে হয়, মানুষের পক্ষে যা কিছু কল্পনা করা সম্ভব বিশাল সাইবেরিয়া সে সবই দেখেছে, সবেরই অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, তাই কোন কিছু দিয়ে, নতুন কোন জিনিসে তাকে অবাক করে দেওয়া যায় না। তার ওপর দিয়ে হাজার হাজার ভার্স্ট পথ পাড়ি দেয় শৃঙ্খলিত কয়েদির দল— ঝনঝন আওয়াজ তোলে তাদের ভারী শৃঙ্খল; সাইবেরিয়ার অন্ধকার খনির গর্ভে তারা খনি কাটে, খোঁড়াখুঁড়ি করে, দিনপাত করে সেখানকার কারাগারে। সাইবেরিয়ার পথে ঘণ্টির মিঠে টুংটাং আওয়াজ করে ছুটে চলে চঞ্চল ত্রোইকা, আর তাইগায় ঘুরে বেড়ায় ফেরারী আসামীরা — তারা জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে, কখনও গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, কখনও বা খ্রীস্টের নামে ভিক্ষে করে আহার জোটায়। রাশিয়া থেকে প্রায় ঘন সার বেঁধে প্রসারিত হয়ে চলেছে বাসবদলকারীদের ভিড়। তারা রাত কাটায় ঘোড়ার গাড়ির নীচে, শরীর গরম করে ধুনি জ্বালিয়ে। এদিকে তাদের মুখোমুখি এগিয়ে আসে ফিরতি পথের লোকজনের ভিড় — তারা নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ, তাদের অনেকেই পথে মারা যায়, কোনটাই কারও কাছে নতুন নয়।

সাইবেরিয়া এত বেশি পরিমাণে অন্যের দুঃখকষ্ট দেখেছে যে কিছুই তাকে অবাক করে না। সিওম্‌কা যখন গ্রামের পর গ্রাম পার হতে হতে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'রাশিয়ার পথ কোনটা?'— তখন তাকে দেখেও কেউ অবাক হল না।

লোকে তার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলে, 'সব পথই রাশিয়ায় গেছে।' এই বলে অনেকটা যেন তার গতি নির্দেশ করে পথ বরাবর হাত নাড়িয়ে দেখায়।

সিওম্‌কাও ক্লান্তি না মেনে, ভয়ডর না করে চলতে লাগল। তাকে আনন্দ দিচ্ছিল মুক্তি, উৎফুল্ল করছিল বিচিত্র বর্ণের ফুলে ফুলে ঢাকা মাঠ আর পাশ দিয়ে তিন ঘোড়ায় টানা যে সব ডাকগাড়ি ছুটে যাচ্ছিল তাদের ঘণ্টাধ্বনি। মাঝে মাঝে সে ঘাসে গা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ে, বনগোলাপের ঝোপের নীচে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা গরম লাগলে পথের ধারের কোন ছোট বনে গিয়ে ঢোকে। সাইবেরিয়ার স্নেহপরবশ মেয়েরা তাকে রুটি আর দুধ খেতে দিত, আর পথ চলতি চাষীরা মাঝে মাঝে তাকে তাদের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেত।

ঘোড়ায় চড়ে কাছাকাছি কাউকে আসতে দেখলে সিওম্‌কা তাকে অনুনয় করে বলত, 'ও খুড়ো, দয়া করে একটু এগিয়ে দাও না!'

গাঁয়ে সে বাড়ির গিন্নিদের উদ্দেশে বলত, 'ওগো মাসী আমার, একটু রুটি দাও গো!'

সকলে তাকে দয়া করত, সিওম্‌কার পেটও তাই ভরা থাকত...

৩

দু সপ্তাহ কেটে গেল।

সিওম্‌কা বহু পথ ও গ্রাম পেছনে ফেলে এসেছে। সে কিন্তু হতাশ না হয়ে ধীরেসুস্থে চলতে লাগল, কেবল মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করে:

'রাশিয়া কি এখনও দূরে?'

'রাশিয়ার কথা বলছিস?' উত্তরে লোকে তাকে বলে। 'কাছে ত আর নয়। তা, শীত নাগাদ পেশছে যাবি 'খন, আগেও হতে পারে।'

'শীত বুঝি শিগ্‌গিরই?'

'না, শীত আর শিগ্‌গির কোথায়? এখনও শরৎই এলো না।'

সিওম্‌কা যখন কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায় কিংবা যখন দূর থেকে গির্জার উ'চু সাদা ঘণ্টামিনারের চূড়ায় দৈবাৎ সে সোনালী ক্রস দেখতে পায়, তখন তার চোখ বয়ে দরদর ধারে জল ঝরে, বুকের ভেতরে আনন্দের হিল্লোল আর উত্তাপ খেলে যায়। সে মাথার টুপি খুলে সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে পড়ে, কাঁদতে কাঁদতে চে'চিয়ে বলে:

'ভগবান, তাড়াতাড়ি শীত এনে দাও!'

মাঝে মাঝে পথের প্রান্তে সিওম্‌কার চোখে পড়ে নিঃসঙ্গ একটি ক্রস। ধারেকাছে কোন লোকালয় নেই, এমন কি চৌকিদারের কুটিরও নয়, কেবল এক ধারে বন, অন্য ধারে স্তেপ।

এরকম ক্রস দেখতে পেয়ে সিওম্‌কা ভাবনায় ডুবে যায়, সব সময় তার মনে পড়ে যায় বাবা আর মা'র কথা, মনে পড়ে মাঠের মাঝখানের সেই তাঁবুটি যেখানে ওরা মারা যায়। সিওম্‌কা তখন ক্লান্তি ভুলে গিয়ে পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়, ফিসফিস করে আওড়াতে থাকে তার সযত্নে লালিত শব্দটি:

'বাড়ি! বাড়ি! বাড়ি!..'

অবশেষে, এই ত শহর।

শহরের তোরণের ওপারে সিওম্‌কার সামনে প্রথমে ঝলমল করে উঠল ডাইনে ও বাঁয়ে সবুজ, লাল ও ছাইরঙের ছাদে ছাওয়া গুঁড়িকাঠের ছাইরঙা ছোট ছোট বাড়ি, তারপর চলেছে সাদারঙের পাকা দালানকোঠা। রাস্তায় ঘুরঘুর করছে মুরগী, ঘোঁৎঘোঁৎ করে বেড়াচ্ছে শুয়োরের পাল। এর পরে বাড়িঘরের উঠোন আর বেড়ার সার, ডাকঘরের গেটের কাছে দেখা গেল ডোরাকাটা মাইল স্টোন। সামনে বিস্তৃত এক চত্বর — সেখানে লোহার জাফরির ওপারে উ'চু ঘণ্টিঘর, তারই উল্‌টো দিকে উ'চিয়ে আছে গুঁড়ি কাঠের ছাইরঙা জিরজিরে চৌকি মিনার। মিনারের একেবারে মাথায়, ঘেরা জায়গায়, চারধারে পায়চারি করছে এক সেপাই। সামনে আবার দেখা যায় চৌকি মিনার...

সিওম্‌কা না থেমে শহর পেরিয়ে আবার বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল — সেখানে সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও খুশি বোধ করল।

৪

সিওম্‌কা যত দূরে যায় ততই সর্বত্র লক্ষ্য করতে থাকে যে শরৎকাল ঘনিয়ে আসছে। 'ঠিক আছে, শিগ্‌গিরই শীত আসছে,' সে মনে মনে ভাবল, তার মনে হল জন্ম-গাঁ যেন ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। মাঠের ওপর এখন আর বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতিরা ঘুরে ঘুরে ওড়ে না, ফড়িংয়েরা পাক খাচ্ছে না, গাছ থেকে পাতা খসে খসে পড়ছে, ঘাস বিবর্ণ হয়ে পড়ছে, আকাশ ঘন ঘন হালকা ছাইরঙা মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে, রাতে ঠাণ্ডা পড়ছে।

কিন্তু সিওম্‌কা ভাবল, 'এখন আর বেশি দূর নেই। এখন এসে গেলাম বলে।'

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে সিওম্‌কা খিদে অনুভব করল। সকাল থেকে তার কিছুই খাওয়া হয় নি।

ঝোপের মধ্যে কে একজন লোক হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন চিবুচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে সিওম্‌কা দাঁড়িয়ে পড়ল, লোকটা কেমন ডিম ছাড়িয়ে নিয়ে রুটির সঙ্গে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে তা দেখে ওর হিংসে হল।

'কী চাই রে তোর?' লোকটা উঠে না দাঁড়িয়ে চিবুতে চিবুতেই জিজ্ঞেস করল।

সিওম্‌কা চুপ করে রইল।

লোকটা মাঝবয়সী, রোদে-হাওয়ায় কড়া পড়া তার মুখে, ছাইরঙা খাটো দাড়ি, কুতকুতে চোখজোড়া কোটরে বসা। তার পায়ে হরিণের চামড়ার হাই বুট, কাঁধে রঙচঙা কোট আর মাথার পেছন দিকে হেলানো টুপি।

'কী চাই রে তোর?' সিওম্‌কাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে সে আবার জিজ্ঞেস করল।

সিওম্‌কা ভয়ে ভয়ে বলল, 'খ্রীস্টের দোহাই, এক টুকরো রুটি দাও না, দাদু...'

'আমি নিজেই লোকজনের দয়ায় পেয়েছি, বন্ধু। তা যাক গে, নে, ভাগ নে।' এই বলে সে রুটির পিঠ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুই কাদের ছেলে? কোত্থেকে এলি?'

'বাড়ি যাচ্ছি... রাশিয়ায় যাচ্ছি।'

'রাশিয়ায়? আরে, আমিও ত রাশিয়ায় যাচ্ছি? তা, তুই কেন যাচ্ছিস?'

সিওম্‌কা নিজের জীবনের বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল। সে বলল যে ব্যারাকে তার বড় মন খারাপ লাগছিল, বাড়ি যেতে তার দারুণ ইচ্ছে করত, এক দিন রাতে সে তাই পালিয়ে যায়। অজানা লোকটিও সব কথা শুনতে শুনতে মাথা নেড়ে চলল, যেন কোন একটা কারণে তাকে বাহবা দিতে লাগল।

'সাবাস ভাই!' বুড়ো সিওম্‌কার হাতে চাপড় দিয়ে বলল। 'কেবল দেখতে পাচ্ছি এই যে তোর জীবনটা দুর্ভোগের। আমার পথে যাবি দেখছি: না বাড়ির মুখ দেখা, না মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলা — কোনটাই তোর বরাতে নেই। পশুর জীবন। স্রেফ পশুর জীবন!'

'আর তুমি, দাদু, তুমি কে?' সিওম্‌কা বুড়োর মুখোমুখি বসে পড়ে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল।

'আমি কে? আরে কেউ না। অমনি... এক কথায় — অজানা লোক।'

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ মোছার ভঙ্গিতে হাতের তালু মুখের ওপর বুলাল।

'হ্যাঁ, ভাই, তুই একটা ছোট ছেলে, জন্মভূমি কিনা তোকেও পিছু টানল। জন্মভূমি সব সময়ই তাই, ঠিক যেন আপন জননী... টানে আর টানে। তাকে ছাড়া কোথাও ঠাঁই পাওয়া যাবে না। এসে একবার তার দিকে, জননীর দিকে এক চোখ মেলে তাকাও — সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ জুড়িয়ে যায়!'

'আচ্ছা, দাদু, শীতকালের দিকে কি আমি রাশিয়ায় পেণছুতে পারব?'

'না, পারবি না। কেননা ঠাণ্ডা পড়ে যাবে, আর তোর গায়ে ত একটা ওভারকোট অবধি নেই... পায়ে হে'টে হে'টে আমার জানা হয়ে গেছে। বলছি, পেণছুতে পারবি না। ঠাণ্ডায় জমে যাবি।'

তার কথায় সিওম্‌কা দমে গেল। বুড়োও ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ওরা দুজনেই চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

সিওম্‌কা এই সময় মনে মনে কল্পনা করতে লাগল শীতে তার জমে যাওয়ার দৃশ্যটি, সে এই ভেবে বেদনা বোধ করল যে বেলোয়ের কেউ একথা জানতে পারবে না। এদিকে বুড়ো ডুবে ছিল নিজের ভাবনায়, চুপচাপ নাড়ছিল গোঁফজোড়া।

'তা হলে তুই কোথায় চললি?' ঘাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অজানা লোকটি আচমকা জিজ্ঞেস করল।

'আমি, দাদু, বাড়ি যাচ্ছি...'

'আমিও বাড়ি যাচ্ছি। চল্‌, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

তারা দুজনেই পথে বেরিয়ে এলো, ধীরেসুস্থে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

৫

সন্ধ্যা নামল। দুপুর থেকে বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছে; সিওম্‌কার এবং অজানা লোকটিরও হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

'চল্‌ ভাই, চল্‌,' বুড়ো উৎসাহ দিতে থাকে। 'জলদি। নয়ত একেবারে সত্যিকারের শরৎই এসে পড়বে, অথচ আমরা এখনও পাহাড়* অবধিও পেণছুতে পারলাম না। কী হবে তাহলে? মারা যেতে হবে দেখছি।'

* উরাল পাহাড়। — সম্পাঃ

'যাচ্ছি, দাদু।'

'অমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ভয় হচ্ছে, ঠাণ্ডার কবলে না পড়ি। তাহলেই বিপদ!'

ক্লান্তি সত্ত্বেও সিওম্‌কার বেশ লাগছিল। পথের সাথীকে পেয়ে তার আনন্দ লাগছিল, সে উৎসাহ বোধ করছিল। সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল যে এখন আর পথ হারানোর ভয় নেই, দাদু তাকে যেখানে দরকার নিয়ে যাবে; তা ছাড়া কথা বলতে পেরেও ভালো লাগছিল। এদিকে দাদু সব সময় গল্প করে যাচ্ছিল জন্মভূমির আর সাইবেরিয়ার, যেখানে লোকে সোনা খুঁড়ে বার করে, বলছিল কয়েদের কথা, মুক্তির কথা, সাইবেরিয়ার ভয়ঙ্কর শীত, বসন্তের সেই সবুজ ঘাসের কথা, যে সবুজ ঘাস মানুষকে বাড়ির দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাকে কি দিনে কি রাতে একেবারেই শান্তি দেয় না।

'আচ্ছা দাদু, আমরা কি এখন অনেকখানি পথ পেরিয়েছি?' সিওম্‌কা জিজ্ঞেস করে।

'দেখছিস, খিদে চন্‌মন করে উঠেছে — তার মানে, রাশিয়ার দিকে এগুচ্ছি। আর পাহাড়ের ওপারে গিরিপথ, সেখানে আরও খিদে পেয়ে যাবে, তাই ত বলছি, জলদি কর! রাশিয়াতে লোকে টাকাকড়ি পছন্দ করে, আমাদের কাছে এটাই নেই। রাত না হয় যেখানে খুশি কাটানো গেল, কিন্তু খাওয়ার কী হবে কে জানে? সাইবেরিয়ার, ভাই, দয়ামায়া আছে। কেবল তার সম্পদ আমাদের পোষাবে না রে... সেখানে আমাদের দাঁত বসানোর উপায় নেই। জলদি কর, ছোঁড়া, জলদি!'

যাতায়াতের পথের এক পাশে দল বেঁধে ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেমেছে। অন্ধকার, ঠাণ্ডা। ধুনির আগুনের শিখা পথিকদের সাদরে ইসারায় ডাকছিল। গাড়ির বাঁধন খোলা ঘোড়াগুলো অন্ধকারে মাঠের ওপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শরতের নিস্তেজ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জোয়াল ঊর্ধ্বমুখী, আর চাষীরা ধুনি জ্বালিয়ে শরীর গরম করছিল, রাতের খাবার বানাচ্ছিল।

'ভগবানের কৃপায়, তোমাদের খাওয়াটা ভালো হোক!' ধুনির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে অজানা লোকটি বলল। 'যদি আপত্তি না থাকে ত শরীরটা গরম করি, বন্ধুরা।'

'বোস,' নিরাসক্ত কণ্ঠে ওরা উত্তর দিল।

বুড়ো বসে পড়ে আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সিওম্‌কাও কাছে এগিয়ে গেল। তার গায়ের ভিজে সপসপে জামাটা দেখতে দেখতে গরম হল, পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা আরামের শিহরণ।

'কোত্থেকে আসা হচ্চে গো?' যারা বসেছিল তাদের মধ্যে কে একজন অজানা লোকটির মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দূর থেকে আসছি। ঘরপানে চলছি।'

'ছেলেটা কি তোমার নাকি?'

'না, পথে দেখা। ও হল বাসবদলি পরিবারের ছেলে। অনাথ হয়ে পড়েছে।'

'আহা দেখ দেখি, বাছা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে!'

সিওম্‌কার ওপর সকলের নজর পড়ল। ও বসে ছিল ধুনির একেবারে কাছে, কুঁকড়ে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আগুনের ভেতরে ডালপালা জ্বলছে, চড়চড় করছে, বাতাসে সাদা ধোঁয়া ভেসে যাচ্ছে, কড়াইয়ে সোঁ সোঁ করছে, টগবগ করে ফেনা তুলে সেদ্ধ হচ্ছে খাবার।

'অনাথ, তা হলে?' চাষীরা জিজ্ঞেস করল। তারা আবার সিওম্‌কার দিকে তাকাল।

তারপর ফসল আর কাজের কথা শুরু হল। পরে, রান্না হয়ে যেতে খেতে বসল।

'খা, বেচারি, খেয়ে নে। নইলে দেখছিস ত ঠাণ্ডায় কেমন জমে গেছিস,' এই বলে ওরা সিওম্‌কাকে খেতে দিল।

সিওম্‌কা পেট পুরে খেয়ে বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়ল। গরম গরম খাবার খাওয়ার পর আগুনের পাশে গড়িয়ে পড়তে তার বেশ লাগছিল। ডালপালাগুলো খোশমেজাজে মড়মড় আওয়াজ তুলছে, আগুন আর টাটকা ছাল বাকলের গন্ধ বেরিয়েছে — ঠিক যেমনটি হত তাদের বেলোয়েতে। কেবল এটা যদি বাড়িতে হত তাহলে সে এখন আলু খুঁড়ে এনে আগুনে ফেলত। সিওম্‌কার মনে পড়ল কয়লার মতো পোড়া আলু, তার ঘ্রাণ… হাত পুড়ে যায়, দাঁত কিচকিচ করে।

সিওম্‌কার মাথার ওপর ঝিকমিক করছে তারা, বেলোয়ের মতো এখানেও পরিষ্কার, ঐরকমই ঘন ঘন। তার ভাবতে ইচ্ছে করছিল বেলোয়ে এখন কাছাকাছি কোথাও। তার পাজোড়া ক্লান্তিতে টনটন করছে, মাটি থেকে ঠাণ্ডা এসে পিঠে ও শরীরের দুপাশে লাগছে, এদিকে ধুনি তার মুখ, বুক আর হাঁটুজোড়া ভালোমতো গরম করে দিচ্ছে।

চাষীরা তখনও কী নিয়ে যেন কথাবার্তা বলছিল, দাদুও তাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সিওম্‌কা তার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল, 'কঠিন, ভাই, কঠিন…' চাষীরাও বলাবলি করছিল যে কঠিন। তারপর তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ ও মৃদু হতে হতে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শোনাতে লাগল… পরে সিওম্‌কার সামনে ভেসে উঠল লাল লাল চক্কর, পরে উপচে পড়ল ঠাণ্ডা জলের চওড়া নদী, আর নদীর ওপারে দেখা গেল বেলোয়ে। সিওম্‌কার ইচ্ছে হচ্ছিল সাঁতরে ওখানে যাওয়ার জন্য ঝাঁপ দেয়, কিন্তু অজানা লোকটি তার ঠ্যাঙ ধরে ফেলে বলল, 'কঠিন, কঠিন!' তারপর আবার বনবন করে ঘুরে চলল লাল আর সবুজ চক্কর, সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল…

সিওম্‌কা মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল।

৬

ও যখন চোখ খুলল তখন সবে ভোর হয়েছে। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা নিভন্ত ধুনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ছাইয়ের ডাঁই তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে তা মাঠের

ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। চাষীরা তখন আর ছিল না, এদিকে অজানা লোকটি গ্রুটিস্রুটি মেরে মাটিতে শুয়ে ছিল।

সিওম্‌কা একটু উঠে বসল।

'দাদু!' ও বুড়োকে ডাকল, কিন্তু বুড়ো কোন সাড়া দিল না।

'চাষীরাই বা গেল কোথায়?' সেই মুহূর্তে তার মনে হল এবং হঠাৎ অজানা লোকটির জন্য তার আতঙ্ক উপস্থিত হল।

বাতাস শিস দিয়ে উঠল, ফুঃ দিয়ে ছাই ওড়াল। আধপোড়া কালো লকড়ির ওপর খসখস আওয়াজ তুলছে তপ্ত ডালপালা; মনে হচ্ছে গোটা প্রান্তর যেন খসখস করছে, কাতরাচ্ছে। গা ছমছম করতে লাগল।

'দাদু!' সিওম্‌কা আরও একবার চিৎকার করল, কিন্তু বাতাস তার কণ্ঠস্বর অন্য দিকে বয়ে নিয়ে গেল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার চোখ দুটো বুজে এলো, মাথাটা ভারী হয়ে আপনা-আপনি কাঁধের ওপর ঢলে পড়ল। সিওম্‌কা আবার শুয়ে পড়ল, আশেপাশে, সর্বত্র তার কানে বেজে চলল ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। ঘোরের মধ্যে তার মনে হল অজানা লোকটিকে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছে, মনে হল আবার সে বেলোয়ের কাছে কোথাও এসে পড়েছে, কিন্তু তাকে সেখানে ঢুকতে কে যেন বাধা দিচ্ছে, কে যেন তাকে পিছু টানছে, টানছে সেখানে, বিশাল মাঠের দিকে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছাইরঙা ব্যারাক। 'বটে! বাড়ি?' কে যেন ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল। এর পর গরম বাঁধাকপির ঝোল এনে সোজা সিওম্‌কার মুখে ঢালা হল, ঝোল পড়ছে তার মাথার ওপর, ক্রমেই পড়ছে আরও বেশি করে, পড়তে পড়তে তার মাথার ওপর জমে উঠল গোটা এক গরম পাহাড়, কিন্তু বাঁধাকপির ঝোল পড়ছে ত পড়ছেই। মাথা ফুলে যাচ্ছে, ভেতরে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। সিওম্‌কা হাঁসফাঁস করতে থাকে — সে চোখ খোলে। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বসে আছে অজানা লোকটি, সে বিষণ্ণ হয়ে মাথা নাড়ল।

'কী হয়েছে ভাই?' সিওম্‌কার মুখ হাত দিয়ে ছুঁয়ে সে বলল। সিওম্‌কা তার মাথার ওপর দেখতে পেল আকাশ, সূর্য আর ছাইরঙা দাড়ি ও কোটরে বসা চোখ। 'কী হয়েছে ভাই? আমাদের অবস্থা ত কাহিল দেখছি।'

'দাদু...' কোন রকমে বিড়বিড় করল সিওম্‌কা।

'আচ্ছা ভাই, এবারে উঠে বোস দেখি।'

বুড়ো ওকে উঠিয়ে নিজের কোলে বসাল, নিজের বুকের ওপর ওর মাথাটা এলিয়ে রাখতে দিল।

'কী হয়েছে ভাই?'

'কিছু না...' সিওম্‌কা বিড়বিড় করে বলল।

'হুঁশে ফিরে আয় একটু। কোন রকমে যেতে হবে ত। এখানে থেকে মরব নাকি?'

এক ঘণ্টা বাদে ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে আবার ধীরে ধীরে রাস্তায় চলতে লাগল। অজানা লোকটি মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মাপা পা ফেলে চলছিল, কিন্তু সিওম্‌কা থেকে থেকে হোঁচট খাচ্ছিল, তার পা ঠিকমতো পড়ছিল না।

'শহর আবার বড্ড দূরে,' বুড়ো কাতর স্বরে বলল। 'তোকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারলে হত। তোর অবস্থা ত আর আমার মতো নয়। তুই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারিস। আমার কিন্তু সেখানে — শহরে মুখ দেখানোই চলবে না! ওঃ কী জীবন, কী জীবন!..'

কিছুক্ষণ বাদে সিওম্‌কা থেমে পড়ল।

'দাদু, পা আর চলছে না। এসো একটু বসি।'

'চল্‌, এখান থেকে সরে ছোট বনটাতে যাই। ওখানে একটু গরম আছে। নে, আমাকে ধর। হ্যাঁ, এই ত ঠিক আছে! চল, চল।'

দুজনেই ছোট বনটাতে বসল। অজানা লোকটি সিওম্‌কাকে তার কোলের ওপর মাথা রাখতে বলল। সে নিজে ডালপালা ভেঙ্গে নিয়ে তা দিয়ে বিছানা তৈরি করল।

'শুয়ে পড়, শুয়ে পড় রে বাছা! শুয়ে পড়।'

'দাদু,' সিওম্‌কা অনুনয় করে বলল, 'আমাকে একা ফেলে যেও না! ও দাদু!..'

সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, কিন্তু আর একটি কথাও বলতে পারল না। আবার তার মনে হতে লাগল যে তার চারপাশে সব গুনগুন করছে, শিস দিচ্ছে, আবারও কে যেন তার মাথা ধরে টানছে, তার সামনে সবকিছু ঘুরছে, জ্বলছে।

'বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি!' অতি কষ্টে সিওম্‌কা উচ্চারণ করল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখ খুলল, কিন্তু এখন আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না...

মাঝে মাঝে তার মনে হয় কেমন সব নতুন নতুন লোকজন, অজানা, নতুন ব্যারাক; কখনও সে দেখতে পায় মা'কে, কখনও উজিউপ্‌কা নদী, কখনও ফের অচেনা লোকজন, কখনও বা অজানা দাদু; দিন আর রাত একাকার হয়ে যায়। অবশেষে সিওম্‌কা আবার চোখ মেলে তাকায়।

সে শুয়ে আছে একটা ঘরে, নরম বিছানার ওপর, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মাথার ওপরে ছাদ, দেখতে পাচ্ছে জানলার বাইরে উলঙ্গ, পাতলা একটা গাছ দুলছে।

সে আতঙ্কে ভাবতে থাকে, 'আবার ব্যারাক?' — তার ইচ্ছে হয় লাফ দিয়ে উঠে ছুট মারে, কিন্তু তার দেহ নড়ে না, আর মাথাটা ঠিক যেন বালিশের সঙ্গে সেঁটে জমে গেছে।

'দাদুই বা কোথায়?' চোখের দৃষ্টিতে পরিচিত মুখের সন্ধান করতে করতে সিওম্‌কা ভাবল। কিন্তু না ছিল বুড়ো, না বন, না বড় রাস্তা। অজানা লোকটি কেন তাকে ফেলে চলে গেল এই কথা মনে করে সিওম্‌কার খারাপ লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল, তার ফেকাসে, শীর্ণ মুখ বয়ে দরদর ধারে নিঃশব্দে ঝরে পড়ল চোখের জল

৭

এক দিন — অসুখের পর সিওম্‌কা তখনও দুর্বল — হাসপাতালের পোশাক গায়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে সে নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল; সেখানে জমা জলের ওপর দিয়ে বাতাসে হুটোপুটি খাচ্ছিল শরতের ঝরা পাতা। সিওম্‌কার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল হাসপাতাল কর্মচারী সৈনিক দেমিদিচ্, সে-ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল। সৈনিক ইতিমধ্যেই সিওম্‌কাকে বলে যে অসুস্থ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন তাকে বুড়ো এখানে নিয়ে আসে। এমন সময় ঘটনাচক্রে পুলিশের বড়কর্তার আবির্ভাব। বুড়োর ওপর নজর বুলিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এই যে চাঁদ!' বুড়ো ত সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। 'আবার পালিয়েছিস?' ওকে তৎক্ষণাৎ ধরা হল... বুড়ো এই নিয়ে তৃতীয় বার জেলখানা থেকে পালাচ্ছিল। তৃতীয় বার তাকে ধরা হল।

এসব কথা সিওম্‌কা এখন সৈনিকের কাছ থেকে শুনেছে। প্রতিদিনই সকাল-সন্ধে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর মনে মনে বলে, 'ভগবান, অজানা দাদুকে রক্ষা কর!..'

'এখন ওদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে,' সৈনিক বলল। 'দেখবে, এখনই নিয়ে যাবে।'

শিগ্‌গিরই সিওম্‌কার কানে ভেসে এলো অদ্ভুত চাপা আওয়াজ। তারপর আবির্ভাব হল বন্দুকধারী সৈন্যদের। তাদের পেছন পেছন চলেছে লোকজনের একটা দঙ্গল। লোকগুলোর গায়ে ছাইরঙা আলখাল্লা, মাথায় গোল টুপি, তাদের হাতে-পায়ে লটপট করতে করতে ঝনঝন শব্দে বাজছে বেড়ির শেকল। দু পাশে এবং পেছনেও চলেছে সৈন্যদল। সকলে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে রয়েছে।

সিওম্‌কা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে জানলার কাচের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ছাইরঙা লোকের ভিড়, খুঁজে চলল অজানা লোকটিকে। হঠাৎ সে মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, কাচের ওপর দুমদাম ঘুসি মারতে লাগল:

'দাদু! দাদু! দাদু!'

কয়েদীদের মধ্যে সে দেখতে পেল অজানা লোকটিকে। শিকল জড়ানো অবস্থায় সে প্রায় জানলার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

'দাদু! দাদু!' আনন্দে আর আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে সিওম্‌কা চেঁচাল।

ঠকঠক আওয়াজ শুনে অনেকেই ঘাড় ফেরাল। অজানা লোকটিও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। সিওম্‌কা দেখতে পেল সে তার কোটরে বসা ছাইরঙা চোখ মেলে তার দিকে তাকাল, দেখতে পেল সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভাবে তার উদ্দেশে মাথা নাড়ল।

সিওম্‌কা অঝোরে অশ্রুপাত করল, বুকের ভেতরে তার হৃৎপিণ্ড ভয়ংকর ধড়ফড় করতে লাগল। ততক্ষণে দঙ্গল আর রক্ষিদল পার হয়ে চলে গেছে, বাড়ির কোণের অন্য পাশে আড়াল

হয়ে গেছে। সিওম্‌কা তখনও ছটফট করছে, চেঁচাচ্ছে, 'দাদু, দাদু!' চৌকিদার উদাসীনভাবে বলল:

'কান্নাকাটি করছিস কেন? কান্নাকাটি করার কিছু নেই। তোকে শিগ্‌গিরই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, কেননা এটা একেবারেই তোর যুগ্যি জায়গা নয়। বললাম যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে — কান্নাকাটি করিস না!'

কিন্তু সিওম্‌কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, সে তখনও চেষ্টা করছে কোণের ও ধারের সেই বাঁকটি দেখার, যেখানে শিকলের ভার বয়ে নিয়ে চলে গেল তার দৈবাৎ মেলা প্রাণের বন্ধু — অজানা লোকটি।

লেওনিদ আন্দ্রেইয়েভ

বাগানবাড়িতে প্রেতিয়া



ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিখ্যাত গদ্যলেখক লেওনিদ নিকোলায়েভিচ্ আন্দ্রেইয়েভ (১৮৭১-১৯১৯) বিশেষভাবে শিশুদের জন্য কিছু লেখেন নি। কিন্তু আজও শিশুপাঠ্য বইয়ের তালিকা তৈরি করতে গেলে তাঁর 'নাশপাতি ও গেরাস্‌কা' (১৮৯৮) এবং 'বাগানবাড়িতে পেতিয়া' (১৮৯৯) -- তার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায় না।

ছোটবেলায় লেওনিদ আন্দ্রেইয়েভ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ফেনিমোর কুপার, মেইন রিড, গুস্তাভ এমার ও এডগার অ্যালেন পো'র লেখা। 'বাগানবাড়িতে পেতিয়া' গল্পটির সঙ্গে অবশ্যই রেড ইন্ডিয়ানদের জীবনের ঘটনামূলক আকর্ষণীয় উপন্যাস বা গোয়েন্দাকাহিনীর একেবারেই কোন মিল নেই। তবে এটি যে শিশুপাঠ্যে দৃঢ় স্থান করে নিয়েছে তার কারণ নিছক এই নয় যে গল্পের নায়ক এক বালক; রচয়িতা যে সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ করে বলতে পারেন সেটাও একটা কারণ বটে। সাধারণ ঘটনা - একটি শহুরে ছেলের শহরের বাইরে যাত্রা -- পরিণত হয় বিচিত্র ভ্রমণে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ - অজানার আবিষ্কার। গল্পের উপসংহারটিও তেমনি বিষাদপূর্ণ: পূর্বতন জীবনে - রূঢ় ও শোচনীয় বাস্তবতায় নায়কের প্রত্যাবর্তন।

তথাপি গল্পটি যে পেতিয়ার প্রতি কেবল করুণারই উদ্রেক করে তা নয়। আশ্চর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের, মুক্তির ও সুখের যে উল্লাস পেতিয়া অনুভব করে, তা যতই ক্ষণিকের হোক না কেন, তার স্মৃতিপটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকে এবং পাঠকের মন থেকেও মুছে যায় না।



নাপিত ওসিপ্ আব্রামভিচ্ খদ্দেরের বুকের ওপর নোংরা চাদরটা গোছগাছ করল, আঙুল দিয়ে ঘাড়ের পেছনে সেটাকে গুঁজে দিয়ে কাটা কাটা কর্কশ স্বরে হাঁক পাড়ল:

'ওরে ছোঁড়া, জল দে!'

খদ্দের আয়নায় নিজের বদনটা ভালো করে দেখে নিয়ে মন্তব্য করল যে তার থুতনিতে আরও একটা ব্রণ উঠেছে। পাশের কোন একটা জায়গা থেকে একটা রোগা, ছোট্ট হাত এগিয়ে এসে আয়না বসানো টেবিলের ওপর গরম জলের মগ রাখল। হাতটার দিকে সোজাসুজি চোখ পড়ে যেতে খদ্দের বেজার হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখজোড়া ওপরে তুলতে সে আয়নায় দেখতে পেল নাপিতের ছায়া — অদ্ভুত, কেমন যেন টেরছা; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল নীচের দিকে, কার যেন মাথার ওপর নাপিতের দ্রুত খেলে যাওয়া কটমটে চাউনি, আর অস্ফুট অথচ অর্থব্যঞ্জক ফিসফিসানির দরুন তার নীরব ঠোঁট নাড়া। মালিক ওসিপ্ আব্রামভিচ্ নিজে না হয়ে শিক্ষানবিসদের কেউ — প্রকোপি কিংবা মিখাইলা — যদি তার দাড়ি কামাত তাহলে ফিসফিসানিটা হয়ে দাঁড়াত উঁচু গলার, 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!' গোছের একটা অনির্দিষ্ট ধরনের হুমকির রূপ নিত।

তার মানেটা এই যে ছোঁড়া তেমন তাড়াতাড়ি জল এগিয়ে দিতে পারে নি, তার কপালে শাস্তি আছে।

'ওদের সঙ্গে এরকমই করা উচিত,' — একপাশে মাথাটা কাত করে দিয়ে নিজের একেবারে





নাকের কাছে ঘামে জবজবে বিরাট হাতটা নিরীক্ষণ করতে করতে সে ভাবল। হাতের তিনটে আঙ্গুল ছড়ানো আর বাকি দুটো — চটচটে ও সুগন্ধী — যতক্ষণ ভোঁতাগোছের ক্ষুর অপ্রীতিকর চড়চড় আওয়াজ তুলে সাবানের ফেনা ও কড়া দাড়ির কুচি চেঁছে চলল, ততক্ষণ আঙ্গুল দুটো মোলায়েমভাবে গাল আর থুতনি ছুঁতে লাগল।

যে ছোঁড়াটার ওপর ঘন ঘন চিৎকার চেঁচামেচি চলত তার নাম হল পেতিয়া। নাপিতের দোকানে যে ক'জন কর্মচারী ছিল তাদের মধ্যে সে হল সবচেয়ে ছোট। নিকোলকা নামে আরেকটি যে ছোঁড়া ছিল সে বয়সে ওর চেয়ে তিন বছরের বড় হবে, শিগ্‌গিরই শিক্ষানবিস হয়ে দাঁড়াবে। এখনই, সেলুনে একটু সাদাসিধে কোন খদ্দের এসে জুটলে, আর সেই সময়, মালিকের অনুপস্থিতিতে তার অ্যাসিস্টেণ্টরা কাজে গা লাগাতে না চাইলে তারা চুল কাটার কাজে নিকোলকাকে পাঠিয়ে দেয়। দশাসই চেহারার চৌকিদারের চুলভর্তি মাথার পেছনটা দেখার জন্য যে তাকে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয় এই নিয়ে তারা হাসাহাসি করে। অনেক সময় চুল নষ্ট করার দরুন খদ্দের রাগারাগি করত, চেঁচামেচি বাধাত। তখন অ্যাসিসেণ্টরাও নিকোলকার ওপর চোটপাট করত। তবে এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটত, নিকোলকাও তাই গুরুগম্ভীর চাল দেখাত, বড়দের মতো হাবভাব করত — বিড়ি-সিগারেট ফুঁকত, দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেলত, মুখ খারাপ করত, এমন কি পেতিয়ার কাছে জাঁক করে বলত যে ভোদকা খেয়েছে; তবে কথাটা সম্ভবত মিথ্যে। বড় রকমের মারামারি দেখার জন্য অন্য সব কর্মচারীর সঙ্গে সে-ও পাশের রাস্তায় ছুটে যেত, আর সেখান থেকে যখন ফিরে আসত তখন তাকে হাসিখুশি দেখাত। ওসিপ্ আব্রামভিচ্ তখন তার দুগালে দুটি চড় কষিয়ে দিত।

পেতিয়ার বয়স দশ। ও সিগারেট ফুঁকত না, ভোদকা খেত না, মুখ খারাপ করত না, যদিও অশ্লীল শব্দ তার প্রচুর জানা ছিল। এ সব ব্যাপারেই সে তার বন্ধুকে হিংসে করত।

দোকানে যখন খদ্দের না থাকত তখন পেতিয়া ও নিকোলকা কথাবার্তা বলত। দুজনে থাকলে নিকোলকা সব সময়ই একটু বেশি উদার হয়ে পড়ত এবং কাকে টেরি বলে, কোনটা কদম ছাঁট আর কোনটাই বা আলবার্ট ছাঁট তা 'ছোঁড়াটাকে' বোঝাত।

জানলার পাশে ছিল মোমের তৈরী আবক্ষ নারীমূর্তি, যার গালদুটো গোলাপী। মাঝে মাঝে ওরা জানলার আলসে বসে বুলভারের দিকে তাকিয়ে থাকত। খুব ভোরবেলা থেকে সেখানে শুরু হয়ে যায় জীবনচাঞ্চল্য। বুলভারের ধূলিধূসর গাছপালা নির্মম সূর্যের উত্তাপে স্থির হয়ে ঝিমুতে থাকে, তারা যে ছায়া বিস্তার করে তা-ও সেই রকমই ধূসর, সেখানেও নেই কোন শীতলতা। সব বেঞ্চিতেই বসে থাকে মেয়ে-পুরুষের দল। তাদের বেশভূষা অদ্ভুত ও নোংরা, তাদের মাথায় রুমাল নেই, টুপি নেই — দেখে মনে হয় তারা যেন এখানেই বাস করে, তাদের যেন আর কোন ঘরবাড়ি নেই। প্রায়ই দেখা যেত কোন একজনের উস্কখুস্ক মাথা অসহায়ভাবে কাঁধের ওপর ঢলে পড়েছে; বিনা বিশ্রামে হাজার হাজার কিলোমিটার পার হওয়ার পর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর যেমন অবস্থা হয় তেমনিভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দেহ খোঁজে ঘুমের উপযোগী পরিসর, কিন্তু

শ্বয়ে পড়ার মতো কোন জায়গা পাওয়া যায় না। ব্বলভারের পথে লাঠি হাতে পায়চারি করে বেড়ায় জ্বলজ্বলে নীলরঙা পোশাক পরনে পাহারাদার। সে লক্ষ্য রাখত যাতে কেউ বেঞ্চে গা এলিয়ে না দেয় কিংবা ঘাসের ওপর শ্বয়ে না পড়ে। সে ঘাস রোদে বাদামী হয়ে গেলেও বেশ নরম আর ঠাণ্ডা বটে।

নিকোলকা অনেককে নামে জানত, পেতিয়াকে সে তাদের সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী বলত আর দাঁত বার করে হাসত। পেতিয়া আশ্চর্য হয়ে যায় তার ব্বদ্ধি আর সাহসের কথা ভেবে, ভাবে কোন এক সময় সে নিজেও ওরকম হবে। তবে আপাতত তার ইচ্ছে অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার... বড় ইচ্ছে।

পেতিয়ার দিনগ্বলো আশ্চর্যরকম একঘেয়ে কাটতে থাকে, একে অন্যের মতো — যেন একই মায়ের পেটের দ্বটি ভাই। কী শীতে কী গ্রীষ্মে সে দেখতে পেত সেই একই আরশি। আরশি দ্বটোর মধ্যে একটি ছিল ফাটা, অন্যটি — বাঁকা আর মজার। ছোপধরা দেয়ালে ঝুলত সেই একই ছবি। সকাল-সন্ধ্যায় এবং সারা দিন পেতিয়ার ওপর বর্ষিত হত সেই একই কাটা কাটা চিৎকার: 'ওরে ছোঁড়া, জল দে!' সে খালি জল এগিয়ে দিত আর দিত। ছ্বটিছাঁটা, পরবের দিন বলে কিছ্ব ছিল না। রবিবার-রবিবার দোকানপাটের জানলা থেকে আলো পড়ে রাস্তা যখন আর আলোকিত হত না, তখন সেল্বন অনেক রাত অবধি সদর রাস্তায় আলো ফেলত, পথচারির চোখে প্রায়ই পড়ত ছোট্ট, রোগা ম্বর্তিটি ক্বঁজো হয়ে কোনায় নিজের টুলটিতে বসে আছে — হয় সে ডুবে আছে নিজের ভাবনাচিন্তায়, নয়ত ক্লান্তিতে ঢুলছে। পেতিয়া বড় ঘ্বমাত, তব্ব তার কেন যেন সব সময় ঘ্বম্বতে ইচ্ছে করত, আর প্রায়ই মনে হত যে তার চারপাশের কোন কিছ্বই সত্যি নয় — অপ্রীতিকর, দীর্ঘ এক স্বপ্ন মাত্র। সে প্রায়ই জল এদিক ওদিক চলকে ফেলত কিংবা 'ওরে ছোঁড়া, জল দে!' — এই কর্কশ হাঁক শ্বনতে পেত না। সে সমানে রোগা হয়ে যেতে লাগল, আর তার ছাঁটা মাথা ছেয়ে গেল জঘন্য খোসপাঁচড়ায়। ম্বখে ছ্বলিভর্তি এই রোগা ছেলেটি, তার সর্বক্ষণ ঘ্বম-ঘ্বম চোখ, অর্ধেক খোলা ম্বখ, হন্দ নোংরা হাত আর ঘাড় খদ্দেররা বিতৃষ্ণার চোখে দেখত। তার চোখের কোলে ও নাকের নীচে ফুটে উঠেছে বলিরেখা — ঠিক যেন স্বতীক্ষ্ম ছ্বঁচ রেখা টেনে গেছে, আর তাতে ওকে দেখাত এক ব্বড়োটে বামনের মতো।

পেতিয়া ব্বঝে উঠতে পারত না তার মন খারাপ লাগছে না ফুর্তি লাগছে, কিন্তু তার ইচ্ছে করত অন্য কোন জায়গায় চলে যেতে, অথচ সে জায়গা যে কোথায় এবং কেমন সে সম্পর্কেও কিছ্বই বলতে পারত না। তার মা, রাঁধ্বনি নাদেজ্‌দা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসত তখন সে আলস্যভরে মা'র আনা মিষ্টি খেয়ে যেত, আর কোন রকম অন্বযোগ না করে কেবল অন্বনয় বিনয় করত যে তাকে যেন এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরে সে নিজের অন্বরোধ ভুলে গিয়ে নির্বিকার চিত্তে মা'কে বিদায় দিত. এমন কি জিজ্ঞাসাও করত না কবে মা ফের আসবে। আর নাদেজ্‌দা এই ভেবে কষ্ট পেত যে তার একটিমাত্র ছেলে — সে-ও আবার বোকা।

এমনি করে সে যে কত কাল কাটিয়ে দিল তা পেতিয়ার জানা ছিল না। অবশেষে এক দিন দুপুরের খাবার সময় মা এসে হাজির। ওসিপ্ আব্রামভিচের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সে বললে যে কর্তারা যেখানে থাকেন সেখানে — ৎসারিৎসিনোর বাগানবাড়িতে ওর, মানে পেতিয়ার যাওয়ার অনুমতি হয়েছে। প্রথমটায় পেতিয়া বুঝতে পারে নি, তারপর ক্ষীণ হাসির ফলে তার মুখ সূক্ষ্ম বলিরেখায় ছেয়ে গেল, সে মা'কে তাড়া দিতে লাগল। নাদেজ্‌দাকে ভদ্রতার খাতিরে ওসিপ্ আব্রামভিচের সঙ্গে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে হয়, এদিকে পেতিয়া ধীরে ধীরে তাকে দরজার দিকে ঠেলতে থাকে, হাত ধরে টানাটানি করে। বাগানবাড়ি যে কী জিনিস তা ওর জানা ছিল না, তবে ওর অনুমান যে এ হল ঠিক সেই জায়গাটি যেখানে তার যাওয়ার বড় বাসনা ছিল। ও স্বার্থপরের মতো ভুলে গেল নিকোলকার কথা। নিকোলকা পকেটে হাত পুরে ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, যথারীতি বেপরোয়া ভঙ্গিতে নাদেজ্‌দার দিকে তাকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু বেপরোয়া ভাবের বদলে তার দু'চোখে ফুটে উঠছিল গভীর বিষণ্ণতা: ওর মা বলতে কেউ ছিল না; ঠিক এ মুহূর্তে এই মুটকি নাদেজ্‌দার মতো মা পেতেও তার আপত্তি নেই। এর কারণ, সে জীবনেও বাগানবাড়িতে যায় নি।

নানা কণ্ঠের হৈ-হট্টগোল, ট্রেন ঢোকার ঘর্ঘর আওয়াজ, ইঞ্জিনের শোঁ-শোঁ গর্জন — কখনও ওসিপ্ আব্রামভিচের কণ্ঠস্বরের মতো বাজখাঁই ও ক্রুদ্ধ, কখনও বা তার অসুস্থ স্ত্রীর গলার আওয়াজের মতো চিঁচিঁ ও রিনরিনে, ব্যস্তসমস্ত যাত্রীদের অবিরাম চলার স্রোত, যার বুঝি কোন শেষ নেই — সব নিয়ে স্টেশন এই প্রথম পেতিয়ার বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখা দিল, তার মন ভরে উঠল উত্তেজনা ও অস্থিরতার অনুভূতিতে। মা'র সঙ্গে সঙ্গে তারও আশঙ্কা হচ্ছিল দেরি না হয়ে যায়, যদিও বাগানবাড়ির ট্রেন ছাড়তে তখনও বাকি ছিল পুরো আধঘণ্টা। তারা কামরায় উঠে বসার পর যখন গাড়ি ছাড়ল তখন পেতিয়া জানলার সঙ্গে সেঁটে রইল, কেবল খ্যাংড়া কাঠির ওপর আলুর দমের মতো লিকলিকে ঘাড়ের ওপর তার ছাঁটা মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল।

পেতিয়া জন্মেছে ও বড় হয়ে উঠেছে শহরে, জীবনে এই সে প্রথম মাঠে। এত দূর অবধি যে দেখা যাচ্ছে, বনকে যে ঘাসের মতো দেখাচ্ছে আর এই নতুন জগতে আকাশ যে এমন আশ্চর্য স্বচ্ছ ও প্রশস্ত — ঠিক যেন ছাদ থেকে নজরে পড়ছে — এ সবই এখানে তার কাছে ছিল বিস্ময়কর, নতুন ও অদ্ভুত। পেতিয়া আকাশটাকে দেখতে পাচ্ছিল নিজের ধার থেকে, কিন্তু তার মা যেখানে বসে ছিল সে দিকে ফিরে তাকাতে উলটো দিকের জানলা থেকে ঐ একই আকাশ দেখাল নীল রঙের, তাতে ভাসছে খুশিভরা সাদা সাদা মেঘখণ্ড। পেতিয়া কখনও ছটফট করে নিজের জানলার ধারে কখনও বা দৌড়ে কামরার ওপাশে যায়, যেতে গিয়ে সে যে ভালো করে না ধোওয়া হাত অজানা যাত্রীদের কাঁধে ও হাঁটুতে ঠেকিয়ে ফেলছে, সে ব্যাপারে তার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। যাত্রীরাও প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কোন এক ভদ্রলোক হয়ত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুন, নতুবা একঘেয়েমিবশত ক্রমাগত হাই তুলে যাচ্ছিলেন। তিনি কিন্তু বার দুয়েক

অসন্তোষের ভঙ্গিতে ছেলেটির দিকে আড়চোখে তাকালেন, তাতে নাদেজ্‌দা তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাওয়ার সুরে বলল:

'এই প্রথম রেলগাড়িতে যাচ্ছে — মজা লাগছে...'

'হুম্‌!..' ভদ্রলোক গজগজ করে কাগজে মুখ গুঁজলেন।

নাদেজ্‌দার বড় ইচ্ছে করছিল তাকে বলে যে পেতিয়া আজ তিন বছর হল নাপিতের দোকানে কাজ করছে, নাপিত তাকে নিজের পায়ে খাড়া হতে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে, আর এটা খুব ভালোই হবে, সে একা মেয়েমানুষ, অবলা, অসুখবিসুখ হলে কিংবা বুড়ো বয়সে তার আর কোন অবলম্বন নেই। কিন্তু ভদ্রলোকটির মুখ ছিল রাগী-রাগী, তাই নাদেজ্‌দা এসব কথা কেবল মনে মনে ভাবল।

পথের ডান দিকে চলে গেছে এবড়োখেবড়ো গোছের এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর — সর্বক্ষণ ভিজে-ভিজে থাকার ফলে ঘন সবুজ, তার প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছাইরঙা ছোট ছোট ঘরবাড়ি — যেন পুতুলের ঘর; আর যে উঁচু সবুজ পাহাড়টার নীচে চকচক করছে রুপোলী ধারা, তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ঐরকমই এক খেলনা ধরনের সাদা গির্জা।

ট্রেন যখন ধাতু পেটানোর মতো সুরেলা খটাং খটাং আওয়াজ তুলে অকস্মাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্রীজের ওপর উঠে পড়ল এবং কাচের মতো ঝকঝকে নদীর জলের ওপরে ঠিক যেন শূন্যে ঝুলতে লাগল, তখন পেতিয়া ভয়ে ও আকস্মিকতায় চমকেই জানলা থেকে সরে যায়। কিন্তু পথের সামান্যতম খুঁটিনাটি অংশও হারাতে হবে এই আশঙ্কায় সে আবার সেখানে ফিরে এলো। পেতিয়ার চোখ দুটো এখন আর ঘুমো ঘুমো বলে মনে হয় না, বলিরেখাও মিলিয়ে গেছে। দেখে মনে হয় এই মুখের ওপর কেউ যেন গরম ইস্তিরি চালিয়ে দিয়েছে, বলিরেখা পালিশ করে দিয়ে তাকে সাদা আর ঝকঝকে বানিয়ে দিয়েছে।

বাগানবাড়িতে আসার পর প্রথম দুদিন বন দেখে পেতিয়ার ভয় হল। পেতিয়ার মাথার ওপর বন মৃদু আওয়াজ তুলছে, সে বন অন্ধকার, গভীর ভাবাচ্ছন্ন আর বড় ভয়াল। বনের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা আলোয় ঝলমলে, সবুজ, প্রফুল্ল যেন উজ্জ্বল ফুলে ফুলে মিলে সেখানে গান চলছে। পেতিয়ার ভালো লাগছিল, তার ইচ্ছে হচ্ছিল বোনের মতো ওদের আদর করে, আর গাঢ় নীল আকাশ তাকে নিজের কাছে ডাকছিল, হাসছিল জননীর মতো। পেতিয়া উত্তেজিত হল, চমকে উঠল, ফেকাসে হয়ে গেল; সে কার উদ্দেশে কে জানে মৃদু হাসতে লাগল, বনের ধারে আর পুকুরের বনজঙ্গলে ভরা পাড়ে বুড়োদের মতো গম্ভীরভাবে ঘুরে বেড়াল। এখানে সে ক্লান্ত হয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘন ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল, তার ভেতরে ডুবে গেল; কেবল তার ছুলিভর্তি ছোট্ট নাকটি সবুজের স্তরের ওপরে উঠে থাকে। প্রথম প্রথম সে ঘন ঘন মা'র কাছে ফিরে আসত, মা'র কাছটিতে ঘেঁসে থাকত, আর জমিদারবাবু যখন জিজ্ঞেস করতেন বাগানবাড়িতে তার ভালো লাগছে কিনা তখন অপ্রস্তুতের হাসি হেসে জবাব দিত:

'ভালো!..'

তারপর আবার সে যায় ভয়ঙ্কর বন আর শান্ত জলের দিকে, যেন কোন ব্যাপারে তাদের সে জিজ্ঞেসবাদ করছে।

কিন্তু আরও দুদিন যেতেই প্রকৃতির সঙ্গে পেতিয়ার পুরোপুরি মনের মিল হয়ে গেল। এটা ঘটল 'স্তারয়ে ৎসারিৎসিনোর' হাই স্কুলের ছাত্র মিতিয়ার কল্যাণে। হাই স্কুলের ছাত্র মিতিয়ার মুখ পোড়াটে হলদে, মাথার চাঁদিতে খাড়া চুল, চুল বিলকুল সাদা — রোদে এমনই ঝলসে গেছে। সে পুকুরে মাছ ধরছিল। পেতিয়াকে দেখতে পেয়ে ভদ্রতার বালাই না রেখে তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল, আশ্চর্যরকম তাড়াতাড়ি তাদের ভাব হয়ে গেল। ও একটা ছিপ পেতিয়াকে ধরিয়ে দিল। পরে তাকে চান করার জন্য দূরে কোথায় যেন নিয়ে গেল। পেতিয়া জলে নামতে খুব ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু নামার পর সেখান থেকে আর উঠে আসতে চায় না, এমন ভাব করল যেন সাঁতার কাটছে: নাক উঁচিয়ে, ভুরু ওপরে তুলে হাঁসফাঁস করতে করতে দুহাত দাপিয়ে জল ছিটিয়ে চলল। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে প্রায় মনে হচ্ছিল যেন একটা কুকুরছানা এই প্রথম জলে এসে পড়েছে। পেতিয়া যখন জামাকাপড় পরল তখন সে ঠাণ্ডায় মড়ার মতো নীল হয়ে গেছে, কথা বলতে গিয়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। মিতিয়ার কল্পনার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেই মিতিয়ারই প্রস্তাবমতো ওরা কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে অনুসন্ধান চালাল, গাছপালায় ছেয়ে যাওয়া ছাদের ওপর উঠল, বিশাল দালানের বিধ্বস্ত দেয়ালের মাঝখানে ঘোরাঘুরি করল। জায়গাটা বেশ ভালো লাগছিল: চারদিকে বোঝাই ইঁট-পাথরের স্তূপ, অতি কষ্টে সেগুলোর ওপর ওঠা যায়। তাদের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে অ্যাশবেরি ও বার্চের চারা। মৃত্যুর নীরবতা ঘনিয়ে আছে, মনে হয় কোনা থেকে এই বুঝি কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে কিংবা ফাটা চৌচির জানলার ফাঁক দিয়ে একটা বিকট মুখ দেখা দেবে। ধীরে ধীরে পেতিয়া বাগানবাড়িতে আপন ঘরবাড়ির মতো অনুভব করতে লাগল, জগতে যে ওসিপ্ আব্রামভিচ্ আছে, সেলুন আছে তা সে বেমালুম ভুলে গেল।

'কেমন নাদুসনুদুসটি হয়ে উঠেছে দেখ দেখি! খাঁটি ব্যবসায়ীটি!' নাদেজ্দার মন ভরে উঠল। সে নিজেও মোটাসোটা আর রান্নাঘরের গরমে তেতে লাল — যেন তামার সামোভার। সে সাব্যস্ত করল, তার কারণ এই যে পেতিয়াকে খুব করে খাওয়ানো হচ্ছে। পেতিয়া কিন্তু একেবারেই কম খেত। কারণ এই নয় যে তার খেতে ইচ্ছে করত না, আসলে ঝামেলা পোহানোর সময় তার ছিল না। না চিবিয়ে যদি সরাসরি গেলা যেত তা হলে এক কথা, তা নয়, চিবোও আর ফাঁকে ফাঁকে পা নাচাও, কেননা নাদেজ্দা বেজায় ধীরে ধীরে খায়, হাড়কাঁটা চেঁছেপুঁছে খায়, অ্যাপ্রনে হাতমুখ মোছে আর আজেবাজে বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে চলে। এদিকে পেতিয়ার কাজ অফুরন্ত: পাঁচবার স্নান করতে হয়, বাদামের জঙ্গল থেকে ছিপের কঞ্চি কাটা দরকার, পোকামাকড় যোগাড় করা দরকার — এ সবেরই জন্য চাই সময়। এখন পেতিয়া খালি পায়ে ছুটোছুটি করে, পুরু সোল দেওয়া হাই বুটের চেয়ে এ হাজার গুণ ভালো: রুক্ষ মাটি কখনও আদর করে পায়ে জ্বলুনি ধরিয়ে দেয়, কখনও বা ধরিয়ে দেয় ঠাণ্ডা। স্কুল বয়ের যে সেকেন্ড হ্যান্ড কোর্তায় তাকে

চুলকাটার সেলুনের ভারিক্কি কারিগর বলে মনে হত, সেটিও সে খুলে ফেলল। কেবল সন্ধ্যায় সে ওটা গায়ে দিত, যখন বাঁধের ধারে দেখতে যেত সাজগোজ করা, ফুর্তিবাজ বাবুর দলের নৌকো চড়ে বেড়ানো — তারা হাসতে হাসতে দোল খাওয়া নৌকোয় চেপে বসছে, নৌকো ধীরে ধীরে কাচের মতো স্বচ্ছ জল কেটে চলছে আর গাছের ছায়া তির্‌তির্‌ করে কাঁপছে — যেন গাছপালার ওপর দিয়ে মৃদু হাওয়া বয়ে চলছে।

সপ্তাহের শেষে জমিদারবাবু শহর থেকে 'রাধনি নাদেজদা'র নামে চিঠি নিয়ে এলেন: যার উদ্দেশে লেখা, তাকে পড়ে শোনানো হলে সে কেঁদে উঠল, অ্যাপ্রনের ঝুলকালিতে মুখ মাখামাখি করে ফেলল। এহেন কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা কাটা যে কথাগুলি বলল তা থেকে বোঝা গেল যে কথা হচ্ছে পেতিয়াকে নিয়ে। এটা ঘটল সন্ধে নাগাদ। পেতিয়া পেছনের আঙিনায় একা একা এক্কা-দোক্কা খেলছে। খেলছিল সে গাল ফুলিয়ে, কারণ এইভাবে লাফানো অনেক সহজ। হাই স্কুলের ছাত্র মিতিয়া তাকে এই অপদার্থ অথচ মজার খেলাটি শেখায়। এখন পেতিয়া সত্যিকারের খেলোয়াড়ের মতো একা একা উন্নতিসাধন করছে। জমিদারবাবু বেরিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন:

'কী ভাই, যাওয়া ত দরকার!'

পেতিয়া ভেবাচেকা খেয়ে হাসল, চুপ করে রইল।

'আজব ছেলে বটে!' জমিদারবাবু ভাবলেন।

'যাওয়া ত দরকার, ভাই।'

পেতিয়া মৃদু হাসল। নাদেজ্‌দা এগিয়ে এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সায় দিয়ে বলল:

'যেতে হয় রে বাছা!'

'কোথায়?' পেতিয়া অবাক।

শহরের কথা সে ভুলে গেছে, আর অন্য জায়গা, যেখানে তার সব সময় যেতে ইচ্ছে করত, সে ত খুঁজেই পাওয়া গেছে।

'মালিকের কাছে, ওসিপ্‌ আব্রামভিচের কাছে।'

পেতিয়া আগের মতোই অবুঝ, যদিও ব্যাপারটা পরিষ্কার। তার গলা শুকিয়ে গেল, জিভ কোন রকমে নড়ছিল যখন সে জিজ্ঞেস করল:

'কাল তা হলে মাছ ধরব কী করে? ছিপ তৈরী যে...'

'কী আর করা যাবে?.. তলব পড়েছে। বলছে প্রকোপি রোগে পড়েছে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লোক নেই বলছে। তুই কাঁদিস না। দেখিস আবার ছাড়বে। ওসিপ্‌ আব্রামভিচ্‌ লোকটা ভালো।'

পেতিয়ার কিন্তু কাঁদার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সে তখনও বুঝছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পেতিয়ার ভাবনা স্পষ্ট হতে লাগল। তখন সে মা'কে তাজ্জব বানিয়ে দিল, জমিদারবাবু ও জমিদার গিন্নীর মনমেজাজ বিগড়ে দিল: শহরের রোগা, হাড়জিরজিরে বাচ্চারা যেমন কান্না

কাঁদে সে যে কেবল তেমনিভাবে কাঁদল তা নয় — প্রচণ্ড গলাবাজ চাষাভুষোর চেয়েও জোরে গলা ফাটাল, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ছোট রোগা হাত মুঠো পাকিয়ে সে ঘা মেরে চলল মা'র হাতে, মাটিতে, যা কিছুর ওপর পড়ল — তাতে। খোঁচা খোঁচা নুড়ি আর কাঁকর ফুটে যাওয়ায় সে ব্যথা বোধ করছিল, কিন্তু ব্যথা বাড়িয়ে তোলাতে রোখ যেন তার আরও বেড়ে গেল।

যথাসময়ে পেতিয়া শান্ত হল। জমিদার গিন্নী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে সাদা গোলাপ গুঁজছিলেন। জমিদারবাবু তাঁকে বললেন:

'দেখলে ত, থেমে গেছে। বাচ্চাদের দুঃখ আর কতক্ষণের?'

'যা-ই বল না কেন, বেচারি ছেলেটার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।'

'তা ঠিক, ওরা ভয়ানক অবস্থার মধ্যে বাস করে। তবে এমন লোকও ত আছে, যাদের অবস্থা আরও খারাপ। তুমি কি তৈরী?'

তাঁরা দিপ্‌মানের বাগানের উদ্দেশে চললেন। সে সন্ধ্যায় ওখানে নাচের আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সামরিক বাজনা শুরু হয়ে গেছে।

পর দিন সকাল সাতটার গাড়িতেই পেতিয়া মস্কোয় চলল। আবার তার পাশে ঝলক দিল রাতের শিশিরে সাদা প্রলেপ ধরা সবুজ মাঠ, তবে এবার তা ছুটে চলেছে আগে যে দিকে চলছিল সে দিকে নয় — উল্‌টো দিকে। স্কুল বয়ের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কোর্তায় ডুবে গেছে তার রোগা দেহটা, কোর্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা সুতীর কলারের প্রান্ত। পেতিয়া ছটফট করল না, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল না বললেই চলে। সে চুপচাপ শান্তশিষ্ট হয়ে বসে ছিল, তার হাত দুটো ভদ্র ছেলের ভঙ্গিতে কোলের ওপর ভাঁজ করা ছিল। চোখজোড়া ঘুমো ঘুমো, উদাসীন, বুড়ো মানুষের মতো চোখের কোলে আর নাকের নীচে এসে জমেছে সূক্ষ্ম বলিরেখা। দেখতে দেখতে জানলার পাশে ঝলক দিল প্ল্যাটফর্মের থাম আর চালের আড়া, গাড়ি থেমে গেল।

ব্যস্তসমস্ত যাত্রীদের মাঝখান্ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে তারা ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত রাস্তায় বেরিয়ে এলো। লোলুপ মহানগরী নির্বিকারচিত্তে তার ছোট শিকারটিকে গিলে ফেলল।

'তুমি ছিপটা লুকিয়ে রেখো!' মা যখন পেতিয়াকে সেলুনের চৌকাট অবধি পেঁছে দিল তখন সে বলল।

'লুকিয়ে রাখব রে, লুকিয়ে রাখব! হয়ত আবার আসবি।'

আবার নোংরা, গুমোট সেলুনে শোনা যায় কাটা কাটা স্বরে হাঁক: 'ওরে ছোঁড়া, জল দে!' খদ্দের দেখতে পায় আয়না বসানো টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে ছোট নোংরা একটা হাত, শোনা যায় ফিসফিস স্বরে অনির্দিষ্ট ধরনের হুমকি: 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!' তার মানেটা এই যে ঘুমকাতুরে ছেলেটা জল চলকে ফেলেছে, কিংবা হুকুম গুলিয়ে ফেলেছে। আর রাতে, যেখানে নিকোলকা ও পেতিয়া ঘুমায়, সেখানে বেজে চলে উত্তেজিত, চাপা কণ্ঠস্বর, পেতিয়া বলে চলে বাগানবাড়ির গল্প, এমন সব ঘটনা যা ঘটে না, যা কেউ কখনও দেখে নি, শোনেও নি। ঘনায়মান

নীরবতার মধ্যে শোনা যায় অসমান তালে শিশুর বুকের স্পন্দন। বাচ্চাদের মতো নয় — রুক্ষ ও জোরাল — অন্য একটি কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে:

'জাহান্নামে যাক! মরুক গে!'

'কে জাহান্নামে যাবে?'

'এই অমনি... সব্বাই।'

পাশ দিয়ে চলে যায় ঘোড়ার গাড়ি। তার প্রচণ্ড ঘর্ঘর আওয়াজে ছেলেদের গলার আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।

আলেক্সান্দ্র কুপ্রিন

ধলা পুড্‌ল



'ধলা পুড্ল' --- বিগত শতকের শেষভাগ থেকে বর্তমান শতকের গোড়ার দিক অবধি অন্যতম প্রতিভাবান রুশ গদ্যলেখক আলেক্সান্দ্র ইভানভিচ্ কুপ্রিনের সবচেয়ে বিখ্যাত শিশুপাঠ্য কাহিনী।

১৮৭০ সনে এক প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারীর গৃহে কুপ্রিনের জন্ম। কুপ্রিন ছিলেন পেশাদার সামরিক কর্মচারী, মুষ্টিযোদ্ধা, জমিদারীর ম্যানেজার, থিয়েটারের অভিনেতা, কারখানার অফিসের কেরানি, বিমানচালনা এবং সার্কাসে তাঁর শখ ছিল, এমন কি দাঁতের ডাক্তারের পাঠও তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর গল্প ও উপাখ্যান -- রুশ জীবনের সমৃদ্ধ ও বহুমুখী জ্ঞানের দর্পণ বিশেষ।

নিসর্গজগৎ ও পশুপাখি সম্পর্কে এবং থিয়েটার ও সার্কাস জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে কুপ্রিনের লেখা বহু গল্প -- 'ময়না', 'হাতি জেম্বো', 'পশুশালায়' ও অন্যান্য রচনা শিশুসাহিত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'ধলা পুড্ল' রচিত হয় ১৯০৪ সনে। গল্পটির ভিত্তি -- সত্যিকারের এক ঘটনা। ক্রিমিয়ায় কুপ্রিন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।

অক্টোবর মহাবিপ্লবের পর লেখক দেশান্তরে জীবন যাপন করেন। ১৯৩৭ সনে তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 'আমার বড় ইচ্ছে সোভিয়েত যুবসম্প্রদায় আর মুগ্ধকর সোভিয়েত শিশুদের জন্য লিখি,' পত্রিকায় প্রকাশিত এক ঘোষণাপত্রে তিনি বলেন। দুঃখের বিষয় এই যে সে সাধ আর তাঁর মিটল না --- এক বছর বাদে কুপ্রিনের মৃত্যু হয়।



১

সর্ পাহাড়ী পায়ে-চলা-পথ ধরে, ক্রিমিয়ার দক্ষিণ তীর বরাবর বাগানবাড়ির এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় এগিয়ে চলে ছোট্ট যাযাবর দলটি। গোলাপী রঙের লম্বা জিভ একপাশে ঝুলিয়ে আগে আগে সচরাচর দৌড়ে দৌড়ে চলে ধলা পুড্ল কুকুর আর্তো। গায়ের লোম ছাঁটার ফলে তাকে দেখায় যেন সিংহটি। রাস্তার চৌমাথায় সে থমকে দাঁড়ায়, লেজ নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পেছন ফিরে তাকায়। কোন্ লক্ষণ থেকে — কেবল সে-ই জানে, কী থেকে — ও সব সময় নির্ভুলভাবে পথ চিনতে পারে, লোমশ কানজোড়া ফুর্তিতে লটপট করে দোলাতে দোলাতে জোর কদমে সামনে ছোটে। কুকুরের পেছন পেছন চলেছে বারো বছরের ছেলে সেরিওজা। তার বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচে ধরা আছে গুটানো সতরঞ্চি — শারীরিক কসরৎ দেখানোর সময় কাজে লাগে। ডান হাতে সে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা ছোট নোংরা খাঁচা। খাঁচায় আছে দোয়েল পাখি। সে শিক্ষামতো বাক্স থেকে ভবিষ্যদ্বাণী লেখা রঙবেরঙের কাগজ টেনে বার করতে পারে। অবশেষে সবার পেছনে মন্থর গতিতে পা ফেলে চলে দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য — মার্তিন লদিজ্‌কিন দাদু। তার নুয়ে পড়া পিঠে — কলের অর্গ্যান।

কলের অর্গ্যানটি পুরনো, গলা ভাঙা ও কাশিতে ভুগছে, সারা জীবনে কয়েক ডজনবার ওকে মেরামতের ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। তাতে বাজত দুটি জিনিস — লাওপারের বিষণ্ণ জার্মান





ওয়াল্‌ট্‌জ আর 'চীন ভ্রমণ' গীতের গ্যালপ। এ দুটির চল ছিল আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে, কিন্তু এখন আর কারও ওগুলো মনে নেই। তাছাড়া অর্গ্যানটিতে ছিল দুটি বিশ্বাসঘাতক পাইপ। একটি হল যাতে সপ্তমের সুর খেলে। তার সুর কেটে গেছে। সেটি একেবারেই বাজে না, তাই ঐ জায়গায় এলেই গোটা বাজনা যেন হেঁচকি তুলতে থাকে, খোঁড়াতে আর হোঁচট খেতে শুরু করে। অন্য পাইপটির — যেখান থেকে খাদের সুর বার হয় — ঢাকনা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয় না: একবার গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে সেটি আর সব সুরকে চাপা দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে, যতক্ষণ না নিজের ইচ্ছায় আচমকা থেমে যায়। দাদু নিজেই তার যন্ত্রের এই ত্রুটি স্বীকার করত, প্রায়ই ঠাট্টা করে চাপা বিষাদের সুরে বলত:

'কী করা যাবে?.. সেকেলে যন্ত্র, সর্দি লেগেছে। বাজনা শুরু করলেই, বাগানবাড়িতে যারা হাওয়া বদল করতে আসে তারা রেগে যায়, বলে, 'ফুঃ কী জঘন্য!' কিন্তু গানগুলো ত ভালোই, চালুও ছিল, অথচ একালের বাবুদেরই কেবল দেখছি আমাদের গানবাজনার ওপর কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। ওনাদের এখন চাই 'গেইশা', 'জোড়ামাথা ঈগলপাখি', 'পাখিওয়ালা' প্রহসনের ওয়াল্‌ট্‌জ। এই পাইপগুলোও আবার... অর্গ্যানটাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কারিগরের কাছে — সারাই করার জন্যে হাতই দিতে চায় না। বলে, 'নতুন পাইপ লাগানো দরকার, তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমার এই পচা মালটাকে জাদুঘরে বেচে দাও... কোন একটা স্মৃতিচিহ্নের মতন আর কি...' বটে দিচ্ছি! যন্তরটা তোকে আর আমাকে এতকাল অন্ন জুটিয়েছে রে সেরিওজা, ভগবান করুন, এর পরেও যোগাবে।'

মার্তিন লদিজ্‌কিন দাদু তার কলের বাজনাটিকে এত ভালোবাসত যে তেমন করে লোকে ভালোবাসতে পারে একমাত্র জীবন্ত, ঘনিষ্ঠ কাউকে, এমন কি সম্ভবত কোন আত্মীয় পরিজনকে। বহুকালের ভবঘুরে জীবনে ওটাতে সে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে সে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে দেখতে শুরু করল আত্মা এবং চৈতন্য বলতে যা বোঝায় প্রায় সেরকম একটা কিছু। মাঝে মাঝে এমন হত যে রাতে হয়ত কোন নোংরা সরাইখানায় সে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সময় দাদুর শিয়রের কাছটিতে মাটিতে রাখা যন্ত্রটি থেকে বেরিয়ে এলো ক্ষীণ আওয়াজ, বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ ও কাঁপা কাঁপা — ঠিক যেন বুড়োর দীর্ঘশ্বাস। তখন লদিজ্‌কিন ধীরে ধীরে অর্গ্যানের নকশাকাটা পাশটিতে হাত বুলায় আর আদর করে ফিসফিসিয়ে বলে:

'কী হল ভাই? নালিশ করছিস?.. সহ্য কর রে, সহ্য কর...'

বাজনাটাকে সে যেমন ভালোবাসত, ততটাই -- এমন কি তার চেয়ে কিছু বেশিই বা হবে — ভালোবাসত অনবরত ভ্রমণে তার ছোট যে দুই সঙ্গী আছে, তাদের — পুড্‌ল কুকুর আর্তো আর বাচ্চা সেরিওজাকে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এক উচ্ছৃংখল চরিত্রের বিপত্নীক মুচির কাছ থেকে ছেলেটিকে সে 'ভাড়া' নেয়, ঠিক হয় এর জন্য মুচিকে সে মাসে দু'রুবল করে দেবে। কিন্তু মুচি শিগ্‌গিরই মারা যেতে যেমন মনেপ্রাণে, তেমনি নগণ্য পার্থিব আগ্রহের বশেও বটে — সে চিরকালের জন্য দাদুর বাঁধনে বাঁধা রয়ে গেল।

২

খাড়া উ‘চু তীর ধরে একশ বছরের প্রাচীন জলপাই গাছের ছায়ায় ছায়ায় আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে পায়ে-চলা-পথ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছে সমুদ্র, তাতে মনে হচ্ছিল যেন দূরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র তার বিশাল শান্ত প্রাকার নিয়ে ঊর্ধে উঠে যাচ্ছে আর রুপোলী ছোঁয়া লাগা সবুজ পাতার মাঝখানে, কাটা কাটা নকশার ভেতরে তার রং দেখাচ্ছিল আরও নীল, আরও গাঢ়। ঘাস, লাল চেরী ও বনগোলাপের ঝোপ, আঙুর খেত আর গাছপালা — সর্বত্র ছেয়ে গেছে ঘুঘুরে পোকায়। তাদের একঘেয়ে, অবিরাম ঝি’ঝি’ আওয়াজে বাতাসে কাঁপন ধরেছে। প্রচণ্ড গরমের দিন, বাতাস স্তব্ধ, গনগনে মাটি পায়ের তলায় জ্বলুনি ধরিয়ে দেয়।

স্বাভাবিক গতিতে দাদুর আগে আগে চলতে চলতে সেরিওজা থমকে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না বুড়ো এসে তার নাগাল ধরে।

‘কী হল রে সেরিওজা?’ বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

‘গরম, লদিজ্‌কিন দাদু... মোটে সহ্য করা যাচ্ছে না! চান করতে পারলে হত।’

বুড়ো চলতে চলতে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিঠের ওপর যন্ত্রটা ঠিক করে নিল, ঘামে ভেজা মুখটা জামার হাতা দিয়ে মুছল।

‘পারলে ত ভালোই হত!’ লুব্ধ দৃষ্টিতে নিচে, সমুদ্রের স্নিগ্ধ নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘কেবল কথাটা হচ্ছে এই যে চান করার পর আরও বেশি হাঁপ ধরবে। এক জানাশোনা ডাক্তার আমাকে বলেছিল, নুন হল এমন এক জিনিস যা মানুষের ওপর কাজ করে... মানে, কথাটা হল গিয়ে, দুর্বল করে ফেলে। নুন ত সমুদ্রেরই...’

‘হয়ত বাজে কথা বলেছে?’ সেরিওজা সন্দেহ প্রকাশ করল।

‘বললেই হল বাজে কথা! সে বাজে কথা বলতে যাবে কোন দুঃখে? শাঁসাল লোক, মদ-টদ খায় না... সেভাস্তোপলে তার বাড়ি। তাছাড়া, এখানে সমুদ্রে নামার মতো জায়গাও নেই। দাঁড়া, আগে মিস্‌খোর অবধি যাই ত, সেখানে আমাদের পাপ শরীর ধোয়া-পাখ্‌লা করা যাবে ’খন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগে চান করাই ত ভালো... আর তারপর টেনে ঘুম... তোফা!’

আর্তো তার পেছনে কথাবার্তা শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ছুটে ওদের কাছে এলো। তার দরদভরা নীল চোখদুটি গরমে পিটপিট করছিল, স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল, আর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা জিভটা ঘন ঘন নিশ্বাসের ফলে কাঁপছিল।

‘কী হল, কুকুর ভায়া? গরম?’ দাদু জিজ্ঞেস করল।

কুকুরটা টানটান হয়ে হাই তুলল, জিভ গোল করে গুটিয়ে নিয়ে গোটা শরীর ঝাঁকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে কি‘উকি‘উ করে উঠল।

‘তা ঠিক ভায়া, কী আর করা যাবে?’ লদিজ্‌কিন গুরুমশাইয়ের ঢং-এ বলে চলল, ‘কথায় বলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। তোর অবিশ্যি, বলতে গেলে, মাথার ঘাম আবার কী? তবু... যাক গে,

চল, চল, আগে চল, পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে আর কাজ নেই। আমি কিন্তু, সেরিওজা, বলতে বাধা নেই, এই গরমটা ভালোই বাসি। কেবল বাজনাটা নিয়েই যত গণ্ডগোল কাজকম্ম যদি না থাকত তাহলে ঘাসের ওপর, ছায়ায় কোথাও শুয়ে পড়তাম — মানে, পড়ে থাকতাম সটান চিৎপটাং হয়ে। আমাদের বুড়ো হাড়ের জন্যে এই রোদ হল সবচেয়ে বড় জিনিস।'

পায়ে-চলা-পথ নিচে নেমে গিয়ে এসে মিশেছে পাথরের মতো কঠিন, চোখ ধাঁধানো সাদা এক চওড়া রাস্তার সঙ্গে। এখানে শুরু হয়েছে প্রাচীন কাউণ্ট পার্ক। পার্কের ঘন শ্যামলিমার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সুন্দর সুন্দর বাগানবাড়ি, ফুলের কেয়ারি, গাছপালার কাচঘর আর ফোয়ারা। এই জায়গাগুলো লদিজ্‌কিনের ভালোই জানা ছিল: প্রতি বছর, আঙুরের মরসুমের সময় যখন গোটা ক্রিমিয়া সুন্দর সুন্দর সাজগোজ পরা, ধনী ও ফুর্তিবাজ লোকজনের ভিড়ে ছেয়ে যায়, তখন সে এসব জায়গা একের পর এক পার হয়। দক্ষিণের প্রকৃতির উজ্জ্বল জাঁকজমক বুড়োর মনে দাগ কাটে না, কিন্তু সেরিওজা এখানে প্রথম এসেছে - তাকে অনেক কিছুই মুগ্ধ করল। ম্যাগ্নোলিয়া, তাদের শক্ত, ঠিক যেন বার্নিশ করা, চকচকে পাতা আর বড় বড় থালার আকারের সাদা ফুল; ভারী ভারী থোকায় নিচে ঝুলে পড়া আঙুরে নিরেট ঠাসা কুঞ্জ; বহু শতাব্দীর বিশাল বিশাল চওড়া পাতাওয়ালা গাছ, তাদের গায়ের উজ্জ্বল বাকল, তাদের ঝাঁকড়া মাথা; তামাকের আবাদ, জলধারা ও জলপ্রপাত এবং কেয়ারিতে, বেড়ায়, বাগানবাড়ির দেয়ালে দেয়ালে — সর্বত্র অপূর্ব উজ্জ্বল সুরভিত গোলাপফুল — এসবের সজীব স্ফুটমান মাধুর্য বালকের সরল মনে বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারল না। সে সরবে তার পুলক প্রকাশ করল, প্রতি মুহূর্তে বুড়োর জামার হাতা ধরে টানতে লাগল।

'লদিজ্‌কিন দাদু, ও দাদু, দেখ দেখ, ফোয়ারায় না সোনার মাছ! মাইরি বলছি, দাদু, সোনার! আহা দেখে মরে যাই।' বাগিচার রেলিং-এ মুখ চেপে ধরে সেরিওজা চেঁচাল। রেলিং ঘেরা বাগিচার মাঝখানে ছিল বিশাল এক জলাশয়। 'দাদু, আর পীচ্‌ফল! ঐ দেখ না কত! একটা গাছে কত ধরেছে!'

'চল্ রে হাঁদারাম, চল্! অমন হাঁ করে দেখার কী আছে!' বুড়ো মজা করে ওকে সামান্য ঠেলা মারল। 'দাঁড়া, নভোরসিইস্ক শহরে গিয়ে নিই, মানে আবার দক্ষিণে গিয়ে পড়ব। হ্যাঁ, সে হল জায়গা — দেখার মতো বটে। বলতে গেলে বুঝলি না, এখুনি তোর মনে ধরবে। সোচি, আদ্‌লের, তুআপ্‌সে, আর ওখানে ভায়া আমার, সুখুম, বাতুম... দেখে চোখ টেরিয়ে যাবে। এই ধর না কেন, তালগাছ। আশ্চয্যি! গুঁড়িটা তার লোমশ, অনেকটা কম্বলের মতো, আর একেকটা পাতা অ্যায়সা বড় যে তুই আমি — আমরা দুজনেই একেবারে ঢাকা পড়ে যাব।'

'মাইরি?' সেরিওজা অবাক হয়ে খুশির সুরে বলল।

'সবুর কর, নিজেই দেখতে পাবি। আর সেখানে কী নেই? যেমন ধর কমলালেবু, না হয় নিদেনপক্ষে এই লেবুই ধর না... দোকানে দেখে থাকবি নিশ্চয়?'

'তা, হল কী?'

'সেরেফ্ অমনি অমনি শূন্যিতে জন্মায়। কোন কিছু ছাড়াই গাছে — মানে, যেমন আমাদের ওখানে ফলে আপেল কিংবা নাসপাতি... আর লোকজন সেখানে ভায়া, একেবারে আজব — তুর্কী, পার্সিস্যি, চেরকেস — এমনি নানা জাতের, সব্বার গায়ে ঢিলে আলখাল্লা, সঙ্গে ছোরা। বেপরোয়া জাত! তায় আবার সেখানে ভায়া হাবশীও দেখা যায়। বাতুমে আমি ওদের বহুবার দেখেছি।'

'হাবশী? জানি। সেই, যাদের মাথায় শিং আছে তারা ত?' সেরিওজা বোদ্ধার মতো বলল।

'শিং-টিং, ধর না কেন, ওদের নেই, ওটা বাজে কথা। তবে কালো কুচকুচে, জুতোর মতন, এমন কি চকচক করে। ঠোঁট ওদের লাল টকটকে, পুরু, আর চোখ সাদা, আর চুলগুলো হল গিয়ে কোঁকড়া, কালো ভেড়ার যেমন হয়।'

'ভয়ংকর তাহলে... এই হাবশীগুলো?'

'ঠিক তা নয়। অভ্যেস নেই বলে একটু ভয়-ভয় করে ঠিকই, তবে পরে যখন দেখা যায় অন্যেরা ভয় করে না তখন নিজেরও কিছুটা সাহস বাড়ে। ওখানে ভাই নানারকম জিনিসের ছড়াছড়ি। গেলে নিজেই দেখতে পাবি। কেবল একটাই খারাপ — কালাজ্বর। তার কারণ হল চারদিকে জলা, পচা-নোংরা, তায় আবার বেজায় গরম। ওখানকার লোকজনের কাছে কিছু না, তাদের ওতে আসে-যায় না, কিন্তু বাইরে থেকে যে আসে তার অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়ায়। সে যাক গে সেরিওজা, বকবক করে আর কাজ নেই। গেটটার ভেতরে ঢুকে পড় দেখি। এই বাগানবাড়িটাতে খুব ভালো ভদ্দরলোকেরা থাকে। আমার সব জানা আছে — তুই আমাকে জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ না!'

কিন্তু দিনটা তাদের খারাপ গেল। কোন জায়গায় দূর থেকে ওদের দেখামাত্রই খেদিয়ে দিল, কোথাও ভাঙা ভাঙা নাকি সুরে বাজনা শুরু হতেই লোকে বিরক্তি ও অধৈর্যের সঙ্গে ব্যালকনি থেকে হাত নাড়িয়ে ওদের মানা করে দিল, কোথাও বা চাকর জানাল, 'বাবুরা এখনও এসে পৌঁছন নি।' দুটো বাগানবাড়িতে অবশ্য খেলা দেখানোর জন্য ওদের দক্ষিণা দিল, কিন্তু খুবই সামান্য। তবে অল্প দক্ষিণায় দাদুর কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। বাড়ির বেড়া পেরিয়ে রাস্তায় আসতে আসতে পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে সে পকেটে তামার পয়সাগুলো ঝনঝন করে বাজাত আর খোশমেজাজে বলত:

'দুই আর পাঁচ — একুনে সাত কোপেক... তা সেরিওজা ভায়া, পয়সা ত বটে। সাত সাতকে — বুঝলি কিনা, হয়ে যাচ্ছে আস্ত একটা আধুলি, তার মানে, আমাদের তিনজনারই পেট ভরছে, রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই আমাদের আছে, আর বুড়ো লদিজ্‌কিন দুর্বল বলে এটা ওটা বহু রোগের খাতিরে এক পাত্তর গলায় ঢালতে পারে... ওঃ, বাবুরা এটা বোঝেন না! সিকি দিতে ওনাদের কষ্ট হয়, আর এক আনি দিতে লজ্জা করে... তাই কেটে পড়তে বলে। আরে বাবা, বরং তিনটে কোপেকই দে না... আমি ত আর রাগ করছি না, আমি কিছুই মনে করছি না... রাগ করার কী আছে?'

মোটের ওপর, লদিজ্‌কিন ছিল বিনয়ী স্বভাবের। এমনকি ওকে যখন খেদিয়ে দিত তখনও ও

বিড়বিড় করত না। কিন্তু আজ তারও স্বাভাবিক প্রসন্ন স্থৈর্য টলিয়ে দিয়েছেন ফুলবাগিচায় ঘেরা চমৎকার বাগানবাড়ির কর্ত্রী — সুন্দরী, মোটাসোটা এবং দেখতে বড় ভালোমানুষ গোছের এক মহিলা। তিনি মনোযোগ দিয়ে বাজনা শুনলেন, তার চেয়েও বেশি মন দিয়ে দেখলেন সেরিওজার কসরৎ আর আর্তোর মজার মজার কান্ডকারখানা। এর পর অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেরিওজাকে জিজ্ঞেস করলেন ওর বয়স কত, কী নাম, কসরৎ ও কোথায় শিখল, বুড়ো ওর কে হয়, ওর মা-বাপ কী করত ইত্যাদি। শেষে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

মিনিট দশেক — এমনকি সিকি ঘণ্টাটাকই হবে — তাঁর কোন পাত্তা নেই। সময় যত বেড়ে চলল, অভিনেতাদের মনেও তত বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল অনির্দিষ্ট অথচ প্রলোভনজনক আশা। এমনকি দাদু ঢালের মতো করে সন্তর্পণে হাতের তালু দিয়ে মুখ খানিকটা আড়াল করে ছেলেটার কানে কানে বলল:

'এইবার, সেরিওজা, আমাদের কপাল খুলে গেল। তুই শুধু আমার কথা শুনে যা — আমার, ভাই, সব জানা আছে। হয়ত জামাকাপড় দেবে, নয়ত জুতোটুতো। এটা নিঘ্ঘাত!'

শেষকালে মহিলা ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন। সেরিওজা টুপি পেতে রেখেছিল — ওপর থেকে তিনি সেখানে ছুঁড়ে দিলেন একটা সাদা রঙের পয়সা, পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেলেন। দেখা গেল ওটা একটা পুরনো দু আনি — দুপিঠেই ঘসা, তার ওপর আবার ফুটোফাটা। দাদু ভেবাচেকা খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেটা নিরীক্ষণ করল। পথে বেরিয়ে এসে বাগানবাড়ি ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর চলে এসেছে, তখনও সে পয়সাটা হাতের তালুতে ধরে রেখেছে — যেন ওটাকে ওজন করে দেখছে।

'হুঁ... জবর চালাকি!' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল। 'তা বলা যেতে পারে। আর আমরা, তিনটি বুদ্ধুতে কিনা খেটে গেলাম! তার চেয়ে একটা বোতামও যদি দিত। সেটা অন্তত কোথাও সেলাই করে লাগানো যায়। এই জঞ্জাল নিয়ে আমি কী করব? মহিলা হয়ত ভাবছেন, বুড়ো রাতের বেলায়, মানে চুপিচুপি কাউকে না কাউকে ঠিকই গছিয়ে দেবে। না ঠাকরুন, বড় ভুল করছেন। বুড়ো লদিজ্‌কিন এমন জঘন্য কারবার কখনো করতে যাবে না। হ্যাঁ, ঠিকই! রইল আপনার বহু দামের দু আনি! এই যে!'

এই বলে রাগ করে, সগর্বে সে পয়সাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা ক্ষীণ ঠন্‌ঠন আওয়াজ তুলে সেটি পথের সাদা ধুলোবালির নিচে চাপা পড়ে গেল।

এই ভাবে বুড়ো, ছেলেটা আর কুকুরটা হাওয়া বদলকারীদের গোটা পাড়া ঘুরে এবারে সমুদ্রের দিকে নামার জন্য তৈরী হল। বাঁ দিকে রয়ে গেছে আরও একটি বাগানবাড়ি — ঐটাই শেষ। উঁচু সাদা দেয়াল এবং ওপাশ থেকে কালচে-ধূসর রঙের তকলির মতো দেখতে ধুলোমাখা লম্বা লম্বা সরু সরু সাইপ্রেস গাছের ঘন সারি তার ওপরে মাথা উঁচিয়ে থাকায় ওটাকে দেখা যাচ্ছিল না। প্রশস্ত লোহার ফটকের গায়ে অপূর্ব খোদাইকাজকে দেখাচ্ছিল অনেকটা লেসের মতো।

একমাত্র ঐ ফটকের ভেতর দিয়েই চোখে পড়ে এক কোনায় তাজা ঘাসের লন — ঠিক যেন উজ্জ্বল সবুজ রঙের রেশম; গোল গোল ফুলের কেয়ারি, আর দূরে, পেছন দিকে — আগাগোড়া ঘন আঙুর লতায় জড়ানো, ঢাকা, টানা এক বীথী। লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মালি লম্বা পাইপ থেকে গোলাপ গাছে জল দিচ্ছিল। সে তার আঙুল দিয়ে পাইপের মুখ সামান্য বন্ধ করতে অসংখ্য ছাঁটের ফোয়ারায় সূর্যের আলো পড়ে তাতে রামধনুর সাতরঙ খেলতে লাগল।

দাদু আর একটু হলেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল! কিন্তু গেটের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে হকচকিয়ে থেমে গেল।

'একটু দাঁড়া দেখি, সেরিওজা,' সে সেরিওজাকে ডেকে বলল। 'ওখানে লোকজনের কোন নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে? বোঝ কান্ড! কত বছর এখানে হাঁটাহাঁটি করছি — কখনও জনমনিষ্যি দেখতে পেলাম না। চল, সেরিওজা ভায়া, সেঁধিয়ে পড়!'

যে দুটো থামের ওপর তোরণটি খাড়া, তাদের একটিতে চমৎকার খোদাই করা লেখা চোখে পড়তে সেরিওজা পড়ল: ''বান্ধব পুরী', অনধিকার প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ।'

'বান্ধব?..' নিরক্ষর দাদু আওড়াল। 'এই ত চাই! বান্ধব — এই হল গিয়ে খাঁটি কথা। সারাটা দিন আমরা নাজেহাল হয়েছি, এবারে আর দেখতে হচ্ছে না। আমি শিকারী কুকুরের মতো নাক দিয়ে এটা টের পাচ্ছি। আর্তো, বাবা কুত্তার বাচ্চা! সাহস করে সেঁধিয়ে পড় রে সেরিওজা। আমার সব জানা আছে রে — তুই আমাকে সব সময় জিজ্ঞেস করে নিবি।'

৩

বাগানের ভেতরের পথে সমান মাপের বড় বড় কাঁকর বিছানো, সেগুলো পায়ের নিচে কড়কড় আওয়াজ তোলে। পথের দুপাশে সারি বেঁধে বড় বড় গোলাপী ঝিনুক পোঁতা। বিচিত্রবর্ণের ঘাস আর লতাপাতার গালিচার ওপরে, কেয়ারিতে মাথা উঁচিয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের চমৎকার চমৎকার ফুল। সে সব ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। জলাশয়ে কলকল শব্দে ছিটকে পড়ছে টলটলে জল; এক গাছ থেকে আরেক গাছের মাঝখানে শূন্যে ঝুলছে সুন্দর সুন্দর ফুলদানি — ফুলদানি থেকে মালার মতো নিচে নেমে গেছে ঢেউ খেলানো লতা, আর বাড়ির সামনে, মর্মর পাথরের থামের ওপর — আয়নার কাচ বসানো দুটি চকচকে গোলক। সেখানে ভ্রাম্যমাণ দলটির ছায়া পড়েছে উলটো করে, বাঁকা আর লম্বাটে হওয়ায় তাদের দেখাচ্ছে হাস্যকর।

ব্যালকনির সামনে ছিল লোকের পায়ে পায়ে মাড়ানো এক বড় চত্বর। সেরিওজা তার ওপর নিজের সতরঞ্চি বিছালো, এদিকে দাদু কলের বাজনাটাকে স্ট্যান্ডের ওপর খাড়া করে হাতল ঘুরাতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল এক অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত দৃশ্য।

কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে ভেতরের ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বোমার মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো আট-দশ বছর বয়সের একটি ছেলে। তার পরনে হালকা ধরনের জাহাজী পোশাক —

হাত কাটা জামা আর হাফপ্যান্ট। থাকে থাকে কোঁকড়ানো তার ছাইরঙা চুলের রাশি অযত্নে কাঁধের ওপর এলোমেলো হয়ে আছে। ছেলেটির পেছন পেছন ছুটে বেরিয়ে এলো আরও ছয়জন লোক — অ্যাপ্রন ঝুলিয়ে দুই মহিলা; দাড়িগোঁফ ছাড়া, অথচ দুপাশে পাকধরা লম্বা জুলপিধারী, মোটাসোটা বুড়ো চাপরাসী — যার গায়ে ছিল টেইল কোট; চেককাটা নীল পোশাক পরনে, কটাচুলো এক শুঁটকো মেয়ে — তার নাকটা আবার লাল; রুগ্ন চেহারার, অথচ অপূর্ব সুন্দরী একজন অল্পবয়সী মহিলা — গায়ে তার লেস দেওয়া নীল ঘরোয়া কোট এবং অবশেষে, মোটাসোটা, টাকমাথা এক ভদ্রলোক — তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছিল তসরের স্যুট, চোখে সোনার চশমা। ওরা সকলেই ভয়ানক উদ্বিগ্ন, হাত নাড়াচ্ছিল, চেঁচিয়ে কথা বলছিল, এমনকি একে অন্যকে ঠেলাঠেলি করছিল। দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে তাদের অস্থিরতার কারণ হল জাহাজী পোশাক পরা ছেলেটি, যে এমন অতর্কিতে বারান্দায় ছিটকে এসে পড়েছে।

এই হুড়োহুড়ির জন্য যে দায়ী সে কিন্তু মুহূর্তের তরেও তার নাকি কান্না না থামিয়ে ছুটতে ছুটতে দড়াম করে উপুড় হয়ে পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল, চট করে গড়িয়ে চিত্ হয়ে পড়ল এবং ভয়ংকর খেপে গিয়ে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল। বড়রা তার চারপাশে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। টেইল কোট পরা বুড়ো চাপরাসী প্রার্থনার ভঙ্গিতে কলপ দেওয়া কড়কড়ে শার্টের ওপর দু হাত চেপে ধরল, লম্বা জুল্‌পিজোড়া নাড়িয়ে করুণ স্বরে বলল:

'ও ছোটকর্ত্তা!.. নিকোলাই আপল্লোনভিচ্!.. দয়া করে মার্মণিকে দুখ্যু দেবেন না — উঠে পড়ুন। লক্ষ্মীটি, খেয়ে ফেলুন দেখি। মিক্‌চারটা দারুণ মিষ্টি, কেবল ছিরাপ। উঠে পড়ুন দয়া করে...'

অ্যাপ্রন পরা মহিলাদুজন হাত নাড়িয়ে অনুগত দাসীদের মতো ভয়ার্তস্বরে দ্রুত কলবল করে চলছিল। লাল নাকের মেয়েটি করুণ ভাবভঙ্গি করে চেঁচিয়ে গুরুগম্ভীর কিছু একটা বলছিল, কিন্তু বলছিল সম্ভবত বিদেশী ভাষায়, তাই একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না। সোনার চশমাধারী ভদ্রলোকটি বিচক্ষণের ভঙ্গিতে সুর খাদে নামিয়ে ছেলেটাকে বুঝিয়ে চলছিলেন — সে সময় তিনি একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে ঘাড় বাঁকাচ্ছিলেন, হতাশ হয়ে গম্ভীরভাবে দুহাত ছড়াচ্ছিলেন। আর সুন্দরী ভদ্রমহিলাটি সূক্ষ্ম লেসের রুমাল চোখের ওপর চেপে ধরে অবসন্ন হয়ে কাতরাচ্ছিলেন:

'ওঃ ত্রিল্লি, ওঃ, হা ভগবান!.. লক্ষ্মীটি আমার, তোর পায়ে পড়ি। শুনছিস, মার্মণি তোর পায়ে পড়ছে। খা না বাবা, ওষুধটা খেয়ে নে; দেখবি সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাবি — পেট ব্যথা সেরে যাবে, মাথা ব্যথাও। সোনা আমার, আমার কথাটা শোনই না! ত্রিল্লি, তুই যদি বলিস, মার্মণি তোর পায়ে পড়বে। এই দ্যাখ, আমি তোর পায়ে পড়ছি। যদি চাস, তোকে একটা মোহর উপহার দেব। দুটো মোহর? পাঁচটা মোহর — কী বলিস, ত্রিল্লি? জ্যান্ত গাধার বাচ্চা চাস? নাকি জ্যান্ত ঘোড়ার বাচ্চা?.. ডাক্তার, ওকে কিছু বলুন না!'

'শুনুন, ত্রিল্লি, ছেলেমানুষী করবেন না,' চশমা চোখে ভদ্রলোকটি গাঁকগাঁক করে উঠলেন।

'অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!..' ব্যালকনিতে এঁকেবেঁকে ছটফট করার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ার মতো লাথি ছঁড়তে ছঁড়তে ছেলেটা কাঁদতে লাগল।

যে সব লোক তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নিজের এই চরম অশান্ত অবস্থা সত্ত্বেও ও কিন্তু জুতোর হিল্ দিয়ে তাদের পেটে ও পায়ে ঘা মারার রীতিমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। লোকজনকে দস্তুরমতো কায়দা করে তা এড়াতে হচ্ছিল।

সেরিওজা অবাক হয়ে, কৌতূহলভরে অনেকক্ষণ এই দৃশ্যটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর বুড়োর পাঁজরায় মৃদু ঠেলা দিল।

'লদিজ্‌কিন দাদু, এর ব্যাপারটা কী?' সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। 'ওকে মেরে সুজুত করবে নাকি?'

'এই ত নমুনা... অমন ছেলে উল্‌টে অন্যদেরই শায়েস্তা করে দেবে। স্রেফ-আদুরে ছেলে। মনে হয় অসুস্থ।'

'পাগল-টাগল নাকি?' সেরিওজা আন্দাজে বলল।

'আমি তার কী জানি? চুপ্!..'

'অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! রাবিশ! ইস্টুপিড!..' ছেলেটা জোরে, আরও জোরে গলা ফাটাল।

'শুরু কর রে, সেরিওজা। ও আমার জানা আছে!' লদিজ্‌কিন হঠাৎ হুকুম দিল, সে চোখেমুখে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অর্গ্যানের হাতল ঘুরাল।

বাগানের ওপর দিয়ে বয়ে চলল প্রাচীন গ্যালপ নাচের নাকি নাকি, ভাঙা ভাঙা বিকৃত সুর। ব্যালকনিতে যারা যারা ছিল তারা সকলে সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল, এমনকি ছেলেটাও কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল।

'ওঃ, হা ভগবান, ওরা বেচারি ত্রিল্লিকে আরও বিগড়ে দেবে!' নীল ঘরোয়া কোট পরা ভদ্রমহিলাটি কাঁদো কাঁদো স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। 'আঃ, ওদের বিদেয় কর, শিগ্‌গির বিদেয় কর বলছি! আর ওদের সঙ্গের এই নোংরা কুকুরটা। কুকুরদের সব সময়ই যাচ্ছেতাই অসুখবিসুখ থাকে। মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে কেন, ইভান?'

চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ আর বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে তিনি অভিনেতাদের উদ্দেশে রুমাল নাড়লেন, লাল নাকওয়ালা শুঁটকো মেয়েটি চোখ পাকাল। কে যেন হিস হিস আওয়াজ করে ভয় দেখাল... টেইল কোট গায়ে লোকটি তড়বড় করে আলতোভাবে ব্যালকনি থেকে গড়িয়ে নামল এবং চোখেমুখে আতঙ্কের ভাব নিয়ে দুহাত দুদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে বাজনাদারের দিকে ছুটে গেল।

'এ কী অসভ্যতা, অ্যাঁ!' ভয়ে-ভয়ে, সেই সঙ্গে কর্তৃত্ব ফলিয়ে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় সে বলল। 'কার হুকুমে, শুনি? কে ঢুকতে দিয়েছে? ভাগ বলছি! এক্ষুনি!..'

অর্গ্যানটা মনমরা হয়ে প্যাঁ প্যাঁ আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

'বাবুর দয়া হোক, অনুমতি হয় ত বলি...' দাদু ভদ্রভাবে বলতে গেল।

'কোন কথা নয়! ভাগ!' টেইল কোট গায়ে লোকটি চিৎকার করে বলল, তার গলাটা কেমন যেন সাঁইসাঁই করে উঠল।

তার থলথলে মুখ মুহূর্তে লাল টকটকে হয়ে গেল, চোখদুটো অসম্ভব রকম বিস্ফারিত হল, যেন হঠাৎ ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে — আর চাকার মতো বনবন করে ঘুরতে লাগল। ব্যাপারটা এমনই ভয়াবহ, যে দাদু দুপা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল।

'চল রে সেরিওজা,' যন্ত্রটা তাড়াতাড়ি ঝটকা মেরে পিঠে তুলে নিয়ে সে বলল। 'যাওয়া যাক!'

কিন্তু ওরা দশ পা এগিয়ে গেছে কি না গেছে, এমন সময় ব্যালকনি থেকে ভেসে এলো নতুন করে কান-ফাটানো চিৎকার:

'অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! আমাকে! চা-ই-ই! আঁ-আঁ-আঁ! দা-ও! ডাক! আমাকে!'

'অমন করে না, ত্রিল্লি!.. হা ভগবান, ত্রিল্লি! ওঃ, ওদের ফিরিয়ে আন গো তোমরা,' নার্ভাস ভদ্রমহিলাটি আর্তস্বরে বললেন। 'উঃ, কী গোমুখ্যু সব জুটেছে! ইভান, কী বলা হল, কানে ঢুকছে? এক্ষুনি ঐ ভিখিরিদের ডেকে আনুন!'

'এই শোন! এই যে, তোমাদের বলা হচ্ছে! কী বলা হয় যেন তোমাদের? — বাজনাদার! ফিরে এসো তোমরা!' ব্যালকনি থেকে কয়েকজন সমস্বরে হাঁক দিল।

অভিনেতারা চলে যাচ্ছে দেখে মোটাসোটা চেহারার চাপরাসীটি দুপাশের উড়ু উড়ু জুলপি নিয়ে, বড় রবারের বলের মতো লাফাতে লাফাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন পেছন ছুটল।

'দাঁড়াও! ওহে বাজনাদার! শুনছ! ফের!.. ফের!..' হাঁসফাঁস করতে করতে দুহাত নাড়াতে নাড়াতে সে বলল। 'ওগো দা' ঠাকুর,' শেষ পর্যন্ত দাদুর আস্তিন চেপে ধরল, 'যন্তরের মুখ ঘুরাও! ওঁরা তোমাদের খেলা দেখবেন। চটপট্!..'

'হুঁ-হুঁ, বটে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদু মাথা নাড়ল; অবশ্য ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল, কলের বাজনাটা পিঠ থেকে নামিয়ে নিজের সামনে স্ট্যান্ড দাঁড় করিয়ে তার ওপর এঁটে বসাল এবং এইমাত্র যে জায়গায় গ্যালপ্ থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে বাজনা শুরু করল।

ব্যালকনির চাঞ্চল্য থেমে গেল। ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রমহিলা আর সোনার চশমা-নাকে ভদ্রলোকটি রেলিংয়ের একেবারে ধার ঘেঁষে চলে এলেন। বাদবাকিরা শ্রদ্ধাভরে পেছনে রয়ে গেল। বাগানের ভেতর থেকে অ্যাপ্রন আঁটা মালী দাদুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এসে মালীর পেছনে জায়গা নিল দারোয়ান। দারোয়ান লোকটি বিশাল চেহারার, দাড়িওয়ালা। তার কপাল ছোট, মুখ গোমড়া, বসন্তের দাগে ভর্তি। লোকটার গায়ে ছিল গোলাপী রঙের নতুন জামা — জামায় তেরছা সারি বেঁধে চলেছে কালো রঙের বড় বড় বুটি।

গ্যালপের ভাঙা ভাঙা, হেঁচকি তোলা আওয়াজের তালে তালে সেরিওজা মাটিতে সতরঞ্চি পাতল, চটপট পা গলিয়ে ক্যাম্বিশ কাপড়ের প্যাণ্টলুন খুলে ফেলে দিল (প্যাণ্টলুনটি ছিল পুরনো বস্তা থেকে তৈরী, পেছনে — সবচেয়ে চওড়া জায়গা জুড়ে চৌকো আকারে শোভাবর্ধন করে ছিল কারখানার আঠা), গা থেকে খুলে ফেলল পুরনো কোর্তা। এখন তার পরনে সুতীর

পুরনো জাঙ্গিয়া। অসংখ্য তালিমারা হওয়া সত্ত্বেও জাঙ্গিয়াটি তার ক্ষীণ অথচ শক্তিশালী ও নমনীয় আকৃতিকে চমৎকার আঁকড়ে ধরে রেখেছে। বড়দের অনুকরণ করতে করতে ইতিমধ্যেই খাঁটি বাজিকরের কায়দাকানুন তার রপ্ত হয়ে গেছে। সতরঞ্চির দিকে ছুটতে ছুটতে সে দুহাত ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল, তারপর থিয়েটারী কায়দায় হাত অনেক দূর ছড়িয়ে দিয়ে দুপাশে নাড়াল — যেন দর্শকদের উদ্দেশে সোৎসাহে দুটি চুমু ছুঁড়ে দিল।

দাদু এক হাতে অনবরত অর্গ্যানের হাতল ঘুরিয়ে সেখান থেকে ঝনঝনে, কাশিওঠা সুর বার করে চলছিল, আর অন্য হাতে ছেলেটির দিকে নানারকম জিনিস ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সেরিওজা ছুটন্ত অবস্থায় কৌশলে সেগুলো ধরে ফেলছিল। তার অনুষ্ঠানসূচি ছিল ছোট, কিন্তু সে খেলা দেখাল ভালো, বাজিকররা যাকে বলে 'নিখুঁত' খেলা, দেখাল উৎসাহের সঙ্গে। সে খালি বীয়ারের বোতল এমনভাবে ওপরে ছুঁড়ল যে তা বার কয়েক শূন্যে পাক খেল; সেই অবস্থায় হঠাৎ প্লেটের কানা এগিয়ে দিয়ে বোতলের মুখ ধরে ফেলে সে কয়েক মুহূর্ত ভারসাম্য রক্ষা করে তাকে ধরে রাখল; লোফালুফির কায়দা দেখাল চারটি হাড়ের বল আর দুটি মোমবাতি নিয়ে — মোমবাতি দুটোকে একই সঙ্গে বাতিদানে লুফে নিল; তারপর খেলা দেখাল এক বারে পাখা, কাঠের সিগার আর ছাতা — এই রকম ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জিনিস নিয়ে। সবগুলোই মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে উড়তে লাগল, তারপর হঠাৎই ছাতা চলে এলো মাথার ওপরে, সিগার — মুখে আর পাখাটা ছলাকলার ভঙ্গিতে মুখের সামনে দুলতে লাগল। সবশেষে সেরিওজা নিজে সতরঞ্চির ওপর কয়েক পাক ডিগবাজী খেল, 'ব্যাঙ' হল, 'মার্কিন ফাঁস' দেখাল, হাতের ওপর ভর দিয়ে হাঁটল। নিজের সমস্ত রকম কলাকৌশলের পুঁজি নিঃশেষ করে ফেলার পর সে আবার দর্শকদের উদ্দেশে দুটি চুমু ছুঁড়ে দিল এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দাদুর দিকে এগিয়ে গেল তার বদলে বাজনাটা ধরার জন্য।

এবারে আর্তোর পালা। কুকুরটা তা ভালোভাবেই জানত; অনেক আগে থাকতে — দাদু যখন কাত হয়ে অর্গ্যানের স্ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে এলো — তখন থেকেই সে উত্তেজনায় তার চার পায়ে দাদুর ওপর লাফিয়ে পড়ছিল আর অধৈর্যের সঙ্গে থমকে থমকে তার উদ্দেশে ঘেউঘেউ করে চলছিল। কে জানে, হয়ত বা বুদ্ধিমান পুড্‌ল কুকুরটি এই ভাবে বলতে চাইছিল যে ছায়াতেই যখন থার্মোমিটারের পারা বাইশ ডিগ্রীতে উঠেছে, তখন তার মতে, শারীরিক কসরৎ দেখানোর কোন মানে হয় না? কিন্তু লদিজ্‌কিন দাদু ধূর্তের ভঙ্গিতে পিঠের ওপাশ থেকে লিকলিকে বেতের চাবুক বার করল। 'আগেই জানতাম!' শেষবারের মতো আর্তো ঘেউঘেউ করে আক্ষেপ প্রকাশ করল, তারপর পিটপিটে চোখজোড়া প্রভুর কাছ থেকে সরিয়ে না নিয়ে অবাধ্যের মতো, আলস্যভরে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাক, আর্তো! এই, এই, এই...' পুড্‌ল কুকুরের মাথার ওপর চাবুক ধরে বুড়ো বলল। 'ঘোর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘোর... আরও, আরও... নাচ্‌রে কুকুর, নাচ্!.. বসে পড়! কী-ই-ই? বসতে চাস্ না? বসে পড় বলছি। এ-ই... এই ত চাই! এবারে খেয়াল রাখিস কিন্তু,

যাঁরা খেলা দেখছেন ওঁদের সেলাম জানিয়ে কিছু বলবি! বল, আর্তো!' লদিজ্কিন গলা চড়িয়ে হুমকি দিল।

'ঘেউ!' পুড্ল বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠে গর্জন করল। তারপর প্রভুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল, আরও দুবার যোগ করল, 'ঘেউ, ঘেউ!'

'না, বুড়ো আমাকে বোঝে না!' এই বিক্ষুব্ধ ডাকের মধ্যে যেন শোনা গেল।

'হ্যাঁ, এ-ই — এই ত চাই! ভদ্রতা হল সব কিছুর ওপরে। আচ্ছা, এবারে খানিকটা লাফঝাঁপ করা যাক,' মাটির সামান্য ওপরে চাবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বুড়ো বলে চলল। 'হুপ্! জিভ বার করে কাজ নেই, ভাই। হুপ্!.. হাপ্! খাসা! দেখি আরেকবার, আউর এক দফে! হুপ্! হাপ্! হুপ্! চমৎকার, ওরে আমার কুকুরটি। বাড়ি গিয়ে তোকে গাজর দেব। ও, তুই গাজর খাস না বুঝি? আমি আবার বিলকুল ভুলে বসে আছি। তাহলে আমার বাহারে টুপিটা ধর, ভদ্দরলোকদের সামনে পাত। ওনারা হয়ত দয়া করে তোকে মুখরোচক কিছু খেতে দেবেন।'

কুকুরটাকে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে বুড়ো তার মুখে গুঁজে দিল নিজের পুরনো, তেলচিটে ক্যাপ, যাকে সে সূক্ষ্ম রসিকতাবশত 'বাহারে টুপি' বলে উল্লেখ করে। ক্যাপ দাঁতে চেপে ধরে, আধাবসা গোছের অবস্থায় ঢং করে পায়ে পায়ে আর্তো বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। রুগ্ন ভদ্রমহিলার হাতে ঝিনুকের ছোট্ট মনিব্যাগ দেখা দিয়েছে। চারপাশের সকলে সহানুভূতির হাসি হাসল।

'কী রে? বলেছিলাম না তোকে?' সেরিওজার দিকে ঝুঁকে পড়ে দাদু মহা উৎসাহে ফিসফিসিয়ে বলল। 'আমার সব জানা আছে রে ভাই — তুই আমাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি। রুবলের কম মোটেই নয়।'

এই সময় বারান্দা থেকে এমন মরিয়া, কর্কশ — বলতে গেলে অমানুষিক — এক আর্তনাদ শোনা গেল যে আর্তো ভেবাচেকা খেয়ে মুখ থেকে টুপি ফেলে দিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লেজ গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে, ছুটে তার প্রভুর পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল।

'চা-ই-ই!' কোঁকড়া চুলওয়ালা ছেলেটি পা ঠুকতে ঠুকতে গলা ফাটিয়ে চলল। 'আমাকে দাও! চাই! কু-কু-র! ত্রিল্লি কু-কু-র চায়...'

'ওঃ, হা ভগবান! ওঃ! নিকোলাই আপল্লোনিচ্!.. ও ছোটকত্তা!.. স্থির হ ত্রিল্লি, তোর পায়ে পড়ি!' ব্যালকনিতে আবার লোকজনের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

'কুকুর! কুকুর দাও! চাই! রাবিশ, পাজি, ইস্টুপিড!' ছেলেটা রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল।

'সোনা আমার, শোন বলছি, অমন মন খারাপ করে না!' নীল ঘরোয়া কোট পরা ভদ্রমহিলাটি অনর্থক বকবক করে ওকে বোঝাতে গেলেন। 'তুই কুকুরটার গায়ে হাত বুলাতে চাস? বেশ ত, ভালো কথা, ভালো কথা, মাণিক আমার, এক্ষুনি। ডাক্তার, আপনি কী মনে করেন, কুকুরটার গায়ে হাত বুলানো ত্রিল্লির উচিত হবে কি?'

'মোটের ওপর বলতে গেলে কি, আমি হলে তেমন পরামর্শ দিতাম না,' বলে তিনি অসহায়ের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়ালেন। 'তবে ভরসা করার মতো জীবাণুনাশক হলে — এই যেমন বোরিক অ্যাসিড কিংবা কার্বলিকের হালকা সলিউশন যদি থাকে — তবে... মোটের ওপর...'

'কুকু-উ-র!'

'এক্ষুনি, লক্ষ্মীটি আমার, এক্ষুনি। তাহলে, ডাক্তার, আমরা ওটাকে বোরিক অ্যাসিড দিয়ে ধোয়ার হুকুম দিচ্ছি, তাহলে ত... আঃ, ত্রিল্লি, অমন ছটফট করে না! দয়া করে আপনার কুকুরটা এদিকে নিয়ে আসুন, দা' ঠাকুর। ভয়ের কিছু নেই, আপনাকে দাম দেওয়া হবে। শুনুন, আপনাদের এটার কোন অসুখবিসুখ নেই ত? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ও ক্ষ্যাপা নয় ত? কিংবা এমনও ত হতে পারে যে ওর এঁটুলি আছে?'

'হাত বুলোতে চাই না, চাই না!' নাকমুখ দিয়ে বুড়বুড়ি ছাড়তে ছাড়তে ত্রিল্লি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। 'একদম নিতে চাই। ইস্টুপিড, পাজি! একদম চাই! আমি নিজে খেলতে চাই। সবসময় আমার কাছে থাকবে!'

'শুনুন, দা' ঠাকুর, এদিকে এগিয়ে আসুন,' ছেলের গলা ছাপিয়ে চেঁচানোর চেষ্টা করলেন ভদ্রমহিলা। 'আঃ, ত্রিল্লি, চিৎকারের জ্বালায় তুই মা'কে মেরে ফেলবি দেখছি। মিছিমিছি কেন যে এই বাজনাদারগুলোকে ঢুকতে দেওয়া হল!.. আরে, কাছে এগিয়ে আসুন না, আরও কাছে... আরও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে বলা হচ্ছে!.. হ্যাঁ, এই ত... আঃ, দুঃখ করার কিছু নেই, ত্রিল্লি, তুই যা চাস, মা তা-ই করবে। দোহাই তোর। মিস্, বাচ্চাটাকে শেষ অবধি শান্ত করুন না। ডাক্তার, আপনাকে অনুরোধ করছি... কত চাই তোমার, বুড়ো?'

দাদু মাথার টুপি খুলল। তার চোখেমুখে বেচারি-বেচারি বিনীত ভাব ফুটে উঠল।

'দয়া করে যা দেবেন, মা ঠাকরুন। আমরা হলেম গিয়ে তুচ্ছু লোক, যা পাই তাতেই আমাদের মঙ্গল। বুড়োকে ত আর আপনি অপমান করবেন না...'

'আঃ, কী গণ্ডমূর্খ রে বাবা! ত্রিল্লি, তোর গলায় ব্যথা হবে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন, কুকুর — আপনার, আমার নয়। কী হল? কত? দশ? পনেরো? কুড়ি?'

'আঁ-আঁ-আঁ! চাই-ই! দাও কুকুর, কুকুর দাও,' চাপরাসীর গোলগাল পেটে লাথি মারতে মারতে ছেলেটা চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল।

'তার মানে... মাফ করবেন, ঠাকরুন,' লদিজ্কিন আমতা আমতা করে বলল। 'আমি হলেম গিয়ে বুড়ো, বোকা হাবা মানুষ। চট করে বুঝে উঠতে পারি না... তায় আবার কানে একটু খাটো... তার মানে, আপনি কী বললেন এজ্ঞে?.. কুকুরের জন্যে?..'

'উঃ, কী জ্বালা, ভগবান! মনে হয় আপনি ইচ্ছে করে বোকা সাজছেন?' ভদ্রমহিলা জ্বলে উঠলেন। 'আয়া, ত্রিল্লিকে শিগ্‌গির করে জল দিন! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি রুশ ভাষায় — কত দামে আপনার কুকুরটা বেচতে চান? আপনার কুকুর, বুঝতে পারছেন, আপনার কুকুর...'

'কুকুর! কুকু-উর!' ছেলেটি আগের চেয়েও জোরে গলা ফাটাল।

লদিজ্‌কিন ক্ষুণ্ণ হয়ে মাথায় টুপি আঁটল।

'কুকুর নিয়ে ব্যবসা করি না, ঠাকরুন,' শান্তস্বরে, মর্যাদাভরে সে বলল। 'তাছাড়া, এই কুকুরটা, ঠাকরুন, বলতে গেলে আমাদের দুজনকে,' বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পেছনে সেরিওজাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে সে বলল, 'আমাদের দুজনকে খাওয়ায় পরায়। তাই এটা—যাকে বলে বেচা—একেবারেই সম্ভব নয়।'

ত্রিল্লি ইতিমধ্যে স্টীম ইঞ্জিনের হুইসিলের মতো কান-ফাটানো আওয়াজ ছেড়েছে। তাকে গেলাসে করে জল দেওয়া হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তা গভর্নেসের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল।

'আরে শুনুন, দা' ঠাকুর, আপনার মাথার ঠিক নেই!.. এমন কোন জিনিস নেই যা বিক্রি হয় না,' দুহাতের তালু দিয়ে মাথার দুপাশের রগ চেপে ধরে ভদ্রমহিলা জেদ ধরে বললেন। 'মিস্, তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফেলে আমাকে আমার মাথা ধরার ওষুধটা দিন। আপনার কুকুরের দাম বোধহয় তাহলে একশ রুবল? আচ্ছা, দুশ? তিনশ? কী হল? উত্তর দিন। ঠুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে। ডাক্তার, ভগবানের দোহাই, কিছু একটা বলুন ওকে!'

'চল রে সেরিওজা,' বিষণ্ণভাবে বিড়বিড় করে লদিজ্‌কিন বলল। 'ঠুঁ-টো! আর্তো, চলে আয়!..'

'আরে, আরে, দাঁড়াও দেখি, ভালোমানুষের পো,' কর্তৃত্ব ফলিয়ে মোটা গলায় টেনে টেনে বললেন সোনার চশমা-নাকে মোটাসোটা ভদ্রলোকটি। 'তোমাকে বলি কি বাপু, অমন চাল না মারলেই ভালো করতে। দশ রুবল তোমার কুকুরটার পক্ষে যথেষ্ট দাম, আর সেই সঙ্গে ফাও হিশেবে তোমাকে। ওরে গর্দভ, ভেবে দ্যাখ, তোকে কত দেওয়া হচ্ছে!'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বাবু, কেবল...' লদিজ্‌কিন কুঁতিয়ে ঝটকা মেরে বাজনাটা কাঁধের পেছনে তুলে নিয়ে বলল, 'কেবল, ঐ যে বিক্রির কথাটা বললেন না, ও কাজটা কোনমতেই হচ্ছে না। আপনারা বরং কোন জায়গায় অন্য কোন কুকুরের বাচ্চার খোঁজ করুন গে... আপনাদের মঙ্গল হোক... সেরিওজা, সামনে এগো!'

'বলি, তোর পাসপোর্ট আছে কি?' হঠাৎ ভয়ঙ্কর গর্জে উঠলেন ডাক্তার। 'তোদের আমি জানি, রাস্কেল!'

'দারোয়ান! সেমিওন! ওদের ভাগিয়ে দাও।' রাগে চোখমুখ বিকৃত করে ভদ্রমহিলা চেঁচালেন।

গোলাপী রঙের জামা পরা দারোয়ান যমদূতমূর্তি ধারণ করে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। বারান্দায় বহুকণ্ঠের ভয়ঙ্কর সোরগোল উঠল — ত্রিল্লি গলা ছেড়ে গর্জন করছে, তার মা আর্তনাদ করছেন, বড় আয়া আর ছোট আয়া কলবল করে বিলাপ করছে, বাজখাঁই গলায়, ক্রুদ্ধ ভীমরুলের মতো ডাক্তার গোঁ-গোঁ করছেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা দেখার মতো সময় তখন দাদুর আর সেরিওজার ছিল না। বেজায় ভয় খেয়ে পুড্‌ল কুকুরটা আগে আগে চলেছে, তার পেছন পেছন ওরাও প্রায় পড়িমরি করে গেটের দিকে ছুটল। ওদের

পিছু ধাওয়া করে চলছিল দারোয়ান, পেছন থেকে অর্গ্যানের গায়ে গুঁতো মারতে মারতে সে ধমক দিয়ে বলছিল:

'এখানে ঘুরঘুর করে বেড়ান হচ্ছে, লোফার কোথাকার! ঘাড়ে যে উত্তম-মধ্যম কিছু পড়ে নি তার জন্যে বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দে, বুড়ো ঘাটের মড়া। জেনে রাখিস, এর পরের বার এলে তোকে নিয়ে আর কোন লাজলজ্জা করব না, ঘাড়ে রদ্দা দিয়ে হিড়হিড় করে দারোগাবাবুর কাছে টেনে নিয়ে যাব। পাজি, নচ্ছার!'

বহুক্ষণ বুড়ো আর ছেলেটি চুপচাপ চলল, তারপর হঠাৎ — যেন প্রতিশ্রুতিমতো — ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জোরে হেসে উঠল: প্রথমে হো হো করে হাসতে লাগল সেরিওজা, তারপর তার দিকে তাকিয়ে লদিজ্‌কিনও হেসে ফেলল — তবে খানিকটা বিমূঢ় হয়ে।

'কী হল, লদিজ্‌কিন দাদু? তুমি সব জান, না?' মজা করে ওকে খোঁচা দিল সেরিওজা।

'হ্যাঁ রে ভাই, আমাদের ভুল হয়ে গেছে,' বুড়ো মাথা নাড়াল। 'ছেলেটা একটা চিজ বটে! কী করে যে এমন বানাল তা কে জানে? বোঝ কাণ্ডটা! পঁচিশ জন লোক তার চারধারে চরকির মতো নাচছে। আমার হাতে পড়লে বাছাধন টের পেত। বলে কিনা কুকুর দাও? এ কেমন ধারা? ও ত আকাশের চাঁদও চাইতে পারে, তাহলে চাঁদও এনে দাও? এদিকে আয় আর্তো, আয় রে আমার কুকুরছানা। ওঃ, আজকে একটা দিন গেল বটে। আশ্চয্যি!'

'এর চেয়ে ভালো আর হয় না!' সেরিওজা টিপ্পনি কাটতে ছাড়ল না। 'এক ভদ্রমহিলা একটা জামা দিলেন, আরেকজন — আস্ত একটা রুবল। তুমি, লদিজ্‌কিন দাদু, সবই আগে থাকতে জান।'

'আরে তুই চুপ কর দেখি, বিচ্ছু,' মুখ ঝামটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর সুরে প্রকাশ পাচ্ছিল ভালোমানুষি ভাব। 'দারোয়ানের হাত থেকে কেমন পিট্‌টান দিয়েছিলি মনে আছে? আমি ত ভাবলাম তোর নাগালই বুঝি আর পাব না। ভারিক্কি লোক বটে—এই দারোয়ানটা।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে ভবঘুরে দলটি ভুসভুসে মাটিতে ভর্তি খাড়া পায়ে-চলা-পথ ধরে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল। এখানে পাহাড় কিছুটা পেছনে সরে গিয়ে একফালি সমতল প্রদেশের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। জায়গাটা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে মসৃণ, সমান আকারের নুড়িপাথরে ঢাকা। এখন শান্ত মর্মরধ্বনি তুলে সমুদ্র সোহাগভরে আছড়ে পড়ছে। পাড় থেকে কয়েকশ মিটার দূরে জলের মধ্যে ডিগবাজী খাচ্ছে ডলফিন — সেখান থেকে পলকের জন্য চোখে পড়ছে তাদের তেলতেলে, গোলগাল পিঠ। দূর দিগন্তে — যেখানে সমুদ্রের নীল সাটিনে লেগেছে গাঢ় নীল মখমলি পাড়—সেখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বহু জেলেডিঙির ছিমছাম পাল। সূর্যের আভায় তাদের দেখাচ্ছিল সামান্য গোলাপী।

'এখানেই চান করা যাবে, লদিজ্‌কিন দাদু,' সেরিওজা তার সঙ্কল্প জানাল। ইতিমধ্যেই চলতে চলতে এপায়ে ওপায়ে লাফ দিয়ে সে তার প্যাণ্টলুন খুলে ফেলেছে। 'দাও, আমি তোমার ঘাড় থেকে অর্গ্যানটা নামাই।'

সে চটপট জামাকাপড় খুলে ফেলল, রোদে পোড়া চকোলেট রঙের উলঙ্গ শরীরে সশব্দে চাপড় মেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার চারদিকে উঠল উচ্ছ্বসিত ফেনার পুঞ্জ।

দাদু জামাকাপড় খুলল ধীরেসুস্থে। হাতের তালু দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে সে সস্নেহে হেসে সেরিওজার দিকে তাকাল।

'ছোকরা দিব্যি বেড়ে উঠছে,' লদিজ্‌কিন মনে মনে ভাবল, 'হাড় বার করা ঠিকই — ঐ ত পাঁজরার সবগুলো হাড় দেখা যাচ্ছে — তবু ছোকরা শক্তসমর্থই হবে।'

'এই সেরিওজা! বেশি দূরে সাঁতার কাটিস নে। সমুদ্রের জন্তু-টন্তু টেনে নিয়ে যাবে।'

'আমি তাহলে ওর লেজ চেপে ধরব!' দূর থেকে সেরিওজা চেঁচিয়ে বলল।

দাদু দুই বগলের তলায় হাত বুলাতে বুলাতে অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে রইল। জলে সে নামল খুব সন্তর্পণে, ডুব দেওয়ার আগে আচ্ছা করে টেকো মাথার লাল চাঁদি আর কোটরে বসা দুটি পাশ জলে ভেজাল। শরীর তার দুর্বল, চামড়া ঝুলে পড়েছে, হলদেটে, পাদুটো — আশ্চর্যরকমের সরু, পিঠের দুপাশে বেরিয়ে আছে কাঁধের দুটি হাড়, আর বহু বছর অর্গ্যান বয়ে বেড়ানোর ফলে পিঠটা হয়ে গেছে কুঁজো।

'লদিজ্‌কিন দাদু, এই দেখ!' সেরিওজা হাঁক দিল।

সে পাদুটো মাথার পেছন দিকে তুলে দিয়ে জলের ভেতরে ডিগবাজী খেল। দাদু ততক্ষণে জলে কোমর অবধি নেমেছে, আরামের ককানি তুলে জলের মধ্যে আলগোছে বসার ভঙ্গিতে হাঁটুজোড়া ভেঙেছে। সেরিওজার কান্ড দেখে সে উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচাল:

'হয়েছে, আর শয়তানি করতে হবে না তোকে, বাঁদর। দাঁড়া! তবে রে!'

আর্তো বেজায় রেগে গিয়ে ঘেউঘেউ করে পাড়ে লাফালাফি করছিল। ছেলেটা যে অত দূরে সাঁতরে চলে গেছে তার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। উত্তেজিত পুড্‌লের ভাবটা এই যে 'নিজের সাহস দেখিয়ে কাজ কী? মাটি আছে — সেখানে হাঁটাহাঁটি কর না বাপু। অনেক বেশি নিশ্চিন্ত।'

সে নিজেই পেট অবধি জলে নেমে গিয়েছিল প্রায়, দু-তিনবার জিভ দিয়ে জল চাটল। কিন্তু নোনা জল তার পছন্দ হল না, আর তীরের কাছাকাছি কাঁকরের ওপর হালকা ঢেউয়ের সরসর আওয়াজ তাকে ভয় পাইয়ে দিল। সে লাফিয়ে পাড়ে উঠে এলো, সেরিওজার উদ্দেশে ঘেউঘেউ শুরু করে দিল। 'এসব আজেবাজে ভেল্‌কিতে কী কাজ? পাড়ের কাছে বুড়োর সঙ্গে বসে থাকলেই ত হত। ওঃ, এই ছেলেটাকে নিয়ে অশান্তির আর শেষ নেই!'

'অ্যাই, সেরিওজা, উঠে আসবি কিনা শুনি। খুব হয়েছে, আর নয়।' বুড়ো ডাক দিল।

'এক্ষুনি, লদিজ্‌কিন দাদু, ইস্টিমার হয়ে সাঁতার কেটে আসছি। ভোঁ-ভোঁ-ও-ও!'

শেষে সে সাঁতার কেটে তীরে এলো, কিন্তু জামাকাপড় পরার আগে আর্তোকে কোলে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফিরে এসে তাকে দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। কুকুর তৎক্ষণাৎ সাঁতরে ফিরতি পথ ধরল — কেবল মুখটা উঁচিয়ে, দুকান জলের ওপর ভাসিয়ে রেখে, রেগে গিয়ে সে জোরে জোরে

নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছিল। লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এসে সে গোটা শরীর ঝাঁকাল, অসংখ্য জলের ছিটে বুড়ো আর সেরিওজার গায়ে এসে লাগল।

'দাঁড়া দেখি, সেরিওজা, এই লোকটা আমাদের কাছে আসছে বলেই মনে হচ্ছে না?' এক দৃষ্টিতে ওপরে, পাহাড়ের দিকে নজর করতে করতে লদিজ্‌কিন বলল।

কালো বুটিদার গোলাপী জামা গায়ে গোমড়ামুখো যে দারোয়ানটি এই পনেরো মিনিট আগে ভ্রাম্যমাণ দলটিকে বাগানবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিল, সেই লোকটাই পায়ে-চলা-পথ ধরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসছিল আর হাত নাড়াতে নাড়াতে চেঁচিয়ে কী যেন বলছিল।

'ওর আবার কী দরকার?' দাদু হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

৪

দারোয়ান আনাড়ির মতো জোর কদমে দৌড়ে নিচে নামতে নামতে চেঁচিয়ে চলল। বাতাসে তার জামার আস্তিন পত্‌পত্‌ করছিল, আর জামার সামনের দিকটা ফুলে উঠেছিল নৌকোর পালের মতো।

'ও-হে!.. একটু দাঁড়াও!..'

'তোর নিকুচি করেছি!' লদিজ্‌কিন রাগে গরগর করে উঠল। 'ব্যাটা এসেছে আবার আর্তোর ব্যাপার নিয়ে।'

'এসো দাদু, ওটাকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দেওয়া যাক!' সেরিওজা বুক ফুলিয়ে বলল।

'ক্ষ্যামা দে রে বাবা। রক্ষে কর ভগবান, বলি এরা কী লোক!..'

'শোন গো তোমরা...' দূর থেকেই হাঁসফাঁস করতে করতে দারোয়ান শুরু করল। 'কুকুরটা বেচবে কি? ছোটকত্তাকে নিয়ে অশান্তির একশেষ। বাছুরের মতো ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছেন—কেবল 'কুকুর দাও আর কুকুর দাও...' ঠাকরুন পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, যত দামই হোক কিনে নিয়ে আয়।'

অন্যের বাগানবাড়িতে লদিজ্‌কিন যেমন বোধ করছিল, এখানে, সমুদ্রের তীরে সে তার চেয়ে অনেক বেশি মনোবল অনুভব করল; তাই হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বলল:

'এটা তোর ঠাকরুনের স্রেফ বোকামি বলতে হয়। তাছাড়া তোর ঐ ঠাকরুন আমার কে হয় শুনি? তোর হয়ত ঠাকরুন, কিন্তু আমার অমন মাখামাখিতে কাজ নেই। তাই, বলি কি, দয়া করে আমাদের রেহাই দে, খ্রীস্টের দোহাই... আর... মোটকথা... আর জ্বালাতন করিস নে বাপু।'

দারোয়ান কিন্তু দমবার পাত্র নয়। সে বুড়োর পাশে পাথরের ওপর বসে পড়ল, আনাড়ির মতো সামনের দিকে আঙুলগুলো নেড়ে বলল:

'আরে, আমার কথাটা বোঝারই চেষ্টা কর না। কী বোকা লোক রে, বাবা...'

'বোকার কাছ থেকেই শুনছি,' দাদু শান্তকণ্ঠে মুখের ওপর জবাব দিল।

'আরে না না... আমি ঠিক তা বলতে চাই নি... এটা অবশ্য ঠিক, কেমন যেন চোরকাঁটার মতন... তুই ভেবে দ্যাখ — কুকুর তোর কাছে এমন একটা জিনিস বল? আরেকটা কুকুরের বাচ্চা খুঁজে পেতে এনে পেছনের দুপায়ে দাঁড়ানো অভ্যেস করালেই হল, ব্যস্ আবার তোর কুকুর হয়ে গেল। কী হল? ঠিক বলছি কিনা? অ্যাঁ?'

দাদু মনোযোগ দিয়ে তার প্যাণ্টের বেল্ট বাঁধছিল। দারোয়ানের নাছোড়বান্দা প্রশ্নের উত্তরে সে নির্বিকার ভাব নিয়ে বলল:

'আরও বকে যা... আমি পরে তোকে একবারে জবাবটা দেব।'

'আর এখানে ভাই রে, একবারে নগদ ট্যাকা!' দারোয়ান উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'দুশ, না হলে তিনশ — একসঙ্গে! আর, অমনিতে যেমন হয় আর কি — আমার পরিশ্রমের জন্যে কিছু মজুরী। তুই একবার ভেবে দ্যাখ — তিনশটি রুবল! এতে সঙ্গে সঙ্গে মুদিখানা খুলে বসা যায়...'

এই রকম কথা বলতে বলতে দারোয়ান পকেট থেকে এক টুকরো সসেজ বার করে পুড্লের দিকে ছুঁড়ে দিল। মাটিতে পড়ার আগেই আর্তো সেটা লুফে নিয়ে এক গ্রাসে গিলে ফেলল, আরও কিছু পাওয়ার আশায় লেজ নাড়াতে লাগল।

'কথা শেষ হয়েছে?' লদিজ্‌কিন সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল।

'এ ব্যাপারে শেষ করতে আর কতক্ষণ? কুকুর দাও — টাকা হাতে হাতে।'

'আ-চ্-ছা,' দাদু বিদ্রূপের সুরে টেনে টেনে বলল। 'তার মানে, কুকুরটাকে বেচতে হবে?'

'সোজা কথা—বেচতে হবে। আর কী চাই তোমাদের? আসল ব্যাপার হল, আমাদের ছোটকত্তার বড় বায়নাক্কা। কোন কিছুর বায়না যদি ধরলেন ত গোটা বাড়ি মাথায় করবেন। দাও— আর কোন কথা নেই। এ ত বাপ না থাকলে, আর বাপ যখন থাকেন তখন — সে আর কী বলব! ...সব্বাইকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছাড়েন। কত্তা আমাদের হলেন গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, হয়ত শুনে থাকবে — মিস্টার ওবোলিয়ানিনভ্। সারা রাশিয়ায় রেল লাইন বানান। কোটিপতি! আর ছেলে ত আমাদের ঐ একটাই। তাই দুরন্তপনা। জ্যান্ত টাট্টু ঘোড়া চাই — তা-ই সই, নে। নৌকো চাই — তা-ই সই, নে সত্যিকারের নৌকো। মানে, কোন ব্যাপারে, কোনটাতেই না নেই...'

'আর চাঁদ?'

'সে আবার কী? এ আবার কেমনধারা কথা?'

'বলি, আকাশের চাঁদ কি একবারও চায় নি?'

'আরে ধুৎ... কী যে বল? — চাঁদ!' দারোয়ান থতমত খেয়ে গেল। 'তাহলে কী হল গো ভালোমানুষের পো? আমাদের সব ঠিক আছে ত?'

দাদু ইতিমধ্যে সেলাইয়ের রেখায় রেখায় রঙচটা খয়েরী রঙের কোর্তাটা গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে। সে সগর্বে যতদূর পারা যায় নিজের চিরকেলে কুঁজো পিঠ টানটান করে নিল।

'শোন হে ছোকরা, একটা কথা তাহলে বলি,' সে সাড়ম্বরে শুরু করল। 'যেমন ধর না, তোর একটা ভাই আছে, কিংবা বন্ধুর কথাই ধর না কেন — একেবারে ছেলেবেলাকার বন্ধু... দাঁড়াও

হে বন্ধু, কুকুরটাকে খাইয়ে মিছিমিছিই সসেজ নষ্ট করছিস... বরং তুই নিজে খা... এ দিয়ে ওকে বশ করা যাবে না, ভায়া। বলছিলাম কি, তোর যদি এমন কোন বন্ধু থাকত... যার চেয়ে খাঁটি বন্ধু আর হয় না... একেবারে ছেলেবেলার, তাহলে বল দেখি আন্দাজ কত হলে তাকে বিক্রি করতিস?'

'এটা একটা তুলনা হল!..'

'আলবত হল। তোর ঐ যে কত্তাটি, যে রেল লাইন বানায়, তাকে এ কথাই বলিস,' দাদু গলা চড়াল। 'এ কথাই বলিস যে কেনার হলেও সব জিনিস বেচার মতো নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ! আরে তুই কুকুরের গায়ে হাত বুলাবি না বলছি, তাতে কোন লাভ নেই। আর্তো, কুকুরের বাচ্চা রে আমার, এদিকে আয়, তবে রে! সেরিওজা চল্।'

'তুই একটা বুড়ো আহাম্মক,' দারোয়ান শেষকালে মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না।

'আহাম্মক আছি ত জন্ম থেকেই আছি, আর তুই হলি গিয়ে লোচ্চা, পাষণ্ড, ভাড়াটে দালাল,' লদিজ্‌কিন গালাগাল বর্ষণ করল। 'তোর ঐ জাঁদরেল ঠাকরুনটির সঙ্গে দেখা হলে পেন্নাম জানাস, বলিস, আমাদের তরফ থেকে তার ছিচরণে শত কোটি পেন্নাম। সতরঞ্চি ভাঁজ কর রে সেরিওজা! ওঃ, পিঠ... পিঠটা আমার গেল রে! চল।'

'তাহলে এ-ই ক-থা!' দারোয়ান বেশ অর্থপূর্ণভাবে টেনে টেনে বলল।

'ঐ নিয়েই থাক!' জবাবে খোঁচা দিয়ে বলল বুড়ো।

ওরা সমুদ্রের তীর বরাবর ঐ একই পথ ধরে পা টেনে টেনে আবার ওপরের দিকে চলল। দৈবাৎ পেছন ফিরে তাকাতে সেরিওজা দেখতে পেল দারোয়ান তাদের লক্ষ্য করছে। তার চোখেমুখে চিন্তা ও থমথমে ভাব। সে তার হাতের পাঁচটা আঙুলের সবগুলো দিয়েই একমনে আলুথালু কটা চুলে ভর্তি মাথার পেছন দিকটা চুলকোচ্ছে, ফলে টুপি নেমে এসেছে চোখের ওপর।

৫

মিস্‌খোর ও আলুপ্‌কার মাঝখানে, ঢালু রাস্তার নিচের দিকে একটা জায়গার ওপর লদিজ্‌কিন দাদুর বহুকালের নজর। বসে খাওয়া-দাওয়া করার পক্ষে চমৎকার জায়গা। সে তার সঙ্গীদেরও সেখানে নিয়ে চলল। মলিন বর্ণের উত্তাল পাহাড়ী জলধারার ওপর একটি সেতু। সেতুর অনতিদূরে, বাঁকা বাঁকা ওকগাছ আর বাদামের ঘন ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় মাটি ভেদ করে কলকল স্বরে ছুটে চলেছে শীতল জলের ধারা। জলের ধারা মাটিতে গোলাকার অগভীর জলাশয় সৃষ্টি করে সেখান থেকে সরু সাপের আকারে, জীবন্ত রুপোলী রেখার মতো ঘাসের মধ্যে ঝলমল করতে করতে ছুটে নেমেছে পাহাড়ী নদীর বুকে। এই ঝরনার কাছে সব সময় সকাল-সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ মিলত ধর্মপ্রাণ তুর্কীদের। তারা ওখানে জল পান করত, ওজু সারত।

'আমাদের পাপের বোঝা বিরাট, আর সম্বল নামমাত্র,' বাদামগাছের ঝোপের নিচে ঠাণ্ডায় বসতে বসতে দাদু বলল। 'কোথায় রে সেরিওজা?.. প্রভু দয়াময়!'

ক্যাম্বিশের ঝুলি থেকে সে বার করল রুটি, ডজনখানেক লাল টমেটো, এক টুকরো ভেড়ার দুধের পনীর আর এক বোতল জলপাই তেল। নুন তার কাছে ছিল এমন একটা নেকড়ার পুঁটলিতে বাঁধা যার পরিচ্ছন্নতা সন্দেহজনক। খাওয়ার আগে বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে ক্রুশ করল, ফিসফিস করে কী সব আওড়াল। তারপর সে রুটিটা তিনটে অসমান অংশে ভাগ করল — একটা — সবচেয়ে বড়টা — বাড়িয়ে দিল সেরিওজার দিকে (ছোট, বাড়ন্ত বয়স — ওর খাওয়া দরকার), অন্যটা — যেটা তার চেয়ে একটু ছোট — রাখল পুড্‌লের জন্য, আর সবচেয়ে ছোটটা নিল নিজে।

'বাপ আর পুতের নাম করি। হে প্রভু, তুমিই সকলের নয়নপথের আশা ভরসা,' ব্যস্তসমস্তভাবে খাবার ভাগ করে, বোতল থেকে তার ওপর তেল ঢালতে ঢালতে সে ফিসফিস করে বলল। 'খা রে সেরিওজা!'

সত্যিকারের মেহনতীরা যেভাবে খায় সেই ভঙ্গিতে — কোন তাড়াহুড়ো না করে, ওরা তিনজনে ধীরেসুস্থে, চুপচাপ নিজেদের সাদাসিধে খাবার খেতে শুরু করল। কেবল শোনা যেতে লাগল তিনজোড়া চোয়ালের চিবুনোর আওয়াজ। আর্তো সটান পেটে ভর দিয়ে শুয়ে রুটির ওপর সামনের দুটো থাবা রেখে এক কোনায় নিজের ভাগ খাচ্ছিল। দাদু আর সেরিওজা পালা করে পাকা টমেটো নুনে সামান্য ডুবিয়ে নিচ্ছিল; টমেটো থেকে ওদের ঠোঁট আর হাত বয়ে রক্তের মতো লাল টকটকে রস গড়িয়ে পড়ছিল। ওরা পনীর ও রুটির সঙ্গে সঙ্গে টমেটো খেয়ে চলল। পেট পুরে খাওয়ার পর ওরা ঝরনার ধারার নিচে টিনের মগ পেতে জল নিয়ে আকণ্ঠ পান করল। জল — টলটলে, অপূর্ব তার স্বাদ, আর এত কনকনে যে তাতে মগের বাইরে পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল। দুপুরের গরম আর দীর্ঘ পথ অভিনেতাদের একেবারে হয়রান করে ফেলেছে — ওরা আজ ঘুম থেকে উঠেছে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে। দাদুর চোখ বুঁজে আসছিল। সেরিওজা হাই তুলছিল আর আড়মুড়ি ভাঙছিল।

'কী ভায়া, শুয়ে মিনিটখানেক ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়?' দাদু জিজ্ঞেস করল। 'দে দেখি, শেষবারের মতো একটু জল খেয়ে নি। আঃ, কী আরাম!' ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার ফাঁকে মুখ থেকে মগ সরিয়ে রাখতে রাখতে সে হাঁকপাঁক করে উঠল। তার গোঁফদাড়ি বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল উজ্জ্বল জলের ফোঁটা। 'আমি যদি রাজা হতাম তাহলে শুধু এই জল খেতাম... সকাল থেকে রাত অবধি! আর্তো, এদিকে আয়, তু-উ-উ! দেখলি ত, ভগবান পেট ভরালেন, কেউ দেখতে পেল না, আর দেখতে পেলেই বা কার কী বলার আছে?.. ওফ্, উ-হু-হু!'

বুড়ো আর ছেলেটি মাথার নিচে নিজেদের পুরনো কোট পেতে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। তাদের মাথার ওপর সড়সড় করতে লাগল শাখাবহুল, বাঁকা ওকগাছের ঘন পাতার রাশি। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার নীল আকাশ। পাথর থেকে পাথরের ওপর ছুটন্ত জলস্রোত এমন একঘেয়ে, এমন তোষামোদের সুরে কলতান ধরেছে যে মনে হয় ঘুমপাড়ানি কাকলিতে কাকে

যেন যাদু করছে। দাদু কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, উঃ আঃ আওয়াজ করল, কী যেন বলে চলল, কিন্তু সেরিওজার মনে হতে লাগল তার কণ্ঠস্বর যেন বহুদূরের কোন স্নিগ্ধ ঘুমের দেশ থেকে ভেসে আসছে আর কথাগুলো দুর্বোধ্য — রূপকথার মতো।

'প্রথম কাজ — তোকে একপ্রস্থ পোশাক কিনে দেওয়া — সোনালী বর্ডার দেওয়া গোলাপী গেঞ্জি জাঙ্গিয়া... জুতোও গোলাপী, সাটিনের মতো... কিয়েভে, খারকভে কিংবা এই ধর গিয়ে ওদেসা শহরে — সেখানে ভায়া কী সার্কেস!.. বাতি অজস্র... কেবল বিজলীবাতি জ্বলছে। লোক হাজার পাঁচেক হবে, তার বেশিও হতে পারে... কত, কে জানে? তোর একটা পদবীও বানাব, অবশ্য ইতালীয়। এস্তিফেয়েভ কিংবা ধর লদিজ্‌কিন — এসব আবার কোন পদবী নাকি? স্রেফ বাজে — এতে কোন রকম কল্পনাই নেই। আমরা বিজ্ঞাপনে তোর নাম দেব — আন্তোনিও কিংবা ধর — এটাও ভালো — এন্‌রিকো কিংবা আল্‌ফোন্‌সো...'

এর পরে সেরিওজা আর কিছু শুনতে পেল না। কোমল ও মধুর তন্দ্রার ঘোর তার দেহকে নাগপাশে বাঁধল, শিথিল করে ফেলল, তাকে আচ্ছন্ন করল। সার্কাসে সেরিওজার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আহার পরবর্তী এত সাধের জল্পনাকল্পনার খেই হঠাৎ হারিয়ে ফেলে দাদুও ঘুমে ঢলে পড়ল। একবার ঘুমের ঘোরে তার মনে হল আর্তো যেন কার উদ্দেশে গর্জন করছে। মুহূর্তের জন্য তার আচ্ছন্ন মাথায় খেলে গেল অল্পকিছু আগে দেখা গোলাপী জামা গায়ে দারোয়ান সম্পর্কে অর্ধচেতন ও উদ্বেগজনক স্মৃতি, কিন্তু তন্দ্রায়, ক্লান্তিতে ও গরমে কাবু হয়ে পড়ায় ওঠার মতো শক্তি তার হল না, সে কেবল আলস্যভরে, চোখ বোঁজা অবস্থায় কুকুরটাকে ডাক দিল:

'আর্তো... কোথায় যাচ্ছিস? ত-বে রে, বাউণ্ডুলে!'

কিন্তু তার ভাবনা তৎক্ষণাৎ গুলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল আকারহীন, ভারী ভারী ছায়ামূর্তির ভিড়ে।

দাদুর ঘুম ভাঙল সেরিওজার গলার আওয়াজে। জলস্রোতের ওপাশে সেরিওজা একবার সামনে আরেকবার পেছনে দৌড়ুচ্ছে, তীক্ষ্ন শিস দিচ্ছে আর অস্থির ও ভয়ার্ত স্বরে জোরে চিৎকার করছে:

'আর্তো, তু-উ-উ! ফিরে আয়! শ্‌-শ্‌-শ্‌! আর্তো, ফিরে আয়!'

'এমন হাউমাউ করছিস কেন রে, সেরিওজা?' ঝিঁঝি ধরা হাতটা অতি কষ্টে টানটান করতে করতে অসন্তুষ্ট স্বরে লদিজ্‌কিন জিজ্ঞেস করল।

'হবে আর কী? আমাদের ঘুমোনোর ফাঁকে কুকুরটা গেল!' বিরক্তিভরে রুক্ষস্বরে সেরিওজা জবাব দিল। 'কুকুর হারিয়ে গেছে।'

সে তীক্ষ্ন শিস দিল, আরও একবার টেনে টেনে চেঁচাল:

'আর্তো-ও-ও!'

'যত রাজ্যের বাজে চিন্তা!.. ফিরবে 'খন,' দাদু বলল। তবে সেও চটপট উঠে দাঁড়াল, ঘুমানোর ফলে ভাঙা ভাঙা, রাগী আর বুড়োদের মতো অস্বাভাবিক কিনকিনে গলায় সে কুকুরের উদ্দেশে চিৎকার শুরু করল:

'আর্তো, এদিকে আয় রে, কুত্তার বাচ্চা!'

কুকুরকে অনবরত ডাকতে ডাকতে এলোমেলো ছোট ছোট পদক্ষেপে সে চটপট সেতু পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। তার সামনে আধভার্স্ট পর্যন্ত যতদূর চোখ পড়ে দেখা যায় উজ্জ্বল সাদা রঙের মসৃণ পথ — যেন পটে আঁকা, কিন্তু সেখানে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন বা ছায়া ছিল না।

'আর্তো! আর্তো রে!' বুড়ো করুণস্বরে ককিয়ে উঠল।

কিন্তু হঠাৎ সে থমতে দাঁড়াল, পথের দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল, আলগোছে বসে পড়ল।

'এই যে, এই যে, এই হল ব্যাপার তাহলে!' বুড়ো হতাশ কণ্ঠে উচ্চারণ করল। 'সেরিওজা! ওরে সেরিওজা, এদিকে আয় দেখি।'

'কী হল, ওখানে আবার কী?' লদিজ্‌কিনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সেরিওজা রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল। 'কোন হাতি-ঘোড়াটা খুঁজে পেলে শুনি?'

'সেরিওজা... এটা কী ব্যাপার রে?.. এই যে এটা... এটা কী? তুই বুঝতে পারছিস?' চাপা গলায় বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

করুণ, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে সেরিওজার দিকে তাকাল, আর হাত চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোজা মাটি দেখিয়ে দিল।

পথে, সাদা ধুলোর মধ্যে পড়ে ছিল খানিকটা কামড়ে খাওয়া সসেজের একটা বেশ বড়সর টুকরো, আর তার পাশে চর্তুর্দিকে — কুকুরের পায়ের ছাপ।

'বদমাশটা তাহলে কুকুর নিয়ে গেল!' দাদু ভয়ার্ত স্বরে ফিসফিস করে বলল। তখনও সে আলগোছে বসে। 'ও ছাড়া আর কেউ নয়, ব্যাপার পরিষ্কার ...তোর মনে আছে, কিছু আগে সমুদ্রের ধারে ও সমানে সসেজের টোপ দিচ্ছিল?'

'ব্যাপার পরিষ্কার,' রাগে, দুঃখে সেরিওজা আওড়াল।

দাদুর বিস্ফারিত চোখজোড়া বড় বড় জলের ফোঁটায় ভরে গেল, ঘন ঘন পলক পড়তে লাগল। সে দুহাতে চোখ ঢাকল।

'এখন আমরা কী করব, সেরিওজা? অ্যাঁ? কী করব আমরা এখন?' সামনে পেছনে দুলতে দুলতে অসহায়ের মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

'কী করব, কী করব!' রাগে গরগর করে তাকে ভেংচি কেটে বলল সেরিওজা। 'উঠে পড়, লদিজ্‌কিন দাদু, যাওয়া যাক!..'

'যাওয়া যাক,' মাটি থেকে উঠতে উঠতে হতাশ সুরে, বাধ্য ছেলের মতো আওড়াল বুড়ো। 'কী আর করা? যাওয়া যাক, সেরিওজা!'

সেরিওজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল — বুড়োর ওপর এমন চোটপাট শুরু করে দিল যেন সে একটা ছোট ছেলে:

'হয়েছে, বুড়ো, আর ঢং করতে হবে না। পরের কুকুরকে টোপ দিয়ে নিয়ে যাওয়া — এ কি মগের মুল্লুক নাকি? কী হল, ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? আমি কি মিথ্যে বলছি? সোজা গিয়ে বলব, 'কুকুর ফেরত দাও!' যদি না দেয় তাহলে কোর্টে যাব। ব্যস্, চুকে গেল।'

'কোর্টে... হ্যাঁ... তা... কোর্টে, সে ত ঠিক কথাই...' অর্থহীন, তিক্ত হাসি হেসে লাদিজ্‌কিন আওড়াল। কিন্তু তার অপ্রতিভ চোখজোড়া আনাড়ির মতো ঘুরতে লাগল। 'কোর্টে... হ্যাঁ... কেবল বুঝলি কিনা সেরিওজা... কোর্টে যাওয়া... এ ব্যাপারটা সম্ভব না...'

'না কেমন? আইন সবার জন্যে এক। ওদের তোয়াজ করার কী আছে?' বালক অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিয়ে বলল।

'তুই কিন্তু, সেরিওজা, ঠিক বুঝতে পারছিস না... আমার ওপর রাগ করিস নে। কুকুর ত আমরা ফেরত পাচ্ছি না।' দাদু রহস্যের ভঙ্গিতে গলার স্বর নামাল। 'আমি ভয় পাচ্ছি পাচ্‌পোটের ব্যাপারে। শুনেছিস, ঐ বাবুটি তখন কী বলল? শুধোল: 'তোর পাচ্‌পোট আছে?' দ্যাখ দেখি কাণ্ডখানা! এদিকে আমার আবার...' দাদুর চোখেমুখে ফুটে উঠল ভয়ের চিহ্ন, শোনা যায় কি যায় না এমনিভাবে সে ফিসফিস করে বলল, 'আমার আবার, সেরিওজা, পাচ্‌পোট ত অন্যের।'

'অন্যের কেমন?'

'সেটাই ত ব্যাপার — অন্যের। নিজেরটা আমি হারিয়ে ফেলি তাগানরোগে, এমনও হতে পারে যে কেউ চুরি করে। এর পর আমি বছর দুয়েক ঘোরাঘুরি করলাম: গা ঢাকা দিলাম, ঘুষ দিলাম, আর্জি লিখলাম... শেষে দেখলাম কোন সম্ভাবনাই নেই, বেঁচে আছি যেন খরগোসের মতো — সবেতেই ভয়। কোন শান্তি নেই। এমন সময় ওদেসায় রাতের আশ্রয়ে এক গ্রীকের সঙ্গে দেখা। লোকটা বলল, 'এ ত একেবারেই তুচ্ছি কাজ।' বলে, 'টেবিলের ওপর পঁচিশটা রুবল রাখ, বুড়ো, আমি তোমাকে পাকাপাকি পাচ্‌পোটের ব্যবস্থা করে দেব।' আমি এটা-ওটা চিন্তা করলাম। ভাবলাম, নাঃ, যা থাকে কপালে! বললাম, দাও। সোনা আমার, এর পর থেকেই আমার জীবন চলছে অন্যের পাচ্‌পোটে।'

'ওঃ, দাদু, দাদু!' কান্নায় গলা বুজে আসার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেরিওজা। 'কুকুরটার জন্যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে গো আমার... বড় ভালো কুকুর ছিল গো...'

'সেরিওজা, বাছা আমার!' বুড়ো কাঁপা কাঁপা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ওরে, আমার যদি সত্যিকারের পাচ্‌পোট থাকত তাহলে কি ওরা লাট-বেলাট বলে আমি থোড়াই পরোয়া করতাম? টুঁটি টিপে ধরতাম না!.. 'এ কেমন ব্যাপার? বলুন দেখি, অন্যের কুকুর চুরি করার পুরো অধিকার আপনার কোত্থেকে এলো? কোন আইনে একথা বলে?' কিন্তু এখন আমাদের কিছু করার নেই, সেরিওজা। পুলিশের কাছে গেলেই — প্রথম কাজ: 'পাচ্‌পোট দাও! তুই তাহলে সামারার ভদ্দরলোক মার্তিন লাদিজ্‌কিন?' — 'আমি, হুজুর।' অথচ আমি ভায়া মোটেই লাদিজ্‌কিন নই, কোন ভদ্দরলোকও না, আমি হলেম চাষী, ইভান দুদ্‌কিন। আর এই লাদিজ্‌কিন লোকটা যে কে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। কে জানে, হয়ত বা কোন জোচ্চোর, নয়ত ফেরারী

আসামী? এমনকি এ-ও হতে পারে যে খুনী? না, সেরিওজা, এখানে আমাদের কিছু করার নেই... কিছুই করার নেই, সেরিওজা...'

দাদুর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেল, রুদ্ধ হয়ে এলো। রোদে পোড়া বাদামী, গভীর বলিরেখা বয়ে আবার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বুড়ো অবসন্ন হয়ে পড়ল। সেরিওজা উত্তেজনায় ফেকাসে হয়ে গিয়ে ভুরুজোড়া রীতিমতো কুঁচকে চুপচাপ তার কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে বুড়োর বগল চেপে ধরে তাকে ওঠাতে লাগল।

'চল দাদু,' কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে দরদ মাখা সুরে সে বলল। 'চুলোয় যাক গে পাচ্‌পোট, চল! বড় রাস্তায় রাত কাটালে ত আর আমাদের চলবে না।'

'সোনা আমার, বাছা রে,' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। 'আমাদের কুকুরটা কী মজারই না ছিল রে... আমাদের আর্তো রে... অমন কুকুর আর আমাদের হবে না...'

'থাক, থাক। ওঠ,' সেরিওজা হুকুম দিল। 'দেখি, তোমার গায়ের ধুলো একটু ঝেড়ে দিই। তুমি দেখছি একেবারে ভেঙে পড়েছ, দাদু।'

সেদিন অভিনেতারা আর কাজ করল না। বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও 'পাচ্‌পোট' — এই ভয়ঙ্কর শব্দটির সর্বনাশা অর্থ জানতে সেরিওজার মোটেই বাকি ছিল না। এই কারণে আর্তোর আর খোঁজ চালিয়ে যাওয়া, কোর্টে নালিশ জানানো কিংবা অন্য কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা— কোনটাতেই সে আর জিদ ধরল না। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মুখে জেদ ও একাগ্রতার যে একটা নতুন ভাব ফুটে উঠেছে, রাতের আশ্রয় অবধি পথে দাদুর পাশে পাশে যেতে যেতে তা অন্তর্হিত হল না, মনে হচ্ছিল সে যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় একটা কিছু মনে মনে ভাবছিল।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে ঠিক না করলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে একই গোপন অনুভূতির প্রেরণায় তারা ইচ্ছে করে বেশ ঘোরানো পথ ধরল যাতে আরও একবার 'বান্ধব পুরীর' পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। আর্তোকে দেখতে পাবে, কিংবা অন্তত দূর থেকে তার গলা শুনতে পাবে এই ক্ষীণ আশা নিয়ে ওরা গেটের সামনে কিছুটা কালবিলম্ব করল।

কিন্তু জমকাল বাগানবাড়ির নকশাকাটা গেট এ'টে বন্ধ করা ছিল, আর বিষাদাচ্ছন্ন তন্বী সাইপ্রেসের তলে ছায়াঘন বাগানজুড়ে বিরাজ করছিল গুরুগম্ভীর, অটল, সুবাসিত নৈঃশব্দ।

'ভদ্‌-দর লোক!' যে তীব্র তিক্ততায় মন ভরে গিয়েছিল তার সমস্তটা এই শব্দটির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বুড়ো ফ্যাঁসফেঁসে গলায় উচ্চারণ করল।

'হয়েছে, চল,' বালক কঠিন স্বরে হুকুম দিয়ে তার সঙ্গীর আস্তিন ধরে টানল।

'সেরিওজা, আমাদের আর্তো ওদের ওখান থেকে পালাতেও ত পারে?' দাদু হঠাৎ আবার ফোঁপাল। 'অ্যাঁ? কী বলিস রে তুই?'

কিন্তু বালক বুড়োর কথায় কোন জবাব দিল না। সে বড় বড়, দৃঢ় পদক্ষেপে আগে আগে চলেছে। তার চোখজোড়া একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল রাস্তার নিচের দিক, আর ক্রুদ্ধভাবে সূক্ষ্ম ভুরুদুটি এসে মিশেছে নাকের খাঁজের ওপর।

৬

তারা চুপচাপ আল্‌প্‌কা পর্যন্ত চলল। দাদু সারাটা পথ ককাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সেরিওজার মুখে বরাবর লেগে রইল সেই বিদ্বেষ ও দৃঢ়সঙ্কল্পের ছাপ। রাত্রিবাসের জন্য তারা এসে উঠল এক নোংরা তুর্কী কফিখানায়। কফিখানার নামটা বেশ জাঁকাল — 'ঈল্‌দিজ' — তুর্কী ভাষায় যার অর্থ হল 'তারকা'। ওদের সঙ্গে রাতের আশ্রয় নিয়েছিল কিছু গ্রীক — রাজমিস্ত্রি, মাটিকাটা মজুর — তুর্কী, জনকয়েক রুশী শ্রমিক, যারা দিনমজুরীতে কায়ক্লেশে পেট চালায়; তাছাড়া ছিল কিছু বাজে ধরনের, সন্দেহজনক বাউণ্ডুলে — রাশিয়ার দক্ষিণে এদের বহু সংখ্যায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে কফিখানা বন্ধ হওয়ামাত্র তারা সকলে দেয়াল বরাবর রাখা বেঞ্চে এবং সোজা মেঝেতে শুয়ে পড়ল, তাছাড়া যারা একটু বেশি অভিজ্ঞ তারা প্রয়োজনীয় সতর্কতার বশে তাদের জিনিসপত্র ও কাপড়জামার মধ্যে যেগুলো বেশি মূল্যবান সে সব নিজেদের মাথার নিচে রাখল।

সেরিওজা মেঝেতে দাদুর পাশটিতে শুয়ে ছিল। মাঝরাতেরও বেশ কিছু বাদে সেরিওজা সন্তর্পণে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জামাকাপড় পরতে লাগল। চওড়া জানলা ভেদ করে ঘরের মধ্যে ঝরে পড়ছে চাঁদের পাণ্ডুর আলো, টেরছা, কাঁপা কাঁপা বুননিতে ছড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর এবং সারি সারি ঘুমন্ত লোকজনের ওপর পড়ে তাদের মুখে যন্ত্রণাকাতরতা ও মৃতের ভাব এঁকে দিচ্ছে।

'এতো রাতে কুথা রে, খোঁকা?' কফিখানার মালিক, তুর্কী যুবক ইব্রাহিম দরজার পাশ থেকে ঘুমজড়ানো স্বরে সেরিওজাকে হাঁক দিয়ে বলল।

'ছাড়। দরকার আছে!' গুরুগম্ভীর, কঠিন স্বরে সেরিওজা জবাব দিল। 'ওঠ না বাপু দেড়েল তুর্কী।'

হাই তুলে গা চুলকোতে চুলকোতে, জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক চুকচুক আওয়াজ করতে করতে ইব্রাহিম দরজা খুলে দিল। তাতারদের বাজারের সরু সরু রাস্তা গাঢ় নীল রঙের ঘন ছায়ায় ডুবে ছিল। সে ছায়ার খাঁজকাটা জাফরি গোটা সদর রাস্তাকে ঢেকে দিয়ে দালানকোঠার অন্য আলোকিত অংশের পাদমূল স্পর্শ করেছে আর বাড়ির ঐ অংশের নিচু দেয়াল চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে সাদা ফুটফুটে। জায়গাটার দূর উপকণ্ঠে কুকুর ডাকছে। ওপরের বড় রাস্তায় কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সাবলীল গতিতে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ।

ঘনবদ্ধ সাইপ্রেসের নিস্তব্ধ ভিড়ে ঘেরা সাদা মসজিদ আর পেঁয়াজের মাথার আকারের তার সবুজ রঙা গম্বুজ পেরিয়ে ছেলেটা আঁকাবাঁকা ঘিঞ্জি অলিগলি দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হালকা থাকার উদ্দেশ্যে সেরিওজা ওপরের পোশাক সঙ্গে নেয় নি, তার পরনে ছিল কেবল জাঙ্গিয়া। তার পিঠের ওপর এসে পড়ছিল চাঁদের কিরণ এবং অদ্ভুত, কালো, খাটোখাটো লিপাপোঁছা মূর্তির মতো আগে আগে দৌড়ুচ্ছিল তার ছায়া। পথের দুপাশ আড়াল

করে ছিল কোঁকড়া কোঁকড়া ঝুপ্‌সি ঝোপঝাড়। তার ভেতর থেকে কোন একটা পাখি একই রকম সময়ের ব্যবধানে মিহি, কোমল সুরে ডেকে চলছিল একঘেয়ে ডাক: 'নি-ই-দ্!.. নি-ই-দ্!..' মনে হচ্ছিল পাখিটা যেন রাতের নিঃশব্দতার মধ্যে অনুগতের মতো পাহারা দিচ্ছে কোন এক বিষাদাচ্ছন্ন রহস্য, অসহায়ভাবে যুঝে চলেছে নিদ্রা ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে আর হতাশ হয়ে মৃদুস্বরে কারও কাছে অনুযোগ জানাচ্ছে: 'নি-ই-দ্, নি-ই-দ্!..' ঝুপ্‌সি ঝোপঝাড়ের ওপরে, দূর অরণ্যের নীলাভ টোপর ছাড়িয়ে দুই চুড়ো আকাশে ঠেকিয়ে মাথা উঁচিয়ে উঠেছে আই-পেত্রি পাহাড়—এমনই হালকা, সুস্পষ্ট, ফুরফুরে যে মনে হয় বুঝি রুপোলী রাংতার বিশাল এক টুকরো কেটে তাকে গড়া হয়েছে।

এই জমকাল নিঃশব্দতার মধ্যে সেরিওজার পদশব্দ এমন স্পষ্ট ও উদ্ধত শোনাচ্ছিল যে তার খানিকটা ভয় ভয় লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বুকের ভেতরে চল্‌কে উঠল মাতাল-করা বীরত্বের কেমন একটা সিড়সিড় ভাব। একটা মোড় ফিরতে হঠাৎ সামনে দেখা গেল সমুদ্র। বিশাল, শান্ত সমুদ্র নিঃশব্দে, গম্ভীরভাবে ঢেউ গড়িয়ে দিচ্ছে। দিগন্ত থেকে তীরের দিকে প্রসারিত হয়েছে কাঁপা কাঁপা, সরু রুপোলী রেখা; সমুদ্রের মাঝখানে সেটা মিলিয়ে যাচ্ছিল—কেবল কোথাও কোথাও থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছিল তার ছটা — তারপর হঠাৎই সমুদ্রের তীর ঘিরে জীবন্ত, ঝকঝকে ধাতুর মতো মাটির একেবারে কাছাকাছি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

সেরিওজা সাড়াশব্দ না করে চটপট পার্কের কাঠের ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেখানে, ঘন গাছপালার নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে থেকে শোনা যাচ্ছিল জলস্রোতের অবিরাম কলধ্বনি, অনুভব করা যাচ্ছিল তার ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা শ্বাসপ্রশ্বাস। পায়ের নিচে স্পষ্ট খটখট আওয়াজ তুলছিল সেতুর পাটাতন। সেতুর নিচের জল কালো, ভয়ানক। অবশেষে সেই উঁচু লোহার গেট — লেসের মতো জাফরিকাটা, মাধবীলতার শাখাপ্রশাখায় জড়ানো। গাছপালার ঘন জঙ্গল ভেদ করে চাঁদের আলো মৃদু ফসফরাসের বিন্দুর মতো গেটের খোদাই কাজ বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ওপাশে অন্ধকার, নিঃশব্দতা সহজেই ভয়ের উদ্রেক করে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সেরিওজা ভেতরে ভেতরে অনুভব করল দ্বিধা, অনেকটা আতঙ্কের ভাব। সে এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি কাটিয়ে উঠে ফিসফিস করে বলল:

'আমি কিন্তু ভেতরে ঢুকবই! আমার কাছে এখন সব সমান!'

গেটের গা বয়ে উঠে যেতে তাকে বেগ পেতে হল না। গেটের গায়ে লোহার ঢেউ খেলানো যে সব মনোরম কারুকাজ ছিল, সেগুলো শক্ত হাতের মুঠি আর ছোট ছোট পেশল পায়ের ভালোমতো অবলম্বন হিশেবে কাজ করল। গেটের ওপরে অনেকটা উঁচুতে এক থাম থেকে আরেক থাম জুড়ে ছিল পাথরের তৈরী চওড়া খিলান। সেরিওজা হাতড়ে হাতড়ে তার ওপর উঠল, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পাদুটি নামিয়ে দিল নিচে, অন্য ধারে। কোথাও কোন খাঁজ আছে কিনা তা দুপায়ে খুঁজতে খুঁজতে সে একটু একটু করে ঐ দিকেই তার গোটা শরীরটা ঠেলতে লাগল। এই ভাবে টানটান দুহাতে কেবল আঙুল দিয়ে খিলানের কিনারা আঁকড়ে

ধরে সে খিলানের একেবারে ওপাশে ঝুলে পড়ল, কিন্তু পায়ে সে তখনও কোন অবলম্বন খুঁজে পেল না। তার তখনও মাথায় আসে নি যে গেটের ওপরের খিলান বাইরের তুলনায় ভেতরের দিকে অনেকটা বেশি বেরিয়ে আছে। হাত যত অবশ হয়ে আসতে লাগল এবং তার অবসন্ন শরীর যতই ভারী হয়ে নিচের দিকে ঝুলতে লাগল ততই বেশি করে তার মনের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হল।

শেষ পর্যন্ত সে আর সামলাতে পারল না। হাতের যে আঙুলগুলো দিয়ে সে ধারাল কোনা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তা আল্গা হয়ে যেতে সে দ্রুত ছিটকে নিচে পড়ে গেল।

সে পায়ের নিচে বড় বড় কাঁকরের করকর আওয়াজ শুনতে পেল, দুই হাঁটুতে অনুভব করল কনকনে ব্যথা। পড়ার ফলে আঘাত পাওয়ায় সে কয়েক মুহূর্ত চার হাত পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল এখনই বাগানবাড়ির সব বাসিন্দা জেগে উঠবে, গোলাপী জামাগায়ে যমদূতমার্কা দারোয়ানটি ছুটে আসবে, চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে... কিন্তু আগেকার মতোই বাগানে বিরাজ করতে লাগল গভীর, গম্ভীর নৈঃশব্দ। কেবল গোটা বাগান জুড়ে ভেসে চলেছে কেমন একটা মৃদু একঘেয়ে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ: 'ঝিঁ... ঝিঁ... ঝিঁ...'

'ওঃ, এ ত দেখছি আমার কানে বাজছে!' সেরিওজা আন্দাজ করল। সে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাগানে সবই ছিল ভয়ঙ্কর, রহস্যময়, রূপকথার মতো সুন্দর, যেন স্বপ্নালু সৌরভে সৌরভে ভরপুর। কেয়ারিতে অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায় ফুলের দল এক অজানা উৎকণ্ঠায় এ ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক যেন কানাকানি করতে করতে, চোরা চাহনি মেলে মৃদুমন্দ দুলছে। সুঠাম গড়নের, গন্ধবহ, ঝুপ্সি সাইপ্রেস গাছের সারি ভাবাচ্ছন্ন ও তিরস্কারের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে তাদের ধারাল চুড়ো নাড়াচ্ছে। আর জলধারার ওপারে, গভীর ঝোপের মধ্যে ক্লান্ত ছোট্ট পাখিটি নিদ্রার সঙ্গে যুঝে চলছে আর বিনম্র করুণ সুরে আওড়াচ্ছে: 'নি-ই-দ্!.. নি-ই-দ্!.. নি-ই-দ্!'

রাতে, পথের বিজড়িত ছায়ার মধ্যে সেরিওজা জায়গাটা চিনতে পারল না। অনেকক্ষণ করকরে কাঁকরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সে বাড়িটার দিকে বেরিয়ে এলো।

আজকের মতো অসহায়তা, অবহেলা ও নিঃসঙ্গতায় পরিপূর্ণ এমন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি জীবনে আর কখনও তার হয় নি। তার মনে হল বিশাল বাড়িটা যেন নির্মম শত্রুতে গিজগিজ করছে, তারা ওত পেতে অপেক্ষা করছে, নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে অন্ধকার জানলা দিয়ে ছোট, দুর্বল ছেলেটির প্রতিটি গতিবিধির ওপর গোপনে নজর রাখছে। অধীর আগ্রহে, নিঃশব্দে শত্রুরা প্রতীক্ষা করছে কোন এক সঙ্কেতের, প্রতীক্ষা করছে কার যেন ক্রুদ্ধ, দারুণ ভয়াল হুকুমের।

'ঘরে মোটেই নয়... ঘরে ওর থাকার সম্ভাবনা নেই!' সেরিওজা যেন ঘুমের ঘোরে ফিসফিস করে বলল। 'ঘরে ও কাতরাতে থাকবে, বিরক্তি ধরিয়ে দেবে...'

ও বাগানবাড়ির চারদিক ঘুরে দেখল। পেছনের দিকে, প্রশস্ত উঠানে ছিল দেখতে অনেকটা সাধারণ ধরনের, সাদাসিধে গোছের কোঠা, দেখে মনে হয় চাকরদের থাকার ঘর। বড় বাড়ির মতো

এখানেও একটি জানলারও আলো চোখে পড়ল না; কেবল অন্ধকার কাচের ওপর চাঁদের আলো পড়ে এখানে ওখানে নিষ্প্রাণ দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছিল। 'এখান থেকে আমার আর বেরোতে হচ্ছে না, জীবনেও বেরোতে হচ্ছে না!..' সেরিওজার প্রাণ কেঁদে উঠল। মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল বুড়ো বাজনাদারকে, দাদুকে, কফিখানায় রাতের আশ্রয় আর স্নিগ্ধ ঝরনার ধারে খাবার খাওয়ার দৃশ্য। 'এসব আর কখনও হবে না, কখনই হবে না!' মুসড়ে পড়ে সেরিওজা মনে মনে আওড়াল। কিন্তু তার ভাবনা যত হতাশায় ছেয়ে যেতে লাগল ততই বেশি করে আতঙ্কের জায়গায় তার মন জুড়ে বসল কেমন যেন অসাড় ও স্থির প্রতিহিংসাপরায়ণ মরিয়া ভাব।

ঠিক যেন কাতরানির মতো একটা মিহি ডাক হঠাৎ তার কানে এসে বাজল। শরীরের পেশী টানটান করে, পায়ের চেটোয় ভর দিয়ে সিধে হয়ে সেরিওজা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আওয়াজটা আবার হল। মাটির তলায় যে পাকা ঘরটির কাছাকাছি সেরিওজা দাঁড়িয়ে ছিল, মনে হল আওয়াজটা সেখান থেকেই আসছে। ঘরের সঙ্গে বাইরের আলো বাতাসের যোগাযোগ বলতে ছিল শার্সি ছাড়া একদারি বিদঘুটে, ছোট ছোট চারকোনা ফুটো। একটা ফুলের মালঞ্চ মাড়িয়ে সেরিওজা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, ঝরকাগুলির একটিতে মুখ রেখে শিস দিল। মৃদু, সাবধানী আওয়াজ নিচে কোথায় যেন শোনা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আর্তো! আর্তো রে!' সেরিওজা কাঁপা কাঁপা স্বরে ফিসফিস করে ডাকল।

একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ, বাঁধনছেঁড়া গর্জনে ছেয়ে গেল গোটা বাগান, তার প্রতিধ্বনি উঠল বাগানের সমস্ত প্রান্ত জুড়ে। সে গর্জনে উচ্ছ্বসিত ভক্তি-ভালোবাসার সঙ্গে মেশানো ছিল যেমন অনুযোগ তেমনি ক্রোধ আর দৈহিক যন্ত্রণার অনুভূতি। কোন কিছুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুকুরটা যে মাটির তলার অন্ধকার কুঠুরিতে সর্বশক্তিতে ছোটার চেষ্টা করছে তা শোনা যাচ্ছিল।

'আর্তো! কুকুরছানা আমার!.. আর্তো রে!..' কাঁদো কাঁদো গলায় সেরিওজা আবার বলল।

'শ্-শ্-শ্! আচ্ছা পাপ ত!' নিচের তলা থেকে ভেসে এলো মোটা গলার ক্ষিপ্ত চিৎকার। 'তবে রে হতভাগা!'

কুঠুরিতে কিছু একটা ঠোকার আওয়াজ হল। কুকুরটা দমকে দমকে টানা টানা হু-হু আর্তনাদে ফেটে পড়ল।

'খবরদার, মারবি না! কুকুরের গায়ে হাত তুলবি না বলছি হারামজাদা!' পাথরের দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে সেরিওজা ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

তার পরে যা ঘটল, সেরিওজা মনে করতে পারে ভাসা ভাসা — সবটাই যেন কোন এক প্রবল বিকারের ঘোরে। পাতাল কুঠুরির দরজা দড়াম শব্দে হাঁ করে খুলে গেল, সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো দারোয়ান। চাঁদের উজ্জ্বল আলো লোকটার মুখের ওপর এসে পড়ায় তাকে ম্লান দেখাচ্ছিল; তায় আবার একমাত্র নিচের বস্ত্র পরনে, খালিপায়ে, দাড়িওয়ালা—তাকে দেখে সেরিওজার মনে হল যেন কোন দৈত্য, রূপকথার ক্রুদ্ধ দানব।

'এখানে কে ঘোরাঘুরি করছে? গুলি করব!' বাগান জুড়ে মেঘগর্জনের মতো গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর। 'চোর! ডাকাত পড়েছে!'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে খোলা দরজার ওপাশের অন্ধকার ভেদ করে গর্জন করতে করতে একটা সাদা লাফানো গোলার মতো ছুটে বেরিয়ে এলো আর্তো। তার গলায় লটপট করছিল দড়ির ছেঁড়া টুকরো।

এদিকে কুকুরের কথা ভাবার মতো মনের অবস্থা সেরিওজার ছিল না। দারোয়ানের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে নিদারুণ আতঙ্কে তার প্রাণ উড়ে গেল, পা আটকে গেল, তার ছোট্ট পাতলা শরীরটা অবশ হয়ে পড়ল। তবে সৌভাগ্যবশত এই হতভম্ব ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। প্রায় আচ্ছন্নের মতো সেরিওজা তীক্ষ্ন, একটানা, মরিয়া আর্তনাদ ছাড়ল এবং ভয়ে দিশেহারা হয়ে, রাস্তাঘাট লক্ষ্য না করে পাতাল কুঠুরির পাশ ছেড়ে ছুট শুরু করল।

সে ছুটল পাখির মতো, ছুটতে ছুটতে মাটির ওপর সজোরে ঘন ঘন লাথি ছুঁড়তে লাগল; তার পাদুটি হঠাৎ যেন হয়ে পড়েছে ইস্পাতের দুটি স্প্রিং। তার পাশে পাশে সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে ছুটল আর্তো। পেছন পেছন বালির ওপর ভারী গমগম আওয়াজ তুলে ধেয়ে আসছে দারোয়ান, রাগে গরগর করে কী সব গালিগালাজ বর্ষণ করে চলছে।

ঝটকা মেরে গেটের সামনে এসে সেরিওজা আটকে গেল, মুহূর্তের মধ্যে তার ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা লোপ পেল, তবে শিগ্‌গিরই সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে অনুভব করল যে এখানে পথ নেই। পাথরের দেয়াল আর দেয়াল বরাবর বেড়ে ওঠা সাইপ্রেস গাছগুলোর মাঝখানে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ ফাঁক। কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করে একমাত্র ভয়ের অনুভূতির বশবর্তী হয়ে সেরিওজা নিচু হয়ে তার ভেতরে গলে গিয়ে দেয়াল বরাবর ছুটতে লাগল। ধুনার ভারী ও কটু গন্ধে আচ্ছন্ন সাইপ্রেসের তীক্ষ্ন ছুঁচ তার মুখের ওপর ঝাপটা মারছিল। সে শেকড়ে বেধে হোঁচট খেল, পড়ে গেল, তার হাত ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হল, কিন্তু পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়াল, যন্ত্রণা পর্যন্ত ভ্রূক্ষেপ না করে প্রায় দ্বিগুণ কুঁজো হয়ে আবার সামনের দিকে ছুটল; নিজের চিৎকার তার কানে আসছিল না। আর্তো তাকে অনুসরণ করল।

এই ভাবে, একদিকে — উঁচু দেয়াল আর অন্যদিকে — সাইপ্রেসের ঘন সারি যে সরু একফালি পথ গড়ে তুলেছে তার ওপর দিয়ে সে দৌড়াতে লাগল — যেন অফুরন্ত ফাঁদে পড়া, আতঙ্কে হতবুদ্ধি এক পশুশাবক। তার গলা শুকিয়ে গেল, প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধতে লাগল। দারোয়ানের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে কখনও ডান দিক থেকে কখনও বা বাঁ দিক থেকে; সেরিওজা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে কখনও সামনে, কখনও বা পেছনে ছোটে। এই ভাবে সে কয়েকবার গেটের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে আবার গা ঢাকা দেয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ফাঁকটার ভেতরে।

অবশেষে সেরিওজা হয়রান হয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ভেদ করে একটা ঠান্ডা, মৃদু মন-কেমন-করা ভাব, সমস্ত রকম বিপদের প্রতি এক নিদারুণ ঔদাসীন্য তাকে পেয়ে বসল। সে

গাছের তলায় বসে পড়ল, তার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর গাছের গঁুড়িতে ঠেকিয়ে চোখ কোঁচকাল। শত্রুর ভারী পায়ে মাড়ানো বালির কিরকির আওয়াজ ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। সেরিওজার কোলে মাথা গঁুজে আর্তো মৃদুস্বরে কিঁউকিঁউ করছে।

সেরিওজার দুপা দূরে দুহাতে ডালপালা ফাঁক করার সড়সড় আওয়াজ উঠল। সেরিওজা আপনার অজ্ঞাতেই চোখ ওপরের দিকে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় আনন্দে অভিভূত হয়ে সে হঠাৎ এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাত্র এখনই তার নজরে পড়ল যে সে যে জায়গায় বসে ছিল, তার উল্‌টো দিকের দেয়ালটা বেশ নিচু, হাত তিনেকের বেশি হবে না। অবশ্য এটা ঠিক যে তার মাথায় গাঁথা ছিল চুনের প্রলেপ দেয়া শিশি-বোতল ভাঙ্গা কাচ। কিন্তু সেরিওজা তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। চোখের পলকে সে আর্তোর দেহ আড়াআড়ি অবস্থায় তুলে ধরল, সামনের দুঠ্যাং দেয়ালে ঠেকিয়ে তাকে খাড়া করিয়ে দিল। বুদ্ধিমান কুকুর সেরিওজার মতলব চমৎকার বুঝে নিল। সে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চটপট দেয়ালের মাথায় উঠে পড়ল, লেজ নাড়িয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ডাক ছাড়ল।

তার পেছন পেছন সেরিওজাও দেয়ালের মাথায় এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাইপ্রেসের সরানো ডালপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক বিশাল কালো মূর্তি। কুকুর আর বালক — দুজনের নমনীয়, ক্ষিপ্র দেহ দ্রুত, আলতোভাবে লাফিয়ে নিচে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ওদের অনুসরণ করে নোংরা জলের তোড়ের মতো বয়ে চলল জঘন্য, তুমুল গালিগালাজ।

দুই বন্ধুর তুলনায় দারোয়ান কম চটপটে ছিল কিনা, বাগানে চক্কর খেয়ে খেয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কিনা কিংবা নেহাৎই হাল ছেড়ে দিয়ে সে পলাতকদের পিছু ধাওয়া করা থেকে ক্ষান্ত হয় তা বলা মুশকিল, তবে সে ওদের আর অনুসরণ করল না। তা সত্ত্বেও ওরা আরও অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল — দুজনেই শক্তিশালী, চটপটে — ছুটছিল যেন মুক্তির আনন্দে পাখা মেলে। পুড্‌ল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বভাবসুলভ চাপল্য ফিরে পেল। সেরিওজা তখনও ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল, আর্তো ইতিমধ্যে পরম পুলকে কান আর ছেঁড়া দড়ি লটপট করতে করতে তার ওপর লাফিয়ে পড়ছিল, ছুটন্ত অবস্থায় কৌশলে বারবার সেরিওজার ঠোঁট চাটার চেষ্টা করছিল।

দিনের শুরুতে যেখানে সেরিওজা দাদুর সঙ্গে খাবার খেয়েছিল কেবল সেই ঝরনার ধারে আসার পর তার হুঁশ ফিরে এলো। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ঠাণ্ডা জলাশয়ে মুখ ঠেকিয়ে কুকুর আর মানুষ বহুক্ষণ ধরে লোভীর মতো গিলতে লাগল টাটকা, সুস্বাদু জল। তারা একে অন্যের গায়ে ঠেলা মারল, হাঁপ ছাড়ার উদ্দেশ্যে মিনিটখানেকের জন্য মাথা ওপরে তুলল — সেই সময় তাদের ঠোঁট বয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল; এরপর আবার নতুন করে তৃষ্ণার তাড়নায় জলাশয়ে মুখ ঠেকাল — ওখান থেকে উঠে আসার সাধ্য ওদের ছিল না। অবশেষে ঝরনা ছেড়ে উঠে পড়ে ওরা যখন সামনে এগিয়ে চলল তখন তাদের টইটম্বুর পেটের ভেতরে জল কলকল, ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলল। বিপদ কেটে গেছে, এই রাতের সমস্ত ভয়াবহতা নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে

গেছে। ঝুপ্‌সি ঝোপঝাড় থেকে এখন ভেসে আসছিল ভোরবেলাকার তাজা ঘাসপাতার ভিজে ভিজে, মিষ্টি গন্ধ। ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে চাঁদের কিরণে উজ্জ্বল ধবধবে পথ দিয়ে চলতে তাদের দুজনেরই হালকা আর খুশি খুশি লাগছিল।

'ঈল্‌দিজ' কফিখানায় ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা হতে সে ধমকের সুরে ফিসফিস করে সেরিওজাকে বলল:

'ইখানে উখানে ঘুমাছিস কেনো রে খোঁকা? ঘুমাছিস কেনো? এঃ-হে-হে, বহুত খারাবি, বহুত খারাবি...'

দাদুকে জাগানোর ইচ্ছে সেরিওজার ছিল না, কিন্তু তার হয়ে এ কাজটা করল আর্তো। মেঝেতে যে সব ঘুমন্ত দেহ স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল তার মাঝখান থেকে সে মুহূর্তের মধ্যে বুড়োকে খুঁজে বার করল। বুড়ো চটকা ভাঙ্গার অবকাশ পেল না — তার আগেই আর্তো ফুর্তিতে কেঁউকেঁউ করতে করতে তার গাল, চোখ, নাকমুখ চাটতে শুরু করে দিল। দাদু জেগে উঠল, পুড্‌লের গলায় দড়ির টুকরো দেখতে পেল, দেখতে পেল তার পাশে ধুলোমাখা অবস্থায় সেরিওজা শুয়ে আছে। তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। ব্যাপারটা ভালো করে জানার উদ্দেশ্যে সে সেরিওজাকে ডাকতে গেল, কিন্তু কিছু বার করতে পারল না। ছেলেটা তখন দুপাশে হাত ছড়িয়ে মুখ সম্পূর্ণ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে।

ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি

বাবুদের বোর্ডিং-স্কুলে



'অপরাধ ও শাস্তি', 'কারামাজভ ভাইয়েরা' ও 'ইডিয়ট' উপন্যাস প্রতিটি সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে পরিচিত। এগুলির রচয়িতা — মহাপ্রতিভাধর কথাশিল্পী ফিওদর মিখাইলভিচ্ দস্তয়েভ্স্কি। দুনিয়ায় সম্ভবত আর কোন লেখক নেই যিনি মানুষের দুঃখকষ্ট, তার ভাবনাচিন্তার গতিবিধি ও তার বিবেকের যন্ত্রণাকে দস্তয়েভ্স্কির মতো এমন তীব্র ও মর্মস্পর্শী রূপে প্রকাশ করেছেন। দস্তয়েভ্স্কির কোন গ্রন্থই বোঝার পক্ষে তেমন সহজ নয়, সেগুলি 'প্রাপ্তবয়স্ক'।

কিন্তু তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই এমন কিছু কিছু পৃষ্ঠা আছে যেগুলি লেখক স্বয়ং তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে আর তার বন্ধুদের পড়ে শোনান। ঐ সব অংশ তাদের মনে তীব্র আবেগ ও অনুভূতি জাগ্রত করে। দস্তয়েভ্স্কির ইচ্ছে ছিল অবকাশকালে নিজের গ্রন্থ থেকে শিশুদের বোধগম্য এ ধরনের অংশ সংগ্রহ করে পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। তিনি নিজে সে কাজ করে উঠতে পারেন নি। ৬০ বছর বয়সে, ১৮৮১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। কেবল তার দু বছর বাদে প্রকাশিত হয় দস্তয়েভ্স্কির রচনাবলী থেকে সংগৃহীত অংশের সঙ্কলনগ্রন্থ — 'ছোটদের দস্তয়েভ্স্কি'। 'বড়দিনে খ্রীস্টের বালক অতিথি' ও 'চাষী মারেই' গল্প এবং 'কিশোর', 'নেতোচ্কা নেজ্ভানোভা', 'অপরাধ ও শাস্তি' ও 'কারামাজভ ভাইয়েরা' থেকে অংশ উক্ত সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পর থেকে দস্তয়েভ্স্কির গ্রন্থটি বহুবার প্রকাশিত হয়।

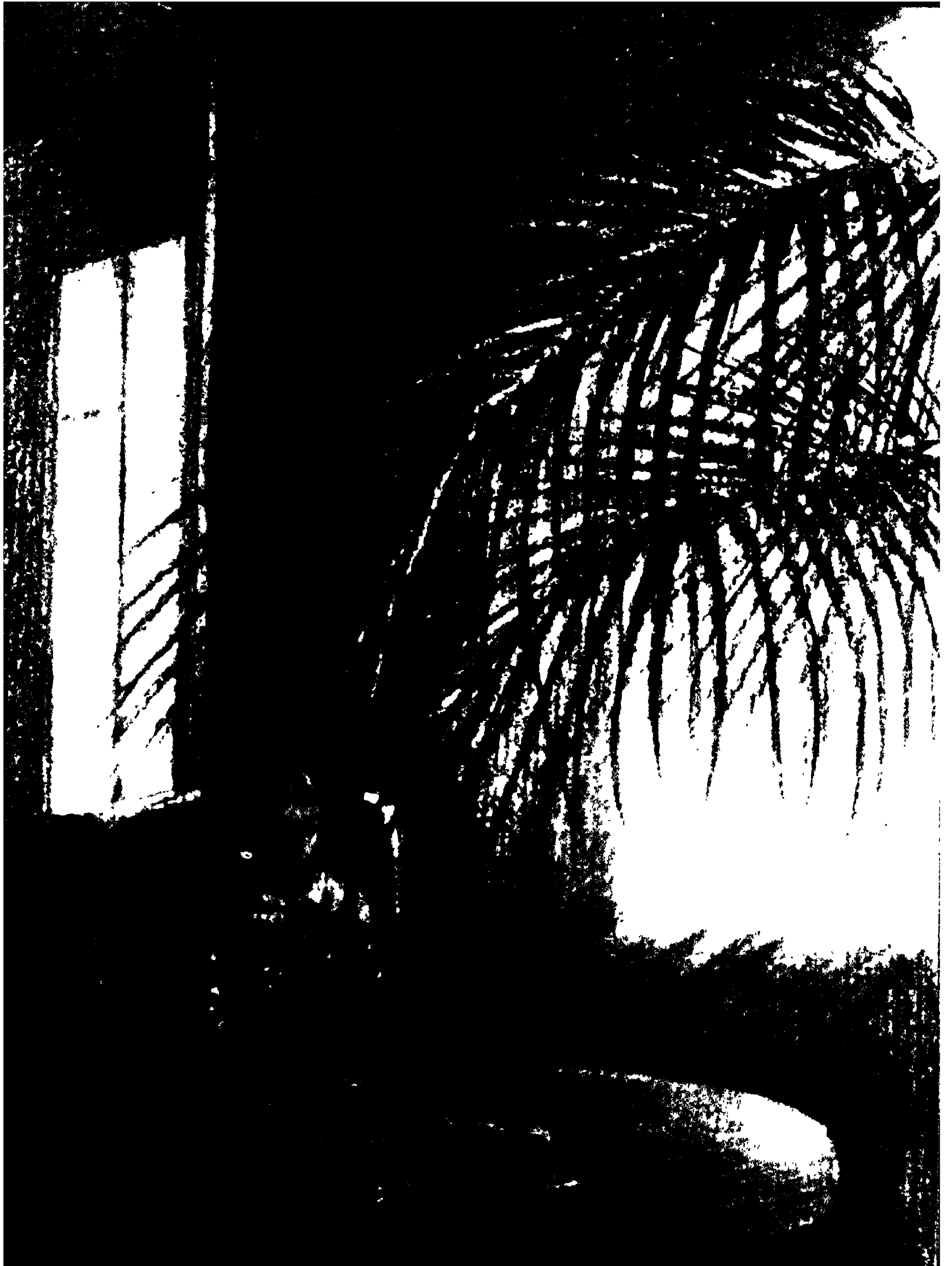
ছোটদের মন দস্তয়েভ্স্কির চমৎকার জানা ছিল। ছেলেবেলা সম্পর্কে নিজস্ব স্মৃতি তাঁর কাছে যথেষ্ট বলে মনে না হতে তিনি বন্ধুকে অনুরোধ জানাচ্ছেন: '...শিশুদের কথা, তাদের সম্পর্কে নিজে যা জানেন, আমাকে লিখে পাঠান . (ঘটনা, স্বভাব, উত্তর, কথা ও বুলি, বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক রূপ, বিশ্বাস, নষ্টামি ও সারল্য, প্রকৃতি ও শিক্ষক, লাতিন ভাষা)...' শিশুদের প্রতি নিজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ওদের পর্যবেক্ষণ করি, সারা জীবন পর্যবেক্ষণ করেছি, অগাধ ভালোবেসেছি...'

তবে এই সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো ভাষায় প্রকাশ করেছে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের এক বয়স্ক নায়ক: 'বিনা অপরাধে নির্যাতিত শিশুর এক ফোঁটা চোখের জলের জন্য আমি স্বর্গের ছাড়পত্র সসম্মানে ফিরিয়ে দিই।'

'অসহায় প্রাণীর প্রতি প্রতিটি অনাদর, তার প্রতিটি অশ্রুকণার জন্য যিনি কষ্ট পান, শিশুদের প্রতি একমাত্র সেরকম একজন মানুষের সুগভীর ভালোবাসাই লেখককে এই কথাগুলি বলে দিতে পারে।' ১৯৭১ সনে লেখকের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'ছোটদের দস্তয়েভ্স্কি' নামে যে সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় খ্যাতিমান আধুনিক কবি সের্গেই মিখাল্কোভ্ এই মন্তব্য করেন। উক্ত সঙ্কলন থেকেই গৃহীত হয়েছে 'বাবুদের বোর্ডিং-স্কুলে' গল্পটি। এই কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরে অভিজাত পরিবারের শিশুদের এক শহুরে বোর্ডিং-স্কুলের চিত্র — যেখানে জনৈক জমিদার ও এক কৃষক রমণীর 'অবৈধ' সন্তান শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে মর্মে মর্মে অনুভব করে অধিকারভোগী 'সমাজে' অনুগ্রহপূর্বক গৃহীত এক মানুষের লাঞ্ছনা।



ঢং ঢং শব্দে মাপা দুই — এমন কি তিন সেকেন্ড অন্তর অন্তর সজোরে ঘণ্টা বেজে চলল। তবে, এটা কোন বিপদসঙ্কেত নয়, কোন এক মধুর, স্নিগ্ধ ঘণ্টাধ্বনি। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে এ ত পরিচিত আওয়াজ! বাজছে আমাদের বোর্ডিং-স্কুলের উল্টো দিকে সেণ্ট নিকোলার লাল গির্জাটায়। বহু চূড়া, মিনার আর কারুকাজে শোভিত এই গির্জা — মস্কোর প্রাচীন গির্জা, আমার যতদূর মনে হয়, সে-ই আলেক্সেই মিখাইলভিচের আমলে তৈরী। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, এখন সবে ঈস্টারের পর্ব শেষ হয়েছে এবং তুষারদের বাড়ির সামনের বাগানে সরু সরু বার্চগাছগুলিতে এখনই সবুজ কচিপাতার কাঁপন শুরু হয়েছে। বিকালের উজ্জ্বল সূর্য আমাদের ক্লাসঘরে তার তির্যক কিরণ ঢেলে দিচ্ছে, এদিকে বাঁ দিকের ছোট্ট যে ঘরটিতে এক বছর আগেই 'কাউন্ট আর সিনেটরদের ছেলেদের' থেকে পৃথক করে তুষার আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেখানে বসে আছে এক অতিথি। হ্যাঁ, আত্মীয়স্বজনহীন আমার কাছে হঠাৎই আগমন ঘটেছে অতিথির — তুষারদের এখানে যতকাল আছি, তার মধ্যে এই প্রথম। অতিথিটি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে চিনতে পারলাম — আমার মা, যদিও গ্রামের গির্জায় সে যখন আমার মুখে প্রসাদ দেয়, আর একটা পায়রা সে সময় গম্বুজের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তার পর থেকে আমি তাকে একটি বারও দেখি নি। আমরা দুজনে বসে রইলাম, আমি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। পরে, এর বহু বছর বাদে আমি জানতে পারি যে তখন... যাদের তত্ত্বাবধানে সে





ছিল, তাদের প্রায় অলক্ষ্যে, বিনা অনুমতিতে, নিজের যৎসামান্য সঙ্গতি ব্যয় করে সে মস্কোয় এসেছিল, আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে তুষারের সঙ্গে কথা বলে, প্রবেশ করার পর সে আমাকে কিন্তু একবারও একথা বলল না যে সে আমার মা। সে আমার পাশে বসে রইল, আমার এ-ও মনে আছে যে সে এত কম কথা বলছে দেখে আমার অবাকই লাগছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি পুঁটলি, পুঁটলিটি সে খুলল — তার ভেতরে ছিল ছয়টি কমলালেবু, কয়েকটা কেক আর দুটো সাধারণ ফরাসী রুটি। ফরাসী রুটি দেখে আমার রাগ হল, আমি অপমানিত হওয়ার ভঙ্গিতে তাকে জবাব দিলাম, আমাদের এখানকার খাওয়া-দাওয়া খুবই ভালো এবং আমাদের প্রতিদিন চায়ের সঙ্গে আস্ত একটা ফরাসী পাঁউরুটি দেওয়া হয়।

'তা হোক গে বাছা, আমি আমার সরল বুদ্ধিতে ভেবেছিলাম, ওদের ওখানে, ইস্কুলে হয়ত খারাপ খাওয়ায়। ক্ষমা করে দে, রাগ করিস নে মানিক আমার।'

'আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না (তুষারের স্ত্রী) কিন্তু অপমান বোধ করবেন। বন্ধুরাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে...'

'তা হলে নিবি না বলছিস? হয়ত খেয়ে দেখবি, কী বলিস?'

'আচ্ছা, রেখে যাও...'

তার দেওয়া খাবারগুলো কিন্তু আমি স্পর্শও করলাম না। কমলালেবু ও কেক আমার সামনে টেবিলের ওপর পড়ে রইল, এদিকে আমি বসে থাকলাম চোখ নামিয়ে, তবে বড় রকমের ভাবভঙ্গি করে নিজের মর্যাদা বজায় রাখছিলাম। কে জানে, এমনও হতে পারে যে এ অভিপ্রায়ও তার কাছ থেকে গোপন না রাখার বড় ইচ্ছে আমার ছিল যে তার ভিজিট বন্ধুবান্ধবের সামনে অবধি আমাকে লজ্জায় ফেলে দেয়; বিন্দুমাত্রও যদি এটা তাকে দেখানো যায়, যাতে সে বুঝতে পারে! ভাবটা এই যে 'দেখতে পাচ্ছ না তুমি আমার মুখে চুনকালি দিচ্ছ, অথচ নিজের সে বোধও নেই!' আমার তখন এমন অবস্থা যে তুষারের পোষাক বুরুশ করতে পারলে বর্তে যাই! মনে মনে এ-ও কল্পনা করতে লাগলাম, মা চলে যাওয়া মাত্র ছেলেদের কাছ থেকে, হয়ত বা স্বয়ং তুষারের কাছ থেকেই কি ঠাট্টাবিদ্রূপই না শুনতে হবে! তাই আমার মনে তার প্রতি সহানুভূতির ছিটেফোঁটামাত্র ছিল না। আমি কেবল আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম তার পরনের কালো পুরনো পোশাক, প্রায় খেটে খাওয়া মানুষের মতো তার রীতিমতো কর্কশ হাত জোড়া, একেবারেই বদখত তার পায়ের জুতো, আর দারুণ রোগা মুখ। তার কপালে এখনই ফুটে উঠেছে বলিরেখা, যদিও পরে, সন্ধেবেলায়, সে চলে যাবার পর আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না আমাকে বললেন, 'তোমার মা এককালে দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না মনে হয়।'

এই ভাবে আমরা বসে ছিলাম, এমন সময় আগাফিয়া ট্রে-তে করে এক কাপ কফি নিয়ে প্রবেশ করল। তখন টিফিনের সময়, তুষাররা রোজই এই সময়টায় তাঁদের বৈঠকখানায় কফি পান করতেন। মা ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু কাপ নিল না। পরে আমি জানতে পারি যে তখন মা কফি

একেবারেই পান করত না, কেননা তাতে তার বুকের ধড়ফড়ি বেড়ে যেত। ব্যাপারটা এই যে তার আগমন এবং আমাকে দেখার জন্য অনুমোদনকে তুষাররা সম্ভবত তাঁদের তরফ থেকে অসীম কৃপা বলে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন, তাই মাকে যে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল বলতে গেলে মানবিক আচরণেরই নিদর্শন, তুলনা করে বলা যেতে পারে যা তাঁদের সভ্য অনুভূতিতে ও ইউরোপীয় ধারণায় অসাধারণ সম্মানজনক। আর মা যেন ইচ্ছে করেই প্রত্যাখ্যান করল।

তুষারের কাছে আমার ডাক পড়ল, তিনি আমাকে বললেন আমি যেন আমার সমস্ত বইখাতা নিয়ে গিয়ে মাকে দেখাই — 'যাতে উনি দেখতে পারেন আমার প্রতিষ্ঠানে তুমি কতটা কী রপ্ত করতে পেরেছ।' এই সময় আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্না ঠোঁট বাঁকিয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়ে, পরিহাসের ভঙ্গিতে তাঁর তরফ থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে আমাকে বললেন:

'আমাদের কফি তোমার মার পছন্দ হয় নি দেখছি।'

ক্লাসরুমে তখন 'কাউন্ট আর সিনেটরদের ছেলেদের' ভিড় জমে গেছে, তারা আমাকে আর মাকে উঁকি মেরে দেখছে। আমি একগাদা খাতা যোগাড় করে নিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম মা যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে। তুষারের আদেশ হুবহু অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমার কিন্তু ভালোই লাগছিল। আমি প্রণালী অনুযায়ী আমার খাতা খুলে খুলে ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলাম: 'এই এটা হল ফরাসী ব্যাকরণের পড়া, আর এটা — ডিক্টেশনের কাজ। এই যে এখানে — avoir ও être সহকারী ধাতুর রূপ, এখানে আছে ভূগোলের ওপর, ইউরোপের প্রধান প্রধান শহর আর পৃথিবীর সমস্ত অংশের বর্ণনা,' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সুবোধ বালকের মতো চোখ নামিয়ে গরগর করে কচি কচি গলায় আধঘণ্টা, কিংবা তার বেশিক্ষণও হতে পারে — ব্যাখ্যা করলাম। আমি জানতাম যে পড়াশোনার বিষয় মা কিছুই বোঝে না, এমনও হতে পারে যে লিখতে অবধি পারে না, আর এখানেই নিজের ভূমিকাটা আমার বেশ লাগছিল। কিন্তু আমি তাকে ক্লান্ত করতে পারলাম না — সে আমাকে বাধা না দিয়ে এত বেশি মনোযোগ দিয়ে, এমন কি গদগদ হয়ে বরাবর শুনে যেতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আমার নিজেরই মহা বিরক্তি ধরে গেল, আমি থামলাম। তবু তার দৃষ্টি ছিল বিষণ্ণ, আর মুখে কেমন একটা করুণ ভাব।

শেষ পর্যন্ত সে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল। এমন সময় স্বয়ং তুষার এসে প্রবেশ করলেন, বোকা-বোকা গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন নিজের ছেলের সাফল্যে সে সন্তুষ্ট কিনা। মা অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করতে আর কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করল। আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্নাও এগিয়ে এলেন। মা তাঁদের দুজনের কাছেই অনুরোধ জানাল, 'বেচারা অনাথটাকে দেখবেন। এখন আর ও অনাথ ছাড়া কী? আপনারা ওকে দয়া করুন...' এই বলে সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁদের দুজনকেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, জানাল দুজনকে আলাদা আলাদা করে, দুজনের প্রত্যেককেই গভীর শ্রদ্ধা — যেমন জানিয়ে থাকে অতি সাধারণ লোকে, যখন তারা আসে হোমরা চোমরা মানুষের কাছে কোন আর্জি নিয়ে। তুষাররা এর জন্য মোটেই

প্রস্তুত ছিলেন না, আর আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না সম্ভবত নরম হলেন এবং বলাই বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে কফির ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে ফেললেন। তুষার আরও গাম্ভীর্য নিয়ে, মানবতা দেখিয়ে জবাব দিলেন যে 'শিশুদের তিনি ভেদাভেদ করেন না, এখানে সকলেই তাঁর সন্তান, আর তিনি হলেন ওদের পিতা, তিনি বলতে গেলে সিনেটর ও কাউণ্টের ছেলেদের সঙ্গে আমাকে প্রায় সমান করে দেখেন—এর মূল্য দেওয়া উচিত...' ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা কেবল মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল, একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়ল, শেষে ছলছল চোখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'চলি রে বাছা আমার!'

এই বলে সে আমাকে চুমু খেল, মানে, আমি চুমু খেতে অনুমতি দিলাম। বোঝা যাচ্ছিল যে আমাকে আরও, আরও চুমু খাওয়ার, আলিঙ্গন করার, বুকে চেপে ধরার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু লোকজনের সামনে সংকোচবশতই হোক, কিংবা অন্য কোন কারণে তিক্ততার দরুনও হতে পারে, অথবা ইতিমধ্যে আঁচ করলেও করতে পারে যে আমি তার জন্য লজ্জায় মরে যাচ্ছি — যা-ই হোক, সে কেবল দ্রুত আরও একবার তুষারদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

'Mais suiver donc votre mère,' অন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না বললেন, 'il n'a pas de coeur cet enfant!'*

জবাবে তুষার কাঁধ ঝাঁকাল; বলাই বাহুল্য, যার অর্থ হল, 'সাধে কি আর আমি ওর সঙ্গে চাকরবাকরের মতো আচরণ করি।'

আমি বাধ্য ছেলের মতো মার পেছন পেছন নেমে এলাম। আমরা দেউড়িতে বেরিয়ে এলাম। আমি জানতাম যে ওরা সকলে এখন ওখানে জানলা দিয়ে দেখছে। মা গির্জার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তিনবার মাথা নুইয়ে তার উদ্দেশে ক্রুশ করল, তার ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল, ঘণ্টা-মিনার থেকে গম্ভীর ঘণ্টা সুরেলা, মাপা মাপা আওয়াজ তুলে গমগম করছিল। মা আমার দিকে মুখ ফেরাল, নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না, দু হাত আমার মাথায় রেখে মাথার ওপরে অঝোরে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিল।

'মা-মণি, যথেষ্ট হয়েছে... লজ্জা করছে... ওরা এখন জানলা থেকে দেখছে যে...'

মা ঝটকা মেরে সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'ওঃ ভগবান... ভগবান তোর সহায় হোন... স্বর্গের দেবদূত, পবিত্র মেরীমাতা আর সন্ত নিকোলাই তোকে রক্ষা করুন... প্রভু, প্রভু!' এক নিশ্বাসে সে আওড়াল, বারবার আমাকে ক্রুশ করতে লাগল, বারবার চেষ্টা করতে লাগল ঘন ঘন, আরও বেশি করে আমার ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকার, বলল, 'সোনা আমার, মানিক আমার! একবারটি দাঁড়া, সোনা...'

সে তাড়াতাড়ি নিজের জামার ভেতরে হাত গলিয়ে একটা রুমাল বার করল — নীলরঙের

* মাকে এগিয়ে গিয়ে বিদায় জানিয়ে এসো... কী নিষ্ঠুর ছেলে রে বাবা! (ফরাসী)

চেককাটা র‍ুমাল, তার এক প্রান্তে শক্ত করে গি'ট বাঁধা। গি'টটা সে খ‍ুলতে গেল... কিন্তু খ‍ুলতে পারল না।

'যাক গে, র‍ুমালসম্মুদ্ধই নিয়ে নে। র‍ুমালটা পরিষ্কার আছে, কাজে লেগে যাবে, ওখানে বোধহয় চারটে সিকি আছে, তোর দরকার হতে পারে, কিছ‍ু মনে করিস না, সোনা, এর বেশি ত আর আমার সামর্থ্য নেই... কিছ‍ু মনে করিস না, বাছা।'

র‍ুমালটা আমি নিলাম। আমার বলার ইচ্ছে ছিল যে তুষারবাব‍ু ও আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কৃপায় আমাদের ভরণপোষণের খ‍ুবই ভালো ব্যবস্থা আছে, আমাদের কোন কিছ‍ুর অভাব নেই। তবে, সামলে নিলাম, র‍ুমালটা নিলাম।

শেষ পর্যন্ত সে চলে গেল। কমলালেব‍ু ও কেকগ‍ুলো আমি আসার আগেই সিনেটর ও কাউন্টদের ছেলেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, আর সিকি চারটে তৎক্ষণাৎ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল ল্যাম্বার্ট। তা দিয়ে ওরা মিষ্টি পিঠে ও চকোলেট কিনল, আমাকে দিল না পর্যন্ত।

প‍ুরো ছয় মাস কেটে গেছে। এখন শ‍ুর‍ু হয়েছে ঝড়ো হাওয়া আর বর্ষণম‍ুখর অক্টোবর। মা'র কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। ওঃ, ইতিমধ্যে একটা ঘৃণা, সব কিছ‍ুর প্রতি একটা চাপা আক্রোশ হৃদয়ে বাসা বে'ধেছে, তাকে সম্প‍ূর্ণ পরিষিক্ত করেছে। আমি আগেকার মতোই তুষারের পোষাক ব‍ুর‍ুশ করছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে সর্ব শক্তিতে ঘৃণা করতে শ‍ুর‍ু করেছি, আর সে ঘৃণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ঠিক এই সময়, বিষণ্ণ গোধ‍ূলিবেলায়, একদিন আমি, কেন মনে নেই — আমার ড্রয়ার হাতড়াতে শ‍ুর‍ু করেছিলাম, হঠাৎ এক কোণে দেখতে পেলাম তার দেওয়া নীল কেম্ব্রিক কাপড়ের র‍ুমাল; সে-ই যে আমি ওটাকে ওখানে গ‍ু'জে রেখেছিলাম তখন থেকে তা ঐ ভাবেই পড়ে রয়েছে। র‍ুমালটা বার করে নিয়ে আমি বেশ কিছ‍ুটা কৌতূহলভরেই তাকে নিরীক্ষণ করলাম — র‍ুমালের প্রান্তে এখনও প‍ুরোপ‍ুরি রয়ে গেছে আগেকার গি'টের চিহ্ন, এমন কি পয়সা গ‍ু'জে রাখার দর‍ুন যে গোল ছাপ পড়েছিল তা-ও স্পষ্ট। আমি অবশ্য র‍ুমালটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করে দিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল উৎসবের আগে আগে, সান্ধ্য প্রার্থনার ঘণ্টাও বেজে উঠল। ছাত্ররা ততক্ষণে দ‍ুপ‍ুরের খাবার পরই যে যার বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু এবারে ল্যাম্বার্ট রবিবারেও থেকে গেল, কেন জানি না, তাকে নিতে কেউ এলো না। ও যদিও আমাকে তখনও আগের মতোই মারধর করত, তব‍ু ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে বেশ ভালোমতো মেলামেশা শ‍ুর‍ু করে দিয়েছে, আমিও ওর কাছে দরকারী হয়ে পড়ি। সারাটা সন্ধ্যা ধরে আমাদের যে কথাবার্তা চলল তার বিষয় হল লেপাজ পিস্তল, যা আমাদের দ‍ুজনের কেউই দেখে নি, কথা হল চেরকেসীয় তলোয়ার সম্পর্কে, তা দিয়ে কেমন কোপ মারা যায় এবং ডাকাতের দল গড়ে তুলতে পারলে কী ভালোই না হয় — এই নিয়ে। দশটার সময় আমরা ঘ‍ুমাতে গেলাম। আমি আপাদমস্তক লেপ ম‍ুড়ি দিলাম, বালিশের তলা থেকে টেনে বার করলাম নীল র‍ুমালটা। কেন জানি না, এক ঘণ্টা আগে আমি ওটার জন্য ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াই এবং আমাদের বিছানা পাতার সঙ্গে সঙ্গে তা বালিশের নিচে গ‍ু'জে রাখি। আমি এখন র‍ুমালটা আমার ম‍ুখের ওপর চেপে

ধরলাম, আর হঠাৎই ওটাকে চুমু খেতে লাগলাম। 'মা, মা,' স্মরণ করতে করতে আমি ফিসফিস করে বললাম, সমস্ত বুক কে যেন চেপে ধরেছে, যেন জড়িয়ে ধরেছে পাক দিয়ে। চোখ বন্ধ করতে আমি দেখতে পেলাম তার মুখ—তার ঠোঁটজোড়া থরথর করে কাঁপছিল যখন সে ক্রুশ করল গির্জার উদ্দেশে, তারপর আমার ওপরও ক্রুশ করল, আর আমি তাকে বললাম, 'লজ্জা করছে, ওরা দেখছে।' 'মা, মা-মণি গো, জীবনে একবারই ত তুমি আমার কাছে এসেছিলে! মা-মণি, কোথায় এখন তুমি, আমার দূরের অতিথি? এখন কি তোমার মনে আছে নিজের অভাগা ছেলেটাকে, যার কাছে তুমি এসেছিলে? এখন অন্তত একটিবার দেখা দাও, অন্তত স্বপ্নে হলেও দেখা দাও, যাতে আমি কেবল এই কথাটা তোমাকে বলতে পারি যে তোমাকে কী ভালোই না বাসি! যাতে তোমাকে কেবল জড়িয়ে ধরতে পারি, তোমার ঐ নীল চোখে চুমু দিতে পারি, তোমাকে বলতে পারি যে এখন আর তোমার জন্য একেবারেই লজ্জা বোধ করি না, আর তোমাকে আমি তখনও ভালোবাসতাম, তখন আমার কলজেটা ব্যথায় টনটন করছিল, কিন্তু আমি কেবল বসে ছিলাম এক বশংবদ ভৃত্যের মতো। তুমি কখনই জানতে পারবে না, মা, তখন আমি তোমাকে কত ভালোবাসতাম! মা-মণি, কোথায় তুমি এখন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি? মা, মা গো, মনে আছে সেই গাঁয়ের কথা?..'

দ্‌মিত্রি গ্রিগোরোভিচ্‌

সার্কাসের ছেলে



সমগ্র রুশ শিশুসাহিত্যে 'সার্কাসের ছেলে' সম্ভবত সবচেয়ে করুণরসের গল্প। ১৮৮৩ সনে গল্পটি লেখেন ভূমিদাস প্রথার যুগের দৈনন্দিন রুশ জীবনযাত্রার অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার — দ্মিত্রি ভাসিলিয়েভিচ্ গ্রিগোরোভিচ্। তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে নিজের শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

গ্রিগোরোভিচের জন্ম ১৮২২ সনে। তাঁর পিতা ছিলেন রুশ জমিদার। অতি শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। দ্মিত্রির মা ছিলেন ফরাসী মহিলা। তিনি রুশভাষা জানতেন না, পারিপার্শ্বিক জীবন ছিল তাঁর অজানা। নিজের পুত্রের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধির কোন যোগসূত্র ছিল না। বালক মানুষ হয় পিতার বৃদ্ধ ভূমিদাস ভৃত্য নিকোলাই খুড়োর তত্ত্বাবধানে। 'আমার শৈশবজীবনের সমগ্র নিরুত্তাপ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে একমাত্র নিকোলাইয়ের সঙ্গে থেকেই আমি উত্তাপ বোধ করেছি,' পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে গ্রিগোরোভিচ্ বলেন।

নির্দয় বেকারের স্বেচ্ছাচারিতার হাতে, সার্কাস দর্শনার্থী অন্নপরিতৃপ্ত ও অলস জনতার তামাসা উপভোগের জন্য ভাগ্য যাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই খুদে সার্কাস খেলোয়াড়ের কাহিনীটি নিঃসঙ্গতার শীতলতা, পিতৃমাতৃহীনতা, আশ্রয়হীনতা ও অসহায়তার অসহনীয় অনুভূতিতে পরিকীর্ণ।



১

রিং মাস্টার বেকারের তালিম পাওয়া ছেলেটি 'গাটাপার্চার ছেলে' নামে চলত কেবল বিজ্ঞাপনে; তার আসল নাম ছিল পেতিয়া, তবে তাকে হতভাগ্য ছেলে নাম দিলেই বোধহয় ঠিক হত।

তার জীবনকাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত, অবশ্য দীর্ঘ আর জটিল হবেই বা কোত্থেকে, যখন সে সবে আটে পড়েছে!

পাঁচ বছর বয়সে সে তার মাকে হারায়, তাহলেও মা'র কথা তার বেশ মনে আছে। এখনও ওর চোখের সামনে ভাসে এক রোগা মহিলার চেহারা — হালকা রঙের পাতলা চুল, চুল তার সব সময় আলুথালু; কখনও সে হাতের সামনে যা পাচ্ছে — পেঁয়াজ, পিঠের টুকরো, হেরিং মাছ, রুটি — সব কিছু আদর করে ওর মুখে পুরে দিচ্ছে, কখনও বা হঠাৎই কারণে-অকারণে ওর ওপর ঝাঁজিয়ে উঠছে, চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে যা হাতে ঠেকে তাই দিয়ে ওর গায়ের যেখানে সেখানে দুমদাম মেরে চলেছে। তা সত্ত্বেও মা'র কথা পেতিয়ার প্রায়ই মনে পড়ত।

পেতিয়ার স্মৃতিগুলির মধ্যে মা'কে কবর দেওয়ার দিনটিও আছে...

জানুয়ারীর ভয়ঙ্কর সকাল। মেঘলা নিচু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি শুকনো বরফ। দমকা হাওয়ার তাড়নায় সে বরফ চোখেমুখে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিয়ে ঢেউ তুলে উড়ে চলেছে জমাট পথের ওপর দিয়ে। দিদিমা আর ভারভারা ধোপানীর মাঝখানে থেকে কফিনের পেছনে





চলতে চলতে পেতিয়া অনুভব করছিল হাত-পায়ের আঙ্গুলে অসহ্য চিনচিনে যন্ত্রণা। তায় আবার অমনিতেই সহযাত্রিণীদের সঙ্গে তাল রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ওর গায়ের পোশাক যোগাড় হয়েছে দৈবাৎ — দৈবাৎ মিলে যায় হাই বুট, যা তার পায়ে এত আল্‌গা হয়ে ঢলঢল করছে যে মনে হয় সে বুঝি নৌকোয় পা দিয়েছে; জামাটাও দৈবাৎ — ওটার পেছনের ঝুল তুলে কষির সঙ্গে টাঁক না দিলে পরা সম্ভব হত না; মাথায় টুপি — সে-ও দৈবাৎ, চেয়ে নেওয়া হয়েছে চৌকিদারের কাছ থেকে; টুপিটা অনবরত চোখের ওপর নেমে আসার ফলে পথ দেখতে পেতিয়ার অসুবিধা হচ্ছিল।

কবরখানা থেকে ফিরতি পথে, ছেলেটাকে নিয়ে এখন কী করা যায় এ ব্যাপারে দিদিমা ও ভারভারা অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। কার কাছে যাওয়া যায়? আর, কথাটা হল, কে ছুটাছুটি ও চেষ্টা-চরিত্র করবে?

এ বাড়ি সে বাড়ি, এই বুড়ি সেই বুড়ির কাছে করে ছেলেটার জীবন কাটতে লাগল। ভারভারা ধোপানী মাঝখানে এসে সাহায্য না করলে ওর ভাগ্যে যে কী ঘটত তা বলা যায় না।

ভারভারা ধোপানী থাকত মখোভায়া স্ট্রীটের বিরাট এক বাড়ির দ্বিতীয় আঙ্গিনায়, মাটির তলার ঘরে। ঐ একই আঙ্গিনায়, কেবল আরও ওপরে, এসে উঠেছিল পাশের সার্কাস দলের কয়েকজন লোক। ওরা একপাশে অন্ধকার করিডর দিয়ে জোড়া একসারি ঘর দখল করে ছিল। ওদের সকলের সঙ্গেই ভারভারার ভালোমতো জানাশোনা ছিল, কেননা সে সব সময় ওদের জামাকাপড় কাচত। ওদের কাছে যাওয়ার সময় সে প্রায়ই পেতিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। ওর জীবনকাহিনী কারও অজানা ছিল না; সকলেই জানত যে ছেলেটা সম্পূর্ণ অনাথ, তার তিনকুলে কেউ নেই। ভারভারা বহুবার কথায় কথায় এমন ভাবনাও প্রকাশ করেছে যে বাবুদের মধ্যে কেউ যদি কৃপা করে অনাথ ছেলেটিকে তালিম দিতে নিতেন তাহলে ভালো হত। কিন্তু কেউই রাজী হয় না; কারণ সম্ভবত এই যে নিজের নিজের ঝামেলার কারও কোন কমতি নেই। তবে একজন মুখে হ্যাঁ না কিছুই বলে না। কিছু কাল যেতে সে ছেলেটিকে এক দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এই লোকটি হল রিং মাস্টার বেকার।

আন্দাজ করা যেতে পারে যে এই বিষয় নিয়ে ভারভারা আর ঐ লোকটার মধ্যে একই সময়ে গোপন এবং বেশ পরিষ্কার কোন সলাপরামর্শ হয়ে থাকবে, কেননা একদিন, তক্কে তক্কে থাকার পর, যখন দেখা গেল সব বাবুরা মহলায় চলে গেছে এবং ফ্ল্যাটে কেবল বেকার আছে, তখন ভারভারা তাড়াতাড়ি করে পেতিয়াকে নিয়ে ওপরে চলে এলো, তাকে সঙ্গে নিয়ে সটান রিং মাস্টারের ঘরে ঢুকে গেল।

বেকার ঠিক যেন কারও অপেক্ষায়ই ছিল। সে চেয়ারে বসে চীনেমাটির ফরসীতে তামাক টানছিল। ফরসীর নলটা বাঁকা, আর তার এখানে ওখানে লটকানো ছিল টাসেল। লোকটার মাথায় শোভা বর্ধন করছিল পুঁতির কাজ করা চ্যাপ্টা টুপি। টুপিটা কাত করে পরা। তার সামনে টেবিলের ওপর ছিল বীয়ারের তিনটি বোতল—দুটি খালি, একটি সবে ধরা হয়েছে।

রিং মাস্টারের থমথমে ভারী মুখ আর তার ষাঁড়ের মতো মোটা গর্দান লাল টকটক করছে। চোখেমুখে আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন আর হাবভাব দেখে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে এমন কি এখানে, নিজের বাড়িতে পর্যন্ত বেকার তার সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

'এই যে কার্ল বগ্‌দানভিচ্... এই যে ছেলেটা!..' পেতিয়াকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ভারভারা বলল।

'বহুত আচ্ছা,' রিং মাস্টার বলল, 'লেকিন এতে হোবে না; খোঁকার কামিজ-পেন্টলুন খুলতে হোবে...'

পেতিয়া এ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ভয়ে ভয়ে আড়চোখে বেকারকে দেখছিল। শেষ কথাটা কানে যাওয়া মাত্র সে পিছে হেলে পড়ে ধোপানীর আঁচল শক্ত করে চেপে ধরল। কিন্তু বেকার আবার সেই একই দাবি জানাতে ভারভারা যখন পেতিয়ার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে তার পোশাক খুলতে গেল তখন সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল, বাবুর্চির ছুরির নিচে মুরগীর বাচ্চার যেমন অবস্থা হয়, সেই ভাবে চিৎকার করতে করতে সে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

'কী হল রে? কী বোকা রে বাবা! ভয় পাওয়ার কী আছে?.. জামা-প্যান্ট খোল বাপ, খোল... ভয়ের কিচ্ছু নেই... দেখ দেখি, কী বোকা!' ছেলেটার মুঠোর আঙুলগুলো খোলার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি তার প্যান্টলুনের বোতাম খুলতে খুলতে ধোপানী আওড়াল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই বাগ মানে না: কেন যেন আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে সে পাঁকাল মাছের মতো ছটফট করতে থাকে, গোটা ফ্ল্যাট চিৎকারে মাত করে মোচড় দিয়ে মেঝের ওপর পড়তে যায়। কার্ল বগ্‌দানভিচের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। পাইপটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পেতিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। পেতিয়া যে এখন আগের চেয়েও জোরে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে সে দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে সে চটপট দুহাতে ওকে আঁকড়ে ধরল। পেতিয়া চমক ভাঙতে না ভাঙতে টের পেল যে লোকটা তার হৃষ্টপুষ্ট দুই হাঁটুর মাঝখানে ওকে শক্ত করে চেপে ধরেছে। শেষ এক পলকের মধ্যে সে ওর গা থেকে জামা আর প্যান্টলুন খুলে ফেলল; এর পর খড়কুটোর মতো করে সে পেতিয়াকে তুলে ধরল, আড়াআড়িভাবে হাঁটুর ওপর মাথাটা নামিয়ে রেখে ওর বুক আর দুপাশের পাঁজরা হাত বুলিয়ে দেখতে শুরু করল। যে সব জায়গা তার সঙ্গে সঙ্গে মনঃপূত হচ্ছিল না, সেখানে সে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে দেখছিল, আর ছেলেটা যতবার যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে এই কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল ততবারই সে তাকে চড়চাপড় মেরে চলল।

পেতিয়ার জন্য ধোপানীর কষ্ট হচ্ছিল: কার্ল বগ্‌দানভিচ্ যেন বেশ একটু জোরে জোরেই টেপাটেপি ঠাসাঠাসি করছেন! কিন্তু অন্য দিকে, ছেলেটার পক্ষ নিতেও তার ভয়, কেননা নিজেই ত ওকে নিয়ে এসেছে, আর রিং মাস্টারও কথা দিয়েছেন যে ছেলেটা জুতসই বলে ঠেকলে তাকে তালিমের জন্য নেবেন। পেতিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারভারা ওর চোখের জল মুছে

দিতে লাগল আর বারবার বুঝিয়ে বলতে লাগল যে কার্ল বগ্‌দানভিচ্‌ খারাপ কিছু করবেন না — একবারটি দেখবেন মাত্র!..

কিন্তু রিং মাস্টার যখন ছেলেটাকে আচমকা হাঁটু মুড়ে দাঁড় করিয়ে দিল, ওর পিঠ নিজের মুখোমুখি ঘোরাল এবং ওর কাঁধ পেছন দিকে নোয়াতে নোয়াতে কাঁধের পেছনের দুই হাড়ের মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়ে টিপতে লাগল, যখন বাচ্চাটার হাড়জিরজিরে খালি বুকের পাঁজরাগুলো হঠাৎ ঠেলে সামনের দিকে বেরিয়ে এলো, তার মাথা পেছনের দিকে হেলে পড়ল আর ও নিজে যেন যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেল — তখন ভারভারা আর সামলাতে পারল না; সে ওকে ছাঁড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছুটে গেল। তবে সে কিছু করে উঠতে পারার আগেই বেকার পেতিয়াকে ভারভারার কাছে দিয়ে দিল। তক্ষুনি ছেলেটার সম্বিৎ ফিরে এলো, কান্নায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সে কেবল ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

'যথেষ্ট হয়েছে রে বাবা, যথেষ্ট হয়েছে! দেখলি ত, তোকে কিছুই করা হয় নি!.. কার্ল বগ্‌দানভিচ্‌ তোকে কেবল একটু দেখতে চেয়েছিলেন...' ধোপানী নানাভাবে বাচ্চাটাকে আদর করতে করতে আওড়াল।

ভারভারা আড়চোখে বেকারের দিকে তাকাল: বেকার মৃদু মাথা নাড়িয়ে আরেক গ্লাস বীয়ার ঢালল।

দুদিন বাদে ছেলেটাকে যখন বেকারের হাতে একেবারে দিয়ে দেওয়ার কথা তখন তাকে চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল। ভারভারা তার নিজের টাকায় ওর জন্য নতুন ছিটের শার্ট কিনে এনেছিল। না সেই নতুন শার্ট, না মিষ্টি কেক, না মন ভুলানো কথা, না আদর — কোনটাতেই কিছু কাজ হল না। হস্তান্তরের কাজটি বেকারের ঘরে ঘটছিল বলে পেতিয়ার চেঁচাতে ভয় হচ্ছিল; সে তার চোখের জলে ভাসিয়ে দেওয়া মুখ শক্ত করে ধোপানীর আঁচলে গুঁজে রেখেছিল। কার্ল বগ্‌দানভিচের কাছে ওকে একা ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ধোপানী যতবার দরজার দিকে পা বাড়ায় ততবারই ও জলে পড়ার মতো মরিয়া ভাব নিয়ে তার হাত আঁকড়ে ধরে।

অবশেষে গোটা ব্যাপারটা রিং মাস্টারের মেজাজ বিগড়ে দিল। সে ছেলেটাকে ঘাড়ে ধরে ভারভারার আঁচল থেকে ছাড়িয়ে নিল। ভারভারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্র সে ওকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে সোজা তার চোখের দিকে তাকাতে আদেশ দিল।

পেতিয়া আগের মতোই থরথর করে কাঁপতে লাগল — যেন বিকারের ঘোরে। তার অসুস্থ, রোগা মুখের রেখাগুলো কেমন যেন কুঁচকে গেল, তাতে ফুটে উঠল বুড়োদের মতো জীর্ণ কেমন একটা করুণ-করুণ ভাব।

বেকার ওর থুতনি ধরে নিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধরে আবার সেই আদেশ করল।

'সুন্‌ রে বচ্চা,' পেতিয়ার নাকের সামনে তর্জনী তুলে সে শাসাল, 'ফিন্‌ যদি উধারে চাস,' বলে সে দরজা দেখাল, তারপর পিঠের খানিকটা নিচের দিকে দেখিয়ে বলল, 'তাহলে ইখানে হোবে,

আর জব্বর হোবে! জব্বর হোবে!' ওকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে যেটুকু বীয়ার ছিল তা চুমুক দিয়ে শেষ করতে করতে সে বাকিটা যোগ করল।

ঐ দিন সকালে সে ওকে সার্কাসে নিয়ে এলো। সেখানে তখন কর্মব্যস্ততা ও গোছগাছের ধুম পড়ে গেছে।

পরদিন দলটি তাদের সমস্ত বাক্সপ্যাঁটরা, লোকজন আর ঘোড়ার দঙ্গলসুদ্ধ গ্রীষ্মের মরসুমে রিগায় যাচ্ছে।

প্রথমে নূতনত্ব আর অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তার মনের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার চেয়ে বরং খানিকটা ভয়ই পাইয়ে দিল। সে এক কোনায় লুকিয়ে থেকে একটা ছোট বন্য জন্তুর মতো লক্ষ্য করতে লাগল লোকজন ওর অজানা কী সব জিনিসপত্র টানতে টানতে ওর পাশ দিয়ে ছুটছে। অচেনা ছেলেটির ছাইরঙা চুলে ভর্তি মাথা কারও কারও চোখে পড়ল বটে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো ফুরসৎ কারও ছিল না। তাই সকলেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

দলটির রিগায় যাত্রার দশদিনের পথে পেতিয়াকে ওর নিজের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কামরায় এখন যে সব লোকজন তাকে ঘিরে আছে তাদের আর একেবারে অচেনা বলা যায় না। তাদের মধ্যে অনেককেই সে ভালো করে দেখার অবকাশ পেয়েছে; অনেকে ছিল ফুর্তিবাজ, তারা ঠাট্টা মস্করা করে, গান গায় — ওরা তার মনে ভয়ের উদ্রেক করল না। এমন কি জোকার এডওয়ার্ডসের মতো লোকও মিলল, যে পাশ দিয়ে যেতে যেতে সব সময় তার গালে মৃদু চাপড় মেরে যায়; মহিলাদের মধ্যে একজন ত একবার ওকে কমলালেবুর ভাঙা কোয়া পর্যন্ত দেয়। এক কথায়, সে একটু একটু করে অভ্যস্ত হতে লাগল। কার্ল বগ্দানভিচ্ ছাড়া আর কেউ যদি ওকে নিত তাহলে ওর বড় বড় ভালোই হত। এই লোকটার সঙ্গে ও কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না — তার উপস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে পেতিয়ার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যেত, ওর গোটা শরীর কুঁকড়ে যেত, ও কেবল ভাবত কী করে কান্নাটা আটকানো যায়...

তার পক্ষে বিশেষ করে কঠিন হয়ে দাঁড়াল যখন শুরু হল শিক্ষা। প্রথম দিকে যাচাইয়ের পর বেকারের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ছেলেটি সম্পর্কে তার ভুল হয় নি। পেতিয়া ছিল তুলোর মতো হালকা, তার হাড়ের গাঁটগুলো ছিল নরম। এই সহজাত গুণ পরিচালনা করার মতো শক্তি অবশ্য তার পেশীতে ছিল না, তবে অনুশীলনের ফলে যে ও শক্তি অর্জন করতে পারবে এ বিষয়ে বেকারের সন্দেহ ছিল না। এমন কি সে এখন শিষ্যকে দেখেও এ ব্যাপারে কতকটা নিশ্চিত হতে পারে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেটাকে মেঝের ওপর বসিয়ে সে তাকে মাথা নুইয়ে পায়ে ঠেকানো অভ্যাস করাতে লাগল। এই ভাবে একমাস যেতে পেতিয়া এখন গুরুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কসরৎটি করতে পারে। তার কাছে অসাধারণ কঠিন ঠেকত উল্টো দিকে শরীর বাঁকিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাথার পেছন দিক স্পর্শ করা। তবে একটু করে এতেও সে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করল। সে দৌড়ে এসে চেয়ার ডিঙিয়ে কৌশলে লাফানোও শুরু করেছিল; কিন্তু লাফানোর পর বেকার যখন দাবি করল যে লাফিয়ে চেয়ারের ওপাশে গিয়ে শিষ্যকে পায়ে ভর

দিয়ে মাটিতে না পড়ে পড়তে হবে পাজোড়া শূন্যে তুলে দুহাতে — কেবল তখনই, এই শেষ কাজটাতেই সে ক্বচিৎ সফল হত। পেতিয়া ডিগবাজী খেয়ে পড়ত, পড়ত মুখ থুবড়ে কিংবা মাথার ওপর ভর দিয়ে। এক্ষেত্রে ঘাড়ে চোট লাগারও সম্ভাবনা থাকত। তবে, ব্যর্থতা বা আঘাত ছিল দুর্ভাগ্যের অর্ধেক মাত্র; বাকি অর্ধেক — আরও জবরদস্ত গোছের — কিল-ঘুসি, যা প্রতিবারই বেকারের কাছ থেকে তার জুটত। ছেলেটার পেশীগুলো আগের মতোই রোগা-রোগা রয়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে এগুলোকে রীতিমতো পুষ্ট করে তোলা দরকার।

বেকার যে ঘরে থাকত সেখানে দুদিকে সিঁড়ি লাগানো, ভাঁজ করার উপযোগী মই আনা হল। তার পাশাপাশি দুই সিঁড়ির ওপর আড়াআড়ি, মেঝে থেকে খানিকটা উঁচুতে, পাতা হল হরাইজন্টাল বার। বেকার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেতিয়াকে ছুটতে ছুটতে এসে হাত দিয়ে বার আঁকড়ে ধরতে হবে, তারপর এই ভাবে ঝুলে থাকতে হবে, প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট, পরে দশ — আর এই রকম রোজ কয়েক বার করে অভ্যাস। বৈচিত্র্যটা ছিল এই যে কখনও কখনও স্রেফ ঝুলে থাকতে হত, কখনও বা দুই হাতে বার চেপে ধরে রেখে গোটা ধড়টা পেছনে উল্টে দিয়ে বার আর মাথার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পাজোড়া গলিয়ে দিতে হত। অনুশীলনটির উদ্দেশ্য এই যে পায়ের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বার চেপে ধরে হঠাৎ দুহাত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র পায়ের আঙ্গুলের ডগায় ঝুলে থাকতে হবে। এর প্রধান অসুবিধাটা এখানেই ছিল যে পা ওপরে আর মাথা নিচে থাকা অবস্থায় মুখে অতি মধুর, হাসি-হাসি ভাব বজায় রাখতে হবে; এই শেষ কাজটি করা হত দর্শকদের মনের ওপর ভালো ছাপ ফেলার উদ্দেশ্যে—মাংসপেশীতে টান পড়ার অসুবিধা, কাঁধের হাড়ের জোড়ে যন্ত্রণা আর বুকের খিঁচুনি দর্শকরা যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করতে পারে।

এরকম ফল পাওয়ার আশায় যা করা হত তাতে প্রায়ই শিশুকণ্ঠের এমন মর্মভেদী আর্তনাদ ও চিৎকার-চেঁচামেচি উঠত যে বেকারের বন্ধুরা ছুটে তার ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিত। শুরু হত গালিগালাজ, ঝগড়াঝাঁটি — আর তার পরে পেতিয়ার অবস্থা প্রায়ই আরও শোচনীয় হত। অবশ্য মাঝে মাঝে বাইরের এরকম হস্তক্ষেপের পরিণামে অনেকটা শান্তির ভাবও ফিরে আসত। সেটা হত জোকার এডওয়ার্ডস এলে। সে সচরাচর টুকটাক খাবার আর বীয়ার দিয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা করত। এর পর ওদের মধ্যে বন্ধুভাবে যে কথাবার্তা চলত সেখানে এডওয়ার্ডস বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে বেকারের তালিম দেওয়ার পদ্ধতি কোন কাজের নয়; ভয়-ডর দেখিয়ে, মারপিট করে শিশুদের কাছ থেকে কেন, কুকুর আর বাঁদরকেও তালিম দিয়ে কিছু আদায় করা যায় না; ভয় নিঃসন্দেহে জড়তার উদ্রেক করে, আর জড়তা হল সার্কাসের খেলোয়াড়ের প্রধান শত্রু, কেননা তাতে সে আত্মবিশ্বাস ও সাহস হারায়; এগুলো না থাকলে কেবল টান পড়ে শিরা ছিঁড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা থাকে, ঘাড় মটকে যেতে পারে কিংবা পিঠের শিরদাঁড়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

আর অদ্ভুত কান্ড: প্রতিবার, যখনই কথায় কথায় এবং বীয়ারে উত্তেজিত হয়ে এডওয়ার্ডস

সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে যায় কোন জিনিসটা কী ভাবে করা উচিত, তখনই পেতিয়া দারুণ দক্ষতার সঙ্গে, সোৎসাহে কসরৎগুলো দেখায়।

বেকারের তালিম পাওয়া ছেলেটিকে দলের সবাই এখন চেনে। ইদানীং বেকার পোশাকের আলমারি থেকে তাকে জোকারের পোশাক বার করে দেয়, তার মুখে আচ্ছা করে সাদা রঙের প্রলেপ লাগিয়ে, দুই গালে চটাস চটাস করে রুজের দুই ধ্যাবড়া চক্কর বসিয়ে দিয়ে শো চলার সময় তাকে রিংয়ে নিয়ে যায়। কখনও কখনও পরীক্ষার খাতিরে বেকার আচমকা ওর পা দুটি ওপরে তুলে ধরে, হাতে ভর দিয়ে বালির ওপর দৌড় করায়। সে সময় পেতিয়া নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে, কিন্তু প্রায়ই শক্তি তাকে প্রতারণা করে — হাতে ভর দিয়ে কিছুটা ছুটে যাওয়ার পর হঠাৎ তার দু কাঁধে খিল ধরে যায়, সে বালির মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে যায়, আর তাতে দর্শকদের তুমুল হাসি উদ্রেক করে।

এডওয়ার্ডসের পরিচালনায় সে নিঃসন্দেহে আরও বেশি সফল হতে পারত; বেকারের হাতে, স্পষ্টতই তার ভবিষ্যৎ বিকাশ ঢিমে তালে হচ্ছিল। পেতিয়া সেই প্রথম দিনের মতোই তার গুরুটিকে ডরাতে লাগল। এর সঙ্গে এসে মিশতে শুরু করল অন্য এক অনুভূতি, যা তার বোধের অতীত, কিন্তু তা ধীরে ধীরে তার মধ্যে বেড়ে চলছিল, তার ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছিল, রাতে মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়ে রিং মাস্টারের নাকডাকা শুনতে শুনতে তার বেজায় কান্না পেয়ে যেত।

কিন্তু ছেলেটা যাতে তার সঙ্গে অন্তত কিছুটাও মানিয়ে নিতে পারে তার জন্য বেকার বিন্দুমাত্র গরজ দেখাল না। এমন কি ছেলেটা যখন কোন কসরতে সাফল্য দেখায় সেক্ষেত্রেও বেকার কখনও তাকে মিষ্টিকথা বলে না; নিজের বিশাল ধড়ের উচ্চতা থেকে প্রশ্রয়সূচক দৃষ্টিতে ওর দিকে একটু তাকাত — এর বেশি কিছু নয়। ভারভারা ধোপানী ছেলেটাকে যে দুটো শার্ট দিয়েছিল সেগুলো যে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, নিচের বস্ত্র যে প্রায়ই কোন রকম বদল না করে সে একটানা দু সপ্তাহ গায়ে রাখত, তার ঘাড়ে ও কানে যে জলের কোন স্পর্শ পড়ত না আর তার জুতোজোড়ার সামনের দিকটা যে হাঁ হয়ে গিয়ে রাস্তার নোংরা জল কাচাচ্ছে — এ সবে লোকটার কিছু আসে-যায় না। রিং মাস্টারের বন্ধুরা, বিশেষ করে এডওয়ার্ডস এই নিয়ে প্রায়ই তাকে তিরস্কার করত; জবাবে বেকার অসহিষ্ণু হয়ে শিস দিত আর চাবুক দিয়ে প্যান্টলুনের ওপর চাপড় মারত।

পেতিয়াকে তালিম দিতে সে ছাড়ল না এবং প্রতিবারই কোন রকম ভুলচুক হলে ওকে শাস্তি দিতে লাগল।

একবার দলটি পিটার্সবুর্গে ফিরে আসার পর এডওয়ার্ডস পেতিয়াকে একটা কুকুরছানা উপহার দেয়। ছেলেটির আনন্দ আর ধরে না; সে উপহারটি নিয়ে আস্তাবলে ও করিডরে ছুটাছুটি করতে থাকে, সকলকে দেখিয়ে বেড়ায় আর তার ভিজে গোলাপী মুখটাতে থেকে থেকে দ্রুত চুমু খায়।

খেলা দেখানোর সময় দর্শকদের কাছ থেকে উৎসাহ না পাওয়ায় মুহ্যমান হয়ে বেকার ভেতরের

করিডরে ফিরে আসছিল; পেতিয়ার হাতে কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেয়ে সে ওটাকে কেড়ে নিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে লাথি মেরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কুকুরছানাটি পাশের দেয়ালের সঙ্গে মাথায় চোট খেয়ে তৎক্ষণাৎ ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে গেল।

পেতিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে এডওয়ার্ডস সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। পেতিয়া তার কাছে ছুটে গেল। গালিগালাজ চারদিকে শোনা যাচ্ছে দেখে বেকার দারুণ ক্ষেপে গিয়ে এক ধাক্কায় পেতিয়াকে এডওয়ার্ডসের কাছ থেকে সরিয়ে দিল, সপাটে ওকে এক চড় কষাল...

হালকা আর নমনীয় হওয়া সত্ত্বেও পেতিয়া ততটা গাটাপার্চার মতো ছিল না, যতটা ছিল হতভাগ্য।

২

কাউন্ট লিস্তোমিরভের বাড়িতে ছোটদের ঘরগুলি ছিল দক্ষিণ দিকে, সামনেই বাগান। অপূর্ব বাড়িটি! সূর্য যখনই আকাশে থাকে তখন সকাল থেকে সূর্যাস্ত অবধি তার কিরণ জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। অতিরিক্ত আলো থেকে বাচ্চাদের দৃষ্টি বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কেবল জানলার নিচের অংশে নীল তাফ্‌তা কাপড়ের পর্দা ঝোলানো হয়েছে। ঐ একই উদ্দেশ্যে সবগুলো ঘরেও পাতা হয়েছে নীল রঙের গালিচা আর দেয়ালে সাঁটা হয়েছে খুবই হালকা রঙের ওয়াল পেপার।

ঘরগুলির একটিতে দেয়ালের গোটা নিচের অংশ খেলনাপাতিতে ঠাসা।

নানা রকমের রঙচঙে ইংরেজি এক্সারসাইজ বুক আর বইপত্র, পুতুল আর পুতুলের খাট, ছবি, দেরাজ আলমারি, ছোটদের রান্নার জায়গা, চীনেমাটির বাসনসামগ্রী, চাকা লাগানো খেলনার ভেড়া আর কুকুর — ছোট মেয়েদের সম্পত্তি; টেবিল, তার ওপর টিনের সৈন্যসামন্ত, ভয়ঙ্কর ড্যাবড্যাবে চোখ বার করা, সর্বাঙ্গে ঘণ্টি ঝোলানো ছাইরঙা ঘোড়ায় যোতা পিচবোর্ডের ত্রোইকাগাড়ি, সাদা রঙের বিরাট এক ছাগল, কসাক ঘোড়সওয়ার, ঢাক আর তামার বিউগল — যার আওয়াজ আবার ইংরেজ মহিলা মিস্ ব্রিক্‌সকে সব সময় অস্থির অস্থির করে তুলত — এগুলো হল ছেলেদের সম্পত্তি। এই ঘরটার নামই তাই 'খেলাঘর'।

পিঠে-পার্বণ চলাকালে, বুধবারে খেলাঘরে বিশেষ করে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ছোটদের আনন্দ কোলাহলে ঘরটি ছেয়ে গেল। অবশ্য এমন হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়, কেননা তাদের বলা হয়েছিল:

'বাচ্চারা, পার্বণের একেবারে শুরু থেকে তোমরা লক্ষ্মী হয়ে, শান্তশিষ্ট হয়ে ছিলে; আজ হল গিয়ে বুধবার; যদি তোমরা এই রকম ভালো হয়ে চল তাহলে শুক্রবার সন্ধ্যায় তোমাদের সার্কাসে নিয়ে যাওয়া হবে!'

এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন সোনিয়া মাসী।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে উঠল উল্লসিত চিৎকার, চেঁচামেচি, সেই সঙ্গে লাফঝাঁপ এবং আনন্দের অল্পবিস্তর ভাবগর্ভ আরও কিছু প্রকাশ। ছোটদের ফুর্তির এই উচ্ছ্বসিত প্রকাশের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি অবাক করে দিল পাঁচ বছরের ছেলে পাফ্। সে বরাবরই থপথপে, কিন্তু এখন শোনা কথার প্রভাবে আর সার্কাসে কী হতে পারে তা ভেবে সে হঠাৎ চার হাত-পায়ে লাফিয়ে পড়ল, বাঁ পা ওপরে তুলে দিল, জিভ বিতিকিচ্ছিরি ভাবে ঘুরিয়ে গালে ঠেকিয়ে তার কুতকুতে চোখ মেলে উপস্থিত সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে জোকারের নকল করতে গেল।

'ওকে ওঠাও, শিগ্গির ওঠাও, ওর মাথায় রক্ত উঠে যাবে!' সোনিয়া মাসী বলে উঠলেন।

নতুন করে চিৎকার-চেঁচামেচি, পাফের চারদিকে নতুন করে ছুটোছুটি। কিন্তু পাফ্ কোনক্রমেই উঠতে রাজী নয়, সে জেদ করে একবার এ পা উঠায় ত আরেকবার ও পা উঠায়।

'ছেলেমেয়েরা, হয়েছে... যথেষ্ট হয়েছে! এ-ই কি তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধির নমুনা?.. এ-ই বুঝি কথা শোনার নমুনা?' বিশেষত বাচ্চাদের ওপর রাগ করার ক্ষমতা না থাকায় বিলাপের সুরে সোনিয়া মাসী বললেন।

'নিজের ছেলেমেয়ে' বলতে — তিনি ওদের তাই-ই বলতেন — তিনি একেবারে অজ্ঞান। আর সত্যি কথা বলতে গেলে কি ছেলেমেয়েগুলো বড় মিষ্টি ছিল।

বড় মেয়ে ভেরোচকার বয়স হয়েছে আট। তার পর ছয় বছরের মেয়ে জিনা। ছেলেটির বয়স, আগেই বলা হয়েছে, পাঁচ। ওর নাম পাভেল, তবে সে একের পর এক পেয়ে যাচ্ছিল নানা রকমের ডাকনাম — বেবী, বুড়বুড়ি, গোলগাপ্পা, বনরুটী আর হল পাফ্ — এই শেষ নামটাই থেকে গেল। ছেলেটা ছিল ফুলোফুলো, ছোটখাটো; তুলতুলে সাদা ধবধবে শরীরটা তার ননীর মতো, মাথাটা বলের মতো, গোলগাল মুখ, আর সে মুখে একমাত্র লক্ষ্য করার মতো বৈশিষ্ট্য ছিল ছোট ছোট কুতকুতে চোখ; খাবার-দাবার সামনে দেওয়া হলে কিংবা খাবারের কথা উঠলে তার চোখদুটো একেবারে ড্যাবড্যাব করত।

যে মুহূর্তে সার্কাসের শোতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল তখন থেকে বড় মেয়ে ভেরোচকা পুরো মনোযোগ দিয়ে তার ভাইবোনের আচার ব্যবহারের ওপর নজর রাখতে লাগল। ওদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি ওদের দিকে ছুটে যায়, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর মিস্ ব্রিক্সের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তড়বড় করে জিজিকে আর পাফ্কে ফিসফিসিয়ে কী সব বলতে থাকে আর পালা করে একবার একে আরেকবার ওকে চুমো খেয়ে সব সময়ই ওদের মধ্যে শান্তি ও মিটমাট করে দেওয়ার অবকাশ পায়।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত শুক্রবার এলো। ডাইনিং রুমের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। ঠিক এই সময় খানসামাদের মধ্যে একজন দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিল, এক ইংরেজ আর এক সুইস মহিলার সঙ্গে বাচ্চারা ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল। রোজকার মতো আদব কায়দা বজায় রেখে আহারপর্ব সমাপ্ত হল।

জিজি ও পাফ্‌কে ভেরোচকা আগে থেকেই সতর্ক করে রেখেছিল, তাই তারা একটি কথাও বলল না। ভেরোচকা তার ভাইবোনকে সব সময় চোখে চোখে রাখল, সে উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিটি গতিবিধির ব্যাপারে ওদের সাবধান করে দিচ্ছিল।

খাবার পাট চুকলে মিস্ ব্রিক্‌স কাউণ্টেসকে একথা জানানো বলে কর্তব্য মনে করলেন যে গত কয়েকদিন ধরে বাচ্চারা যেমন চমৎকার আচরণের পরিচয় দিয়েছে তেমন আর তিনি কখনও দেখেন নি। কাউণ্টেস বাধা দিয়ে বললেন যে তিনি ইতিমধ্যেই বোনের কাছ থেকে একথা শুনেছেন, আর তাই সন্ধ্যায় ওদের বক্সে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যাওয়ার আজ্ঞা দিয়েছেন।

ভেরোচকা এতক্ষণ সংযত হয়ে বসে ছিল, কিন্তু এ সংবাদে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে এত জোরে কাউণ্টেসকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করল যে তার ফুরফুরে চুলের রাশিতে মুহূর্তের জন্য কাউণ্টেসের মুখ একেবারে ঢাকা পড়ে গেল।

গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর ওপরে পড়ে ছিল সার্কাসের কিছু হ্যাণ্ডবিল। ভেরোচকা সে দিকে এগিয়ে গিয়ে ওগুলোর একটির ওপর হাত রেখে অধীর আগ্রহে, রুদ্ধনিশ্বাসে মা'র দিকে তার নীল চোখজোড়া মেলে মৃদু প্রশ্নের সুরে বলল:

'মা... নেব?.. এটা নিতে পারি?'

'নাও।'

'জিজি! পাফ্!' হ্যাণ্ডবিলটা নাড়াতে নাড়াতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভেরোচকা চেঁচাল। 'শিগ্‌গির চলে এসো! আজ সার্কাসে আমরা যা যা দেখব তার সব কিছু তোমাদের বলব, সব বলব! চল, আমাদের ঘরে যাই!'

'ভেরোচকা! ভেরোচকা...' ক্ষীণকণ্ঠে, ভর্ৎসনার সুরে কাউণ্টেস বললেন।

কিন্তু ভেরোচকা কানই দিল না — সে ছুটে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন তার দুই ভাইবোন। মিস্ ব্রিক্‌স হাঁপাতে হাঁপাতে, হাঁসফাঁস করতে করতে কোন রকমে তাদের সঙ্গে তাল রেখে ছুটলেন।

উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় আলোকিত খেলাঘরে আরও বেশি সাড়া পড়ে গেল।

নিচু টেবিলটা থেকে খেলনাপাতি সরিয়ে রেখে তার ওপর হ্যাণ্ডবিল বিছিয়ে রাখা হল।

ভেরোচকা জেদ ধরে বসল যেন উপস্থিত সকলে — সোনিয়া মাসী, মিস্ ব্রিক্‌স, তাদের বাজনা শেখানোর দিদিমণি আর কোলের ছেলে নিয়ে ওদের যে ধাই ঘরে ঢুকেছে — তারা সকলেই যেন টেবিলের চারধারে স্থির হয়ে বসে। জিজি আর পাফ্‌কে বসানোই হয়ে উঠল দারুণ মুশকিল। ওরা একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করে, একবার এপাশ থেকে আরেকবার ওপাশ থেকে অধৈর্য হয়ে ভেরোচকাকে উত্ত্যক্ত করে তুলছিল, টুলের ওপর উঠে পড়ছিল, টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ছিল আর প্রায় হ্যাণ্ডবিলটার মাঝখানেই কনুই রাখছিল। শেষে মাসীর চেষ্টায় বাগে আনা গেল।

ভেরোচকা পেছন দিকে চুল সরিয়ে নিয়ে হ্যাণ্ডবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে পাঠ করল:

‘ ‘গাটাপার্চার ছেলে। চৌদ্দ ফুট উঁচুতে লাঠির আগায়, শূন্যে ব্যায়াম প্রদর্শনী!’ না, মাসীমণি, এটা তুমিই আমাদের বল!.. বলই না!.. কী রকম এই ছেলেটা? ও কি সত্যিকারের? জ্যান্ত?.. গাটাপার্চার — এটা আবার কেমন?’

‘ওকে এমন নাম সম্ভবত এই কারণে দেওয়া হয়েছে যে ওর হাড় আর পেশীগুলো বড় নরম... এটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতেই পাবে...’

‘না, না, এখন বল, বলই না, কেমন করে ও এটা শূন্যে আর লাঠির আগায় করবে?.. কেমন করে করবে?..’

‘কেমন করে করবে?’ জিজি ধুয়া তুলল।

‘কেমন করে?’ পাফ্ হাঁ করে সংক্ষেপে প্রশ্ন করল।

‘ছেলেমেয়েরা, তোমরা আমাকে বড্ড বেশি প্রশ্ন করছ। সত্যি বলছি, আমি তোমাদের কিছু বোঝাতে পারছি না। আজ সন্ধেবেলা এসবই তোমরা নিজেদের চোখের সামনে দেখতে পাবে। ভেরোচকা, তুমি বরং পড়ে যাও। হ্যাঁ, এর পর কী আছে?’

কিন্তু পরে যা পড়া হল তাতে আর তেমন চাঞ্চল্য জাগল না; আগ্রহে, লক্ষ্য করার মতো ভাটা পড়ে গেছে, গোটা আগ্রহটা এখন গাটাপার্চার ছেলেকে ঘিরে। গাটাপার্চার ছেলে হয়ে দাঁড়াল কথাবার্তার বিষয়, নানা রকম জল্পনাকল্পনার, এমন কি তর্কবিতর্কের বিষয়।

হ্যান্ডবিলে এর পর কী ছিল, জিজি আর পাফ্ ত তা শুনতে পর্যন্ত চাইল না। ওরা নিজেদের টুল ছেড়ে নেমে এসে হৈচৈ করে খেলায় মেতে উঠল — গাটাপার্চার ছেলের খেলা কেমন হতে পারে তা দেখাতে শুরু করল। পাফ্ আবার চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, জোকারের মতো বাঁ পা ওঠাল আর চেষ্টা করে জিভ ঘুরিয়ে গালে ঠেকিয়ে কুতকুতে চোখ মেলে সকলের দিকে তাকাতে লাগল। এতে প্রতিবারই সোনিয়া মাসী ভয়ে আঁতকে ওঠেন — ছেলেটার মাথায় রক্ত উঠে না যায়।

দ্রুত হ্যান্ডবিল পড়া শেষ করে ভেরোচকা ভাইবোনের সঙ্গে যোগ দিল।

খেলাঘরে এর আগে আর কখনও এত আমোদ দেখা যায় নি। বাগানের ওপারে, পাশের সদর বাড়ির ছাদে ঝুঁকে পড়ে সূর্য আলোকিত করে তুলছিল খেলায় মত্ত বাচ্চাদের দলটিকে, উদ্ভাসিত করে তুলছিল তাদের আনন্দোচ্ছল হাসিখুশি, আরক্তিম চোখমুখ, খেলা করে চলছিল সর্বত্র ছড়ানো রঙচঙে খেলনার ওপর, গড়িয়ে পড়ছিল নরম গালিচার ওপর দিয়ে, গোটা ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছিল মৃদু, উষ্ণ আলো। মনে হচ্ছিল এখানে আমোদ আর উল্লাসের মেলা বসে গেছে।

দুপুরের খাওয়া সাঙ্গ হল আবহাওয়া কী রকম আর কটা বাজে — এই সব জিজ্ঞেসবাদের মধ্য দিয়ে। ছোটদের ভাবনাচিন্তার মোড় ঘুরিয়ে তাদের অন্তত কিছুটা শান্ত করার উদ্দেশ্যে সোনিয়া মাসী বৃথাই সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মাসী ছোটদের ঘরে ফিরে এলেন, তার চোখেমুখে খুশির ঝলক। তিনি জানালেন যে কাউন্ট আর কাউন্টেসের আজ্ঞা হয়েছে জামাকাপড় পরিয়ে ছেলেমেয়েদের সার্কাসে নিয়ে যাওয়ার।

ঘর এখন বাতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেখানে এবারে রীতিমতো হ্লস্থ্ল আর হ্টোপাটি পড়ে গেল। শেষকালে এই বলে ভয় দেখাতে হল যে কথা না শ্নলে আর কথামতো ভালো করে গরম কাপড় গায়ে না জড়ালে বাড়িতে ফেলে যাওয়া হবে। শিগ্‌গিরই বাচ্চাদের বড় সিঁড়ির সামনে নিয়ে আসা হল, আবার মনোযোগ দিয়ে ওদের দেখা হল, জামাকাপড় গ্‌জে ঠিকঠাক করার পর শেষে নেমে আসতে দেওয়া হল দেউড়ির সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বরফে অর্ধেক ঢাকা চার আসনের কোচ...

দরজা বন্ধ হয়ে গেল, চাকর লাফিয়ে কোচবক্সে উঠে বসল, গাড়ি যাত্রা করল।

৩

সার্কাসের শো তখনও শ্র্ হয় নি। সার্কাস, বিশেষ করে তার উপরের গ্যালারী, লোকে লোকারণ্য। মার্জিত দর্শকেরা তাদের চিরকালের অভ্যাস বশে দেরিতে আসছিলেন। অর্কেস্ট্রার পাইপগ্লো প্রোদমে গমগম করে বেজে চলছিল। পাশ আর ওপর থেকে আলোয় উদ্ভাসিত, আঁচড়ে সমান, মস্ণ করা সার্কাস রিং তখনও খালি।

হঠাৎ অর্কেস্ট্রায় দ্রুত তালে স্র বেজে উঠল। আস্তাবলের প্রবেশপথের পর্দা ফাঁক হয়ে যেতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো জনা বিশেষ লোক, তাদের পরনে ঝালর দেওয়া স্ন্দর স্ন্দর সাজ, সকলেরই পায়ে ওয়েলিংটন ব্ট। তাদের মাথায় চুল শক্ত করে পাকানো, লোশন লাগানোর ফলে চকচক করছিল।

সার্কাসের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমর্থনের ঢেউ খেলে গেল। শো শ্র্ হয়ে গেল। সার্কাসের সাজ পরা কর্মীরা যথারীতি দ্ সারি বেঁধে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আস্তাবলের দিক থেকে তীক্ষ্ন কিচিরমিচির আওয়াজ আর অট্টহাসি শোনা গেল — জোকারদের গোটা একটা দল ডিগবাজী খেতে খেতে, হাতে ভর দিয়ে মাটিতে নেমে, শ্ন্যে লাফিয়ে পড়ে রিং-এ ছ্টে এলো।

সবার আগে যে জোকারটি ছিল, তার খাটো কোটের ব্কে আর পিঠে বিরাট বিরাট প্রজাপতি আঁটা। দর্শকেরা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল যে এ হল তাদের প্রিয়পাত্র এডওয়ার্ডস।

'সাবাস! এডওয়ার্ডস! সাবাস! সাবাস!' চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল।

কিন্তু এবারে এডওয়ার্ডস ফাঁকি দিল। সে বিশেষ কোন খেলা দেখাল না। বার কয়েক মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে, রিং-এর চারধারে পায়চারি করে, ময়্রের পালক নাকের ওপর রেখে ব্যালেন্সের খেলা দেখিয়ে সে তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে গেল। তারপর কতবারই না ওর উদ্দেশে হাততালি দেওয়া হল, ওকে ডাকা হল, কিন্তু ও এলো না।

তার বদলে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আনা হল এক মোটাসোটা সাদা ঘোড়া। সাবলীল ভঙ্গিতে চতুর্দিকে পাক খেল পনেরো বছরের মেয়ে আমালিয়া।

আমালিয়ার পরে এলো ভেল্কিবাজ; ভেল্কিবাজের পর বেরিয়ে এলো শিক্ষিত কুকুর নিয়ে জোকার; তাদের পরে — দড়ির ওপর নাচ; দেখানো হল উঁচুদরের ঘোড়া নিয়ে খেলা — খেলোয়াড়রা জিন ছাড়া এক ঘোড়ায় চড়ে ছুটল, জিন চাপানো দু ঘোড়া চালিয়ে কসরৎ দেখাল — এক কথায়, ইণ্টারভ্যালের শুরু অবধি এই ভাবে শো তার নিজস্ব পালা অনুযায়ী চলল।

'মাসীমণি, এখন তাহলে গাটাপার্চার ছেলে, তাই না?' ভেরোচকা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাণ্ডবিলে বলা হয়েছে, সেকেণ্ড হাফে হবে... কী হল, কেমন লাগছে? তোমাদের মজা লাগছে ত, ছেলেমেয়েরা?'

'ওঃ, দারুণ, দারুণ মজা!.. দা-রু-ণ!..' ভেরোচকা উল্লসিত হয়ে বলল।

'আর তোমার, জিজি? তোমার, পাফ্, মজা লাগছে ত?'

'গুলি ছুঁড়বে নাকি?' জিজি জিজ্ঞেস করল।

'না, চিন্তার কারণ নেই; বললাম ত, ছুঁড়বে না!'

পাফের কাছ থেকে কিছু বার করা গেল না। ইণ্টারভ্যালের গোড়া থেকে, ফেরিওয়ালাদের হাতে হাতে তাদের ট্রে-র ওপর লোভনীয় খাদ্য আর আপেলের আবির্ভাব দেখা যেতে তার সমস্ত মনোযোগ ওখানেই পড়ে রইল।

আবার অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল, আবার দুই সারি বেঁধে লাল সাজ পরা কর্মীদের আগমন। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

'গাটাপার্চার ছেলে কখন আসবে?' প্রতিবারই এক খেলার শেষে অন্য খেলা আরম্ভ হতে হতে বাচ্চারা প্রশ্ন করতে ছাড়ে না। 'কখন আসবে?..'

'এই এখুনি...'

সত্যিই বটে। উচ্ছ্বসিত ওয়াল্‌টজের তালে তালে পর্দা ফাঁক হয়ে যেতে দেখা দিল রিং মাস্টার বেকারের বিশাল আকৃতি, সে হাত ধরে নিয়ে এলো ছাইরঙের চুলওয়ালা একটা রোগা ছেলেকে। তাদের দুজনেরই শরীরের সঙ্গে টানটান হয়ে লেপটে আছে চামড়ার রঙের জাঙ্গিয়া, তার ওপর চুমকি ছড়ানো। তাদের পেছন পেছন দুজন তল্পিদার বয়ে নিয়ে এলো সোনালী রঙের একটা লম্বা লগি, তার আগায় — লোহার একটা হাতল গোছের।

রিং-এর মাঝামাঝি এসে বেকার ও ছেলেটি চারপাশে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল। এর পর বেকার তার ডান হাত ছেলেটার পিঠে লাগিয়ে ওকে শূন্যে তিনবার ডিগবাজী খাওয়াল। তবে এটা ছিল ভূমিকা মাত্র। দ্বিতীয়বার সকলের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে বেকার লগি তুলে নিয়ে তার মোটা প্রান্তটি নিজের পেটের ওপর বেড় দেওয়া সোনালী বেল্টের সঙ্গে শক্ত করে আঁটল, তারপর লোহার হাতল দেওয়া অন্য প্রান্তটির সঙ্গে ভারসাম্য ঠিক করতে লাগল। হাতলটা তখন সার্কাসের চাঁদোয়ার নিচে সামান্য ঝলক দিচ্ছে। এই ভাবে লগির উপযুক্ত ভারসাম্য ঠিক করার পর লোকটা ছেলেটিকে ফিসফিস করে কিছু কথা বলল, ছেলেটা প্রথমে ওর কাঁধের ওপর উঠল, তারপর সরু সরু হাতে ও পায়ে লগি আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। ছেলেটি যতবারই নড়ে,

লগিও ততবার এদিক ওদিক দ্বলতে থাকে, আর তার ফলে বেকারকে এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে যেতে হয়।

ছেলেটি শেষ পর্যন্ত লগির আগায় পেঁাছে গিয়ে সেখান থেকে শ্বন্যে দর্শকদের উদ্দেশে চুম্ব ছ্বঁড়ে দিতে হলঘর 'সাবাস' শব্দে ফেটে পড়ল। আবার সব চুপচাপ, কেবল অর্কেস্ট্রায় বেজে চলেছে ওয়াল্‌টজ। ছেলেটা ইতিমধ্যে লোহার বার ধরে দ্বহাতের ওপর শরীর টান করল, ধীরে ধীরে শরীর পেছনে বাঁকাতে বাঁকাতে মাথা আর বারের মাঝখান দিয়ে পাদ্বটো গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। মিনিটের জন্য চোখে পড়ার মধ্যে ছিল কেবল পেছনে ঝুলে পড়া তার সোনালী চুলের রাশি আর চুমকি ছিটানো ব্বক ও নিশ্বাসের ঘন ঘন ওঠা পড়া। লগি এদিক ওদিক দ্বলছিল, তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলা বেকারের পক্ষে যে কী শ্রমসাধ্য ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

'সাবাস!.. সাবাস!..' আবার হল গমগম করে উঠল।

'ব্যস্‌! ব্যস্‌!..' দ্ব-তিন জায়গা থেকে শোনা গেল।

কিন্তু ছেলেটিকে যখন আবার বারের ওপর বসে থাকতে আর সেখান থেকে চুম্ব ছ্বঁড়তে দেখা গেল তখন গোটা সার্কাস হল চিৎকার আর হাততালির আওয়াজে ভরে গেল। বেকার ছেলেটির ওপর থেকে নজর সরাচ্ছিল না, সে আবার যেন ফিসফিস করে কী বলল। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য কসরৎ দেখাতে শ্বর্ব করল। হাতে ভর দিয়ে সে সাবধানে পা নামিয়ে চিত হয়ে শ্বয়ে পড়তে লাগল। এখানে দেখাতে হবে সবচেয়ে কঠিন কসরৎ: প্রথমে চিত হয়ে শ্বয়ে পড়তে হবে, শরীরটাকে বারের ওপর এমনভাবে শ্বইয়ে রাখতে হবে যাতে মাথার সঙ্গে দ্বই পায়ের ভারসাম্য বজায় থাকে, তারপর হঠাৎ, আচম্বিতে পিঠ ঘসটে পেছন দিকে হড়কে গিয়ে কেবল দ্বই হাঁটুর ভাঁজে আটকে শ্বন্যে ঝুলে থাকতে হবে।

সবই কিন্তু ভালোমতোই চলছিল। লগিটা অবশ্য বেশ কাঁপছিল, কিন্তু গাটাপার্চার ছেলে ইতিমধ্যে অর্ধেক কাজ হাসিল করে ফেলেছে; সে লক্ষ্য করার মতো ক্রমেই নিচে ঝ্বঁকে পড়ছিল, পিঠ ঘসটে হড়কাতে শ্বর্ব করে দিয়েছিল।

'ব্যস্‌! ব্যস্‌! আর দরকার নেই!' কয়েকটি কণ্ঠস্বর জেদ ধরে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

ছেলেটি পিঠে পিছলে পিছলে চলল, ধীরে ধীরে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে নামতে লাগল...

অতর্কিতে কী একটা শ্বন্যে ঝলমল করে উঠল, ঝলক দিল, ঘ্বরপাক খেল; ঠিক সেই ম্বহ্বর্তে ধপ করে মাটিতে কিছ্ব একটা পড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

চোখের পলকে হল জ্বড়ে তোলপাড়। দর্শকদের একটা অংশ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি বাধিয়ে দিল; চিৎকার চেঁচামেচি আর মেয়েদের আর্তনাদ উঠল, 'ডাক্তার, ডাক্তার' করে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রিং-এর ভেতরেও হ্বলস্থ্বল; ফরাস, তল্পিদার আর জোকারেরা রিং-এর দেয়াল টপকে ছ্বটে এসে বেকারকে ঘিরে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন লোক কী একটা উঠিয়ে নিয়ে নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি আস্তাবলে যাওয়ার ম্বখের পর্দার ওধারে বয়ে নিয়ে চলল। কেবল রিং-এ পড়ে রইল আগায় হাতল লাগানো লম্বা সোনালী লগিটা। অর্কেস্ট্রা এক মিনিটের জন্য

থেমে গিয়ে সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আবার হঠাৎ বাজতে শুরু করল। কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে ডিগবাজী খেতে খেতে রিং-এর মধ্যে দৌড়ে এসে ঢুকল কয়েকজন জোকার, কিন্তু লোকে আর তাদের দিকে কোন নজর দিল না। বেরোবার দরজায় সব জায়গা থেকে দর্শকদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সর্বত্র লোকজনের এই ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেকেরই চোখে পড়ল নীল রঙের টুপি আর ওড়না পরা একটা মেয়ের দিকে; কালো পোশাক গায়ে এক মহিলার গলা জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর গলা ছেড়ে সমানে পরিত্রাহি চিৎকার করে যাচ্ছিল:

'ওঃ, ছেলেটা! আহা রে, ছেলেটা!..'

পরদিন সকালে সার্কাসের বিজ্ঞাপনে 'গাটাপার্চার ছেলের' খেলা আর ঘোষণা করা হল না। পরেও তার নাম উল্লেখ করা হল না; উল্লেখ করার উপায়ও অবশ্য ছিল না — গাটাপার্চার ছেলে আর এ জগতে ছিল না।

কন্‌স্তান্‌তিন স্তানিউকোভিচ্‌

মাক্সিমকা



রাশিয়ার পাহাড় ও প্রান্তর নয়, 'মাক্সিমকা' (১৮৯৬) গল্পের ঘটনাস্থল — গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মহাসাগরের ফিরোজা রঙের দূরপ্রান্ত আর রণপোতের ডেক। কাহিনীকার হলেন সমুদ্রের দৃশ্য অঙ্কনকারী বিখ্যাত লেখক কন্‌স্তান্‌তিন মিখাইলভিচ্‌ স্তানিউকোভিচ্‌ (১৮৪৩-১৯০৩)। তিনি শিশুদের পাঠমহলে প্রবেশ করেন তাঁর 'সাগরের কাহিনী' আর ''কোরশুন' জাহাজে ভূপ্রদক্ষিণ' নামে বৃহৎ গ্রন্থ নিয়ে।

কন্‌স্তান্‌তিনের বাবা ছিলেন অ্যাডমিরাল, এগারো বছরের বালককে তিনি পিটার্সবুর্গের নৌবাহিনীর ক্যাডেট কর্প্‌সে দেন। সতেরো বছর বয়সে ভাবী লেখক 'কালেভালা' রণতরীতে চেপে ভূপরিক্রমায় রওনা দেন, এই যাত্রা তিন বছর স্থায়ী হয়। বাইশ বছর বয়সে নাবিকের চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্তানিউকোভিচ্‌ বছরখানেক গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সাংবাদিকতার কাজ নেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগের ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে, নির্বাসনেই তিনি লিখতে শুরু করেন সাগরের কাহিনী, যা তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়।

স্তানিউকোভিচের বইগুলিতে তাঁর ছেলেবেলাকার সেই সব অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে, যখন সেভাস্তোপল নৌ-দুর্গের সামরিক শাসনকর্তার পুত্ররূপে তিনি একাধিকবার রুশ সেনাদল ও নাবিকদের সাহসিকতা ও শৌর্যের এবং উচ্চ মানবতাবোধের পরিচয় প্রত্যক্ষ করেন। সেই সঙ্গে তিনি দেখতে পান তাদের সম্পূর্ণ অধিকারহীনতা, কম্যাণ্ডার ও ওপরওয়ালাদের উপর তাদের অপমানজনক নির্ভরতা। অল্পবয়সে স্তানিউকোভিচ্‌ ভূমিদাসত্বের প্রতি যে নিদারুণ বিরাগ অনুভব করেন তার পরিচয় রেখেছেন তিনি নিজের গল্পগুলিতে। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তিনি দেখিয়েছেন রুশ নাবিকদের মানবতাবোধ ও মহত্ত্ব, তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা, শিশুদের প্রতি ভালোবাসা এবং ভাষা ও বর্ণের ভেদাভেদ না রেখে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তাদের আগ্রহ।



১

সবে জাহাজের ঘণ্টা বাজল। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে রমণীয় গ্রীষ্মমণ্ডলের সকাল ছয়টা।

ফিরোজা রঙের, স্বচ্ছ, কোমল, অসীম ঊর্ধ্বাকাশ এখানে ওখানে তুষারধবল লেসের মতো খণ্ড খণ্ড মেঘের পালকে আচ্ছন্ন। আকাশের বুকে দ্রুত উঠছে জ্বলন্ত, চোখ ধাঁধানো সূর্যের সোনালী গোলক — ছড়িয়ে দিচ্ছে তার খুশির দীপ্তি সমুদ্রের উঁচুনিচু তরঙ্গমালার বুকে। দূর দিগন্তের নীল রেখায় বাঁধা পড়েছে তার সীমাহীন দূরত্ব।

চারদিকে কেমন একটা গম্ভীর স্তব্ধতা।

কেবল হালকা নীল রঙের বিশাল বিশাল ঢেউ একটার পেছনে আর একটা ছুটে চলেছে, রোদে ঝিকমিক করছে তাদের রুপোলী চুড়ো, স্নিগ্ধ ঝিলিক দিচ্ছে, সেই সঙ্গে শোনা যায় স্নেহময়, প্রায় কোমল একটা কলকলধ্বনি — যেন ফিসফিসিয়ে বলছে, এই অক্ষাংশে. গ্রীষ্মমণ্ডলের আওতায় আদ্যিকালের বুড়ো সমুদ্র বেশ খোশমেজাজেই আছে।

স্নেহময়ী, যত্নপরায়ণা ধাত্রীর মতো সমুদ্র তার সুবিশাল বুকের ওপর বহন করছে ভাসমান জাহাজগুলিকে — নাবিকদের মনে ঝড়ঝঞ্ঝার কোন আশঙ্কার উদ্রেক করছে না।

চারদিকে নির্জনতা!

আজ একটিও সাদা পালের ঝলক চোখে পড়ছে না, দিগন্তে চোখে পড়ছে না এতটুকু ধোঁয়া। বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে বিশাল সমুদ্রপথ।



কৃচিৎ রোদে চকচক করছে উড়ুক্কু মাছের রুপোলী আঁশ। ক্রীড়াচঞ্চল তিমি তার কালো পিঠ দেখিয়ে সশব্দে জলের ফোয়ারা তুলছে। মাথার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে পাখা মেলে উড়ে চলে একটা কালো ফ্রিগেট কিংবা তুষারধবল অ্যালবেট্রস। জলের ওপর দিয়ে ছুটে চলছে ছোট্ট ধূসর পেট্রেল পাখি — আফ্রিকা বা আমেরিকার সুদূর তীরভূমির দিকে। তারপর আবার নির্জনতা। আবার সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস, সূর্য আর আকাশ — উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, সোহাগভরা।

সমুদ্রের ঊর্মিমালার বুকে অবলীলাক্রমে দুলতে দুলতে চলেছে রুশ বাষ্পীয় রণপোত ক্লিপার 'জাবিয়াকা'; উত্তর থেকে — বিষণ্ণ ও কঠোর, অথচ আপন ও প্রিয় — সেই উত্তর থেকে ক্রমেই দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে, দ্রুত এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে।

ছোটখাটো, আগাগোড়া কালো, ছিমছাম, সুন্দর এই 'জাবিয়াকা'। তার উঁচু উঁচু তিনটি মাস্তুল সামান্য পেছন দিকে হেলানো, আগাগোড়া পালে ঢাকা। জাহাজ এখন অনুকূল ও সমান, বরাবর একই দিকে বহমান উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুভরে ডেকের ঢাকা দিকটায় ঈষৎ কাত হয়ে ঘণ্টায় সাত-আট মাইল বেগে ছুটে চলেছে। স্বচ্ছন্দ ও লীলায়িত ভঙ্গিতে 'জাবিয়াকা' তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের শীর্ষে উঠছে, জাহাজের তলদেশের তীক্ষ্ম জলবিভাজকটি চাপা শব্দে তরঙ্গমালা ভেদ করে চলছে, তার চারদিকে ফেনায়িত হচ্ছে জলরাশি, ছড়িয়ে পড়ছে হীরকচূর্ণের মতো। ঢেউগুলো আদর করে চেটে দিচ্ছে ক্লিপারের গা। তার চলার পথের পেছনে পড়ে থাকে উজ্জ্বল রুপোর এক চওড়া ফিতে।

ওপরের ডেকে ও নিচে চলেছে সকালের নিয়মিত মাজাঘষা ও সাফাইয়ের কাজ। এই সময়, অর্থাৎ সকাল আটটায় ক্লিপারের পতাকা তোলা হয় — যুদ্ধজাহাজে শুরু হয় দিন।

ডেকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে নাবিকের দল। তাদের গায়ে চওড়া নীল কলার আঁটা সাদা রঙের কাজের শার্ট, দেখা যাচ্ছে তাদের শিরা-ওঠা, জল হাওয়ায় তামাটে ঘাড়। পা খালি, ট্রাউজার হাঁটু অবধি গুটান। ওরা ধুচ্ছে, চাঁচছে ও ঘষামাজা করছে জাহাজের ডেক, দেয়াল, কামান ও পেতলের জিনিস — এক কথায় এমন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তারা 'জাবিয়াকা' সাফ করছে যে-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় নিজেদের জাহাজ সাফ করার সময় নাবিকদের ক্ষেত্রে, কেননা জাহাজে মাস্তুলের আগা থেকে খোল পর্যন্ত সর্বত্রই থাকতে হবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো পরিচ্ছন্নতা, সেখানে যা কিছু ঝামা, বনাত কাপড় আর সাদা রঙের নাগালের মধ্যে — সে সবই হওয়া চাই ঝকঝকে চকচকে।

নাবিকেরা সোৎসাহে কাজ করছিল আর ফুর্তিতে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। 'গলাবাজ' সারেঙ্গ মাৎভেইচ্, 'সাফাইয়ের' সময় — নাবিকদের ভাষায় 'বথামি করে' — উপস্থিতমতো এমন দারুণ মজার মজার গালাগাল ছাড়ত যা রুশ নাবিকদের অভ্যস্ত কানে পর্যন্ত অবাক লাগে। মাৎভেইচ্ লোকটা ঝানু, চেহারায় মূর্তিমান সেকেলে সারেঙ্গ — রোদে পোড়ায় আর পারে গিয়ে খুব করে মদ গেলার দরুন তার মুখ লাল টকটকে, ছাইরঙা চোখ দুটি তার ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাৎভেইচ্ গালাগাল দিত লোককে উৎসাহিত করার জন্য ততটা নয়, যতটা — তার নিজের ভাষায় — 'শৃঙ্খলার খাতিরে'।

এর জন্য মাৎভেইচের ওপর কেউ রাগ করত না। সকলেই জানে যে মাৎভেইচ্ সজ্জন ও ন্যায়পরায়ণ লোক, কারও সাতে পাঁচে থাকে না, নিজের পদমর্যাদার অপব্যবহার করে না। মুখ খারাপ না করে সে যে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারে না এটা সকলে বহুকাল হল মেনে নিয়েছে, এমন কি সময় সময় তার অফুরান বৈচিত্র্যে তারা আনন্দই পায়। এ ব্যাপারে সে ছিল একজন ওস্তাদ।

মাঝে মাঝে নাবিকেরা ছুটে যাচ্ছিল জাহাজের ওপরের ডেকের সামনে, জলের পিপে আর বাক্সের কাছে যেখানে জ্বলছিল একটি সলতে, যাতে চট করে কড়া মাখোরকা তামাকের পাইপ টানা যায়, সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে দু-চারটে কথার আদানপ্রদান চলে। তারপর আবার ওরা লেগে যায় সাফ করার কাজে, তামার ফলক মাজাঘষা করতে, কামানের জেল্লা বার করতে আর জাহাজের দেয়াল ধুতে। ওরা বিশেষ করে উঠে পড়ে লাগত যখন সামনে এগিয়ে আসত সিনিয়র অফিসারের লম্বা ছিপছিপে মূর্তিটি। অফিসারটি সেই সকাল থেকে ক্লিপারের সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়াতেন, এখানে ওখানে উঁকি মেরে দেখতেন।

পাহারা-অফিসারটির বয়স অল্প, তার চুলগুলো সোনালী। চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত পাহারায় দাঁড়িয়ে। অনেক আগেই প্রথম আধ ঘণ্টার পাহারার ঝিমুনি ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। তার পরনের পোশাক আগাগোড়া সাদা, নাইট শার্টের বোতাম খোলা। সে ব্রিজের ওপর পায়চারি করছে আর বুক ভরে ভোরের তাজা বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে টানছে। বাতাস তখনও জ্বলন্ত রোদে তেতে ওঠে নি। কর্ণধাররা কম্পাস পয়েণ্ট অনুযায়ী জাহাজ চালাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কম্পাসের দিকে তাকানোর সময় কিংবা পালগুলো ঠিক আছে কিনা, দিগন্তে ঝোড়ো মেঘ উঠেছে কিনা দেখতে গিয়ে তরুণ লেফ্‌টেনাণ্টটি যতবার থামছে ততবারই স্নিগ্ধ বাতাস তার মাথার পেছনে মধুর সোহাগের ছোঁয়া লাগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সবই ঠিকঠাক চলছে। তাই এই কল্যাণকর গ্রীষ্মমণ্ডলে পাহারা-অফিসারের প্রায় কিছুই করার নেই।

সুতরাং সে আবার পায়চারি করতে লাগল আর অনেক আগে থাকতেই স্বপ্ন দেখে কখন তার ডিউটি শেষ হবে এবং সে পান করার অবকাশ পাবে দু-এক কাপ চা, সেই সঙ্গে খেতে পাবে টাটকা গরম গরম বানরুটি। অফিসারের কুকটি এরকম বানরুটি সেঁকতে দারুণ ওস্তাদ, অবশ্য ময়দার তালকে ফাঁপানের জন্য যে ভোদকা সে চায় তা যদি নিজের পেটে ঢেলে না দেয়।

২

জাহাজের গোড়ার দিকে বসে বসে যে সান্ত্রীটি সামনের দিকে লক্ষ্য রাখছিল হঠাৎ তার উদ্বেগজনক ও অস্বাভাবিক তীব্র চিৎকার ডেকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল:

'সমুদ্রে মানুষ!'

নাবিকেরা চোখের পলকে কাজ ফেলে বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে সামনের ডেকের ওপর ছুটে গেল, সমুদ্রের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'কোথায় লোকটা, কোথায়?' চারদিক থেকে সান্ত্রীর ওপর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হল। সাদাটে রঙের চুলওয়ালা তরুণ নাবিকটির মুখ হঠাৎ কাগজের মতো ফেকাসে হয়ে গেল।

'ঐ যে,' কাঁপা কাঁপা হাতে নাবিক দেখাল। 'এখন আড়ালে পড়ে গেছে। এইমাত্র আমি ওকে দেখতে পেয়েছিলাম, ভাই। মাস্তুলের সঙ্গে এ'টে ছিল... বাঁধা কি না কে জানে,' নাবিক উত্তেজিত হয়ে বলতে বলতে যে-লোকটাকে এইমাত্র দেখেছিল, তাকে বৃথাই চোখের নজরে খ‍ুঁজে বার করার চেষ্টা করল।

সান্ত্রীর চিৎকারে চমকে উঠে পাহারা-অফিসার চোখে দূরবীণ লাগাল, ক্লিপারের সামনের জলভাগের ওপর দূরবীণ লক্ষ্য করে ধরল।

সঙ্কেতকারীও টেলিস্কোপ দিয়ে সেই দিকেই দেখছিল।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' তরুণ লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল।

'পাচ্ছি স্যার... দয়া করে একটু বাঁ দিকে দেখুন...'

ঠিক এই সময় অফিসারও ঢেউয়ের মধ্যে মাস্তুলের টুকরো আর তার ওপর একটা মানুষের মূর্তি দেখতে পেল।

তীক্ষ্ণ, কাঁপা কাঁপা, দ্রুত ও উত্তেজিত স্বরে সে তার জোরাল ফুসফুসের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চে'চাল:

'সবাইকে ডেকে ওপরে জড় কর! বড় পাল আর সামনের পালের দড়িদড়া গুটাও! বোট নামাও!'

তারপর সঙ্কেতকারীকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিতভাবে বলল:

'লোকটাকে চোখে চোখে রেখো!'

'সবাই ওপরে চলে যাও!' বাঁশিতে সিটি বেজে ওঠার পর ভাঙ্গা ভাঙ্গা খাদে সারেঙ্গ গাঁকগাঁক করে বলল।

নাবিকেরা পাগলের মতো যার যার জায়গা নিতে ছুটল।

ক্যাপ্টেন আর সিনিয়র অফিসার ইতিমধ্যে ব্রিজের ওপর ছুটে এসেছেন। আধা ঘুমন্ত আধা জাগা অফিসাররা ধড়াচুড়ো গায়ে চাপিয়ে আসতে আসতে সি'ড়ি বয়ে ডেকের ওপর উঠতে লাগল।

জরুরী কাজের বেলায় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে — কম্যাণ্ডের ভার পড়ল সিনিয়র অফিসারের ওপর। একটা একটা করে তাঁর উচ্চকণ্ঠের কড়া হুকুম বেরিয়ে আসতে না আসতে নাবিকেরা কেমন যেন উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে তা তামিল করতে লেগে গেল। তাদের আর তর সয় না। প্রত্যেকেই যেন উপলব্ধি করতে পারছিল প্রতিটি সেকেণ্ড কত মূল্যবান।

সাত মিনিট যেতে না যেতে দুটো-তিনটে বাদে প্রায় সব পালই গুটিয়ে নেওয়া হয়ে গেল।

'জাবিয়াকা' বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ হয়ে স্থির হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর মৃদু দোল খেতে লাগল। ষোলজন দাঁড়ী আর হালের কাছে একজন অফিসার সমেত বোট জলে নামিয়ে দেওয়া হল।

'ভগবান ভরসা!' জাহাজের ধার থেকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া বোটের উদ্দেশে ব্রিজ থেকে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন।

দাঁড়ীরা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানতে টানতে দ্রুত এগিয়ে চলল লোকটাকে বাঁচানোর জন্য।

এদিকে ক্লিপারকে থামাতে যে সময় লেগেছিল সেই সাত মিনিটের মধ্যে সে এক মাইলেরও বেশি এগিয়ে গেছে, তাই মাস্তুলের ভাঙা টুকরো এবং মানুষটিকে দূরবীণ দিয়েও দেখা যাচ্ছিল না।

তাসত্ত্বেও যেখানে মাস্তুল দেখা যাচ্ছিল, ওরা কম্পাসের সাহায্যে সে দিকটা লক্ষ্য করে রাখে এবং সেই দিকে নৌকো বাইতে বাইতে ক্লিপার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

'জাবিয়াকার' সব নাবিকেরই চোখ নৌকোর উপর। নৌকোটা যখন সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউয়ের চূড়ায় কখনও জেগে উঠছে, কখনও তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে তখন তাকে একটা নগণ্য খোলার চেয়ে বড় কিছু মনে হচ্ছিল না।

দেখতে দেখতে ওটাকে একটা কালো বিন্দুর মতো মনে হল।

৩

ডেকের ওপর বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা।

কেবল কোয়ার্টার ডেকে ভিড় করে জড় হয়ে নাবিকেরা থেকে থেকে টুকরো টুকরো মন্তব্য করছিল, নিচু গলায় বলাবলি করছিল:

'কোন ডুবে-যাওয়া জাহাজের নাবিক-টাবিক হবে বোধহয়।'

'এরকম জায়গায় জাহাজ ডোবা কঠিন — একেবারে রদ্দি না হলে!'

'না, দেখা যাচ্ছে, রাতে অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।'

'আগুনও লাগতে পারে।'

'কিন্তু ভাই, বেঁচে গেল কিনা মাত্র একটা লোক!'

'হতে পারে আর সবাই ডিঙিতে চড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, ওকে ভুলে ফেলে গেছে...'

'বেঁচে আছে কিনা কে জানে?'

'জল গরম আছে। বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে।'

'হাঙ্গর-টাঙ্গর ওকে খেয়ে ফেলে নি এটা কী রকম ব্যাপার ভাই! জায়গাটা ত হাঙ্গরে কিলবিল করছে!'

'হুম্! বুঝলে ভাই, জাহাজের চাকরি বিপতের! উঃ কী সাংঘাতিক!' দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেলে বলল একজন। এ নাবিকটি একেবারেই তরুণ, তার মাথার চুল কালো, কানে মাকড়ি। এই প্রথম বছর কাজ করছে, লাঙ্গল ছেড়ে সরাসরি সমুদ্রের বুকে বিশ্ব পাড়ি দিতে নেমেছে।

মুখ কালো করে সে টুপি খুলল, ধীরে ধীরে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। নিঃশব্দে যেন এই প্রার্থনাই জানাল যে সমুদ্রের কোথাও ভয়াবহ মৃত্যুর কবল থেকে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।

ক্লান্তিকর প্রতীক্ষায় সকলে কাটিয়ে দিল পৌনে এক ঘণ্টা।

সঙ্কেতকারী টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়েই রেখেছিল। অবশেষে সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

'নৌকো ফিরে আসছে!'

বোট এগিয়ে আসতে সিনিয়র অফিসার সঙ্কেতকারীকে জিজ্ঞেস করলেন:

'উদ্ধার পাওয়া কাউকে ওখানে দেখা যাচ্ছে কি?'

'দেখা যাচ্ছে না স্যার!' সঙ্কেতকারীর কণ্ঠস্বরে আর আগের মতো ফুর্তি নেই।

'ওরা তাহলে ওকে খুঁজে পায় নি!' ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সিনিয়র অফিসার বললেন।

'জাবিয়াকার' ক্যাপ্টেন বেঁটেখাটো, বলিষ্ঠ গড়নের। তাঁর মাথার চুল ঘন কালো। মাঝবয়সী লোক। তাঁর সারা মুখে ঘন লোম, মাংসল গাল আর চিবুক খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ির গোছায় ভর্তি, খুদে গোল গোল চোখ বাজপাখির মতো তীক্ষ্ন ও প্রখর। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন, স্পষ্টতই চাপা বিরক্তির সঙ্গে বললেন:

'আমার মনে হয় না। বোটে একজন পাকা অফিসার আছেন। লোকটাকে খুঁজে না পেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেন না।'

'কিন্তু বোটে ত তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'হয়ত নিচে শুয়ে আছে, তাই ওকে দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, শিগ্গিরই জানতে পারা যাবে...'

এই বলে ক্যাপ্টেন ব্রিজের ওপর পায়চারি শুরু করলেন, এগিয়ে আসা নৌকোটাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে থামেন। শেষটায় দূরবীণে চোখ লাগিয়ে দেখলেন। উদ্ধার করা লোকটাকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু প্রশান্ত আনন্দের ভাব নিয়ে হালের সামনে অফিসারকে দেখে বিবেচনা করলেন যে নৌকোয় সে লোকটা আছে।

ক্যাপ্টেনের রাগী মুখ পরিতৃপ্তির স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আরও কয়েক মিনিট যেতে নৌকো পাশে এসে ভিড়ল — লোকজনসুদ্ধ তাকে জাহাজে তোলা হল।

অফিসারের পেছন পেছন নৌকো থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল দাঁড়ীরা। প্রত্যেকেরই মুখ লাল, ঘাম ঝরছে, সকলেই শ্রান্তিতে হাঁপাচ্ছে। যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে-ও বেরিয়ে ডেকের ওপর এলো একজন নাবিকের সহায়তায়। একটা নিগ্রো বাচ্চা — দশ-এগারো বছরের হবে। আপাদমস্তক ভিজে সপসপে, তার রোগা, জিরজিরে, চকচকে কালো শরীর ছেঁড়াখোঁড়া শার্টে কিছুটা ঢাকা।

সে কোন রকমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কোটরে বসা বড় বড় চোখে কেমন যেন একটা উন্মত্ত আনন্দ, সেই সঙ্গে ভেবাচেকা খাওয়ার ভাব নিয়ে সে তাকাচ্ছিল — যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সে উদ্ধার পেয়েছে।

'প্রায় আধমরা অবস্থায় মাস্তুল থেকে তুলি; বেচারার জ্ঞান ফেরাতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল,' নৌকোয় যে অফিসারটি গিয়েছিল সে ক্যাপ্টেনকে জানাল।

'শিগ্‌গির ওকে রোগীর ঘরে নিয়ে যাও!' ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন।

ছেলেটাকে তৎক্ষণাৎ রোগীর ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল, ওকে শুকনো খটখটে করে মুছে খাটে শুইয়ে দেওয়া হল, ওর গায়ে জড়ানো হল কম্বল। ডাক্তার ওর চিকিৎসা শুরু করলেন মুখে কয়েক ফোঁটা করে ব্র্যান্ডি ঢেলে।

ও তৃষ্ণার তাড়নায় জলীয় পদার্থ গিলতে লাগল, অনুনয়ের দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখাল।

এদিকে পালগুলো তোলা হল, মিনিট পাঁচেক বাদে 'জাবিয়াকা' আবার আগের পথ ধরল, নাবিকেরা আবার শুরু করল তাদের ফেলে-রাখা কাজ।

'নিগ্রো ছেলেটাকে বাঁচানো গেছে!' চারদিক থেকে নাবিকদের উল্লাসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কী টিন্‌টিনে রে ভাই!'

কেউ কেউ নিগ্রো ছেলেটার অবস্থা জানার জন্য রোগীর ঘরে ছুটল।

'ডাক্তার দেখছেন। সেরে উঠছে বলেই মনে হচ্ছে!'

ঘণ্টাখানেক বাদে মাস্তুল পাহারাদার কোরশুনভ খবর নিয়ে এলো যে ডাক্তারের কাছ থেকে কয়েক চামচ সুপ খাওয়ার পর নিগ্রো বাচ্চাটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

'নিগ্রো বাচ্চাটার জন্যে কুক সুপ বানিয়েছে, মানে একেবারে সব কিছু বাদ দিয়ে খালি সুপ, যেন ছেঁকে বার করা,' উত্তেজনার সঙ্গে কোরশুনভ বলে চলল। তার তৃপ্তি এখানেই যে তার মতো একজন কুখ্যাত মিথ্যেবাদীকে এই মুহূর্তে লোকে বিশ্বাস করছে, আর এবারে তাকে মিথ্যে বলতে হচ্ছে না, লোকে তার কথা শুনছেও বটে।

তার পক্ষে বিশেষ এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই যেন সে চটপট বলে চলল:

'বুঝলে ভাই, ডাক্তারের এসিস্ট্যান্ট বলেন যে এই নিগ্রো বাচ্চাটাকে যখন খাওয়ানো হচ্ছিল তখন সে বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় কী যেন বলে—মতলবটা হল, 'এই সুপ আরও দাও আমাকে...' ডাক্তারের হাত থেকে একবার পেয়ালাটা ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ডাক্তার দেন নি — অর্থাৎ কিনা, ভাই, একসঙ্গে অতটা চলবে না... মারা যাবে যে!'

'ছেলেটা তখন কী করল?'

'কিছু না, বশ মানল...'

এই সময় জলের টবের কাছে এসে হাজির হল ক্যাপ্টেনের আর্দালি সোইকিন, ক্যাপ্টেনের ফেলে দেওয়া চুরুটের টুকরো ধরাল সে। সেই মুহূর্তে সকলের মনোযোগ গিয়ে পড়ল আর্দালির ওপর। কে যেন জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা সোইকিন, নিগ্রো বাচ্চাটাকে নিয়ে পরে কী করা হবে সে ব্যাপারে কিছু শুনেছ নাকি?'

সোইকিনের চুল কটারঙের, মুখে ছুলির দাগ। লোকটা ফুলবাবু, তার গায়ে মিহি নেভিশার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। সোইকিন বেশ খানিকটা জাঁক করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল, কিছু কিছু সমাচার সম্পর্কে যেন সে ওয়াকিবহাল — এই রকম ভাব করে কর্তৃত্বের সুরে সে বলল:

'কী করা হবে? কেন, কেপ হোপে ছেড়ে দেওয়া হবে, মানে, যখন আমরা ওখানে পৌঁছুব আর কি।'

'কেপ হোপ' বলতে ও বোঝাতে চাইছিল কেপ অফ্ গুড হোপ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে চাল নিয়ে, খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে যোগ করল:

'ওর মতো কালোভূত কাফেরটাকে নিয়ে আর কীই বা করা যায়? ওদের একেবারে বুনোবর্বরও বলতে পার।'

'বুনোবর্বর হোক আর যা-ই হোক, সবাই হল ভগবানের জীব। করুণা করা দরকার!' জাহাজের বুড়ো ছুতোর জাখারিচ্ বলল।

ওখানে দঙ্গল বেঁধে যারা ধূমপান করছিল, জাখারিচের কথা সম্ভবত ওদের সকলের মনেই দাগ কাটল।

'কিন্তু নিগ্রো বাচ্চাটা সেখান থেকে বাড়ি ফিরবে কী করে? ওরও ত নিশ্চয় মা-বাপ আছে!' কে যেন মন্তব্য করল।

'কেপ হোপে অগুন্তি নিগ্রো। ওদের কেউ না কেউ ঠিক বার করে ফেলবে ও কোত্থেকে এসেছে,' সোইকিন জবাব দিল। চুরুটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে সে দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কারিস ত আর্দালিগিরি। নিজেকে ভাবে যেন কী না কী!' ও চলে যেতে বুড়ো ছুতোর রাগে গরগর করে বলল।

৪

যদিও খুবই দুর্বল, পরের দিন নিগ্রো বাচ্চাটা স্নায়বিক আঘাত এতখানি কাটিয়ে উঠেছে যে মাঝবয়সী মোটাসোটা সদাশয় ডাক্তার তাঁর স্বভাবসুলভ প্রশস্ত হাসি হেসে আদর করে ছেলেটির গালে মৃদু চাপড় দিলেন, তাকে গোটা এক পেয়ালা সুরুয়া খেতে দিলেন। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন ও গোগ্রাসে তরল পদার্থটা গিলল, তারপর বড় বড় ফুলো ফুলো কালো চোখ মেলে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সাদার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে তার চোখের কালো তারা।

এরপর ডাক্তারের জানার ইচ্ছে হল কীভাবে ছেলেটা সমুদ্রে পড়েছিল, কত দিনই বা না খেয়ে ছিল। কিন্তু ডাক্তারের ভাবব্যঞ্জক মূকাভিনয় সত্ত্বেও রোগীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা একেবারেই

অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নিগ্রো ছেলেটা ইংরেজিতে ডাক্তারের চেয়ে তুখোড় বলে মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু সে-ও মাননীয় ডাক্তারবাবুর মতোই, নিজের ভাণ্ডারে যে ডজন কয়েক ইংরেজি শব্দ ছিল, সেগুলিকে বিকৃত করে আর কিছু রাখছিল না।

ফলে কেউ কাউকে বুঝতে পারল না।

ডাক্তার তখন এক ছোকরা অফিসারকে ডেকে আনার জন্য তাঁর সহকারীকে পাঠালেন। অফিসারদের মেসে সকলে তাকে পেতিয়া বলে ডাকে।

'আপনি ত চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন, পেতিয়া। তা এর সঙ্গে একটু কথা বলুন দেখি। আমার আবার আসে-টাসে না!' হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার। 'হ্যাঁ, ওকে বলুন, দিন তিনেকের মধ্যে ও রোগীর কেবিন থেকে ছাড়া পাবে!' ডাক্তার যোগ করলেন।

ছোকরা ওয়ারেণ্ট অফিসারটি বাচ্চার শয্যার পাশে বসে জেরা করতে শুরু করল। সে চেষ্টা করল ধীরে ধীরে, আলাদা আলাদা করে ছোট ছোট বাক্য বলতে। নিগ্রো ছেলেটি বুঝতে পারছিল বলে মনে হল — অফিসার যা জিজ্ঞেস করছিল তার সবটা না হলেও অন্তত কিছুটা ত বটেই। সে-ও শব্দের যোগসূত্রের কোন বালাই না রেখে পরপর শব্দ জোড়াতালি দিয়ে চটপট জবাব দিতে লাগল, তবে ভাবগর্ভ অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলল।

নিগ্রো ছেলেটির সঙ্গে সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কথাবার্তার পর ওয়ারেণ্ট অফিসার ছেলেটির উত্তর আর তার ভাবভঙ্গির ভিত্তিতে অফিসারদের ঘরে সাধারণভাবে তার কাহিনীর মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য এক বিবরণ দিল।

ছেলেটা ছিল আমেরিকান দু মাস্তুলওয়ালা জাহাজ 'বেট্‌সিতে', তার ক্যাপ্টেনের কাছে ('বদমাইশের ধাড়ি' — ওয়ারেণ্ট অফিসারের মন্তব্য)। ছেলেটি ওর কাপড় আর জুতো সাফ করত, ওকে ব্র্যাণ্ডি দিয়ে কফি খাওয়াত, কিংবা বলা চলে কফি দিয়ে ব্র্যাণ্ডি। ক্যাপ্টেন তার চাকরকে 'বয়' বলে ডাকত, ছেলেটারও দৃঢ় বিশ্বাস যে এটাই ওর নাম। বাপ-মা'কে ও জানে না। বছরখানেক আগে ক্যাপ্টেন মোজাম্বিকে নিগ্রো বাচ্চাটিকে কেনে, রোজ ওকে প্রহার করত। বোঝাই নিগ্রো নিয়ে জাহাজ যাচ্ছিল সেনেগাল থেকে রিও-র দিকে। দুদিন আগে রাতের বেলায় অন্য একটি জাহাজের সঙ্গে 'বেট্‌সির' প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে (অফিসারের বলা কাহিনীর এ অংশের ভিত্তি হল এই যে নিগ্রো ছেলেটি 'দড়াম, দড়াম, দড়াম' বলে কয়েকবার দুর্বলভাবে কেবিনের দেয়ালে ঘুষি মারে), ওদের জাহাজ তলিয়ে যেতে থাকে। জলে পড়ে গিয়ে ছেলেটি নিজেকে মাস্তুলের ভাঙা টুকরোর সঙ্গে বেঁধে ফেলে। প্রায় পুরো দুটো দিন তার ওপর কাটিয়ে দেয়...

কিন্তু নিজের ভয়াবহ জীবন সম্পর্কে ফলাও করে কিছু বলার সামর্থ্য যদি ছেলেটির থাকতও, তার চেয়েও বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেল ওর প্রতি দয়ার জন্য বিস্ময়ের ভাব, তার বিধ্বস্ত চেহারা এবং ডাক্তার, ডাক্তারের সহকারী ও ওয়ারেণ্ট অফিসারের দিকে কোণঠাসা কুকুরের মতো সে যেমন কৃতজ্ঞতাভরে তাকাচ্ছিল সেই দৃষ্টি, আর সবচেয়ে বড় কথা — তার হাড়পাঁজরা বার করা রোগা, কালো চকচকে পিঠভর্তি ক্ষতচিহ্ন।

ওয়ারেণ্ট অফিসারের বিবরণ আর ডাক্তারের সাক্ষ্য অফিসারদের ঘরে অফিসারদের মনে গভীর দাগ কাটল। একজন বলল যে কেপটাউনে রুশ কন্সালের ওপর বেচারি ছেলেটির ভার দেওয়া হোক, আর অফিসাররা নিগ্রোটির জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলুক।

নিগ্রো বাচ্চাটির জীবনেতিহাস সম্ভবত আরও বেশি রেখাপাত করল নাবিকদের মনে, যখন সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে ওয়ারেণ্ট অফিসারের ছোকরা আর্দালি আর্তেমি মুখিন — যাকে সকলে আর্ত্যুশকা বলে ডাকত — জাহাজের সামনের ডেকে ওয়ারেণ্ট অফিসারের কাহিনীটি ব্যক্ত করল। তাছাড়া এই মার্কিন ক্যাপ্টেনটি যে কত বড় শয়তান ছিল তার সাক্ষ্যস্বরূপ খানিকটা হিংস্র উল্লাসবশত সে কাহিনীটাতে কিছু কিছু রং চড়ানোর লোভও সামলাতে পারল না।

'রোজই ভাই ও নিগ্রো ছেলেটার ওপর অত্যাচার করত। কিছু হোক না হোক, দিল দাঁতের ওপর ঘুষি চালিয়ে — একবার, দুবার, তিনবার — সঙ্গে সঙ্গে রক্ত। তারপর দেয়ালের আংটা থেকে খুলে নেবে চাবুক — আর চাবুক কি ভাই, বেপরোয়া চাবুক, সবচেয়ে পুরু চামড়ার বেল্ট। চলে নিগ্রো ছেলেটার ওপর দমাদ্দম পিটুনি!' নিগ্রো বাচ্চাটার জীবন যতদূর সম্ভব ভয়ঙ্কর করে দেখানো যায় সেই ইচ্ছার তাড়নায় নিজস্ব কল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আর্ত্যুশকা বলে চলল। 'পাষণ্ডটা ভেবেও দেখত না, নিগ্রো হোক আর যে-ই হোক, তার সামনে আছে একটা অসহায় ছোট ছেলে... বেচারার পিঠে এখনও চাবুকের দাগ। ডাক্তার বলেছেন, দেখতে ভয়ঙ্কর!' আবিষ্ট হয়ে, আবেগের সঙ্গে ও যোগ করল।

নাবিকেরা নিজেরাই এককালে ছিল ভূমিদাস। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাদের জানা ছিল কী ভাবে এই কিছুদিন আগেও তাদের পিঠের ওপর 'দাগ পড়ত'। আর্ত্যুশকার অতিরঞ্জনের কোন দরকার ছিল না। অমনিতেই নিগ্রো ছেলেটি ওদের করুণার উদ্রেক করল, ওরা আমেরিকান ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে চরম শাপশাপান্ত করল — অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে শয়তানটাকে হাঙ্গরে গিলে থাকে।

'আমাদের চাষীরা ত এর আগেই মুক্তি পেয়েছে, এদের — এই আমেরিকানদের তা হলে এখনও ভূমিদাস আছে?' এক প্রবীণ নাবিক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ আছে ত বটেই!'

'তাজ্জব ব্যাপার! কে বলবে যে ওরা স্বাধীন জাত!' প্রবীণ নাবিকটি টেনে টেনে বলল।

'ওদের কাছে নিগ্রোরা এক ধরনের ভূমিদাস!' আর্ত্যুশকা ব্যাখ্যা করে বলল। অফিসারদের ঘর থেকে সে এরকম কিছু শুনে এসেছে। 'এই নিয়ে ওদের নিজেদের ভেতরেই লড়াই চলছে।* মানে, একদল মার্কিন চাইছে তাদের ওখানে যত নিগ্রো আছে তারা সব্বাই যেন মুক্তি পায়, অন্যেরা এতে কিছুতেই রাজী নয় — এরা হল সেই সব লোক, যাদের নিগ্রো ভূমিদাস আছে — তাই নিজেদের মধ্যে দারুণ মারপিট চলছে!.. কেবল ভদ্দরলোকেরা বলছেন, যে-সব মার্কিন

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, সে সময়কার কথা। (টীকা লেখকের।)

নিগ্রোদের পক্ষে তারাই জিতবে! মার্কিন জমিদারদের দফা রফা করে দেবে!' তৃপ্তির সঙ্গে যোগ করল আর্তুশকা।

'প্রভু নিশ্চয়ই ওদের সহায় হবেন। নিগ্রোরও ত স্বাধীন ভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। পাখি যে পাখি, সে-ও খাঁচা পছন্দ করে না, আর মানুষের ত কথাই নেই!' বলল ছুতোর জাখারিচ্।

অল্পবয়স্ক কালোমতো যে নাবিকটি এই প্রথম বছর কাজ করছে, যে কিনা জাহাজের চাকরি 'বিপতের' বলে মন্তব্য করেছিল, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাবার্তা শুনছিল। শেষে জিজ্ঞেস করে বসল:

'এখন তাহলে, আর্তুশকা, এই নিগ্রো ছেলেটা স্বাধীন হবে?'

'তা নয় ত কী? স্বাধীন যে হবে সে ত জানা কথাই!' আর্তুশকা জোর দিয়ে বলল বটে, কিন্তু নিগ্রো বাচ্চাটার স্বাধীনতার ব্যাপারে সে মনে মনে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছিল না, কেননা সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মার্কিন আইন সম্পর্কে তার সুনির্দিষ্ট কোন ধারণাই ছিল না।

কিন্তু তার নিজস্ব বিবেচনা তাকে জোর দিয়ে একথাই বলল যে ছেলেটি মুক্তি পাবে। 'পাষণ্ড ক্যাপ্টেনটা' নেই, মাছের খোরাক হয়েছে, সুতরাং আর কোন কথাই উঠতে পারে না।

ও তাই যোগ করল:

'এখন কেবল কেপ হোপে পৌঁছে নিগ্রো ছেলেটার দরকার নতুন পাচ্পোর্ট্। পাচ্পোর্ট্ পেলে তখন আর ওকে পায় কে? যেখানে খুশি যাও।

পাসপোর্টের সঙ্গে ব্যাপারটা যোগ করতে পেরে তার সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন ঘটল।

'ঠিক, যা বলেছ!' সোৎসাহে সায় দিয়ে বলল কালো চুলওয়ালা নবাগত নাবিকটি।

সঙ্গে সঙ্গে তার লালচে ভালোমানুষ-ভালোমানুষ মুখ আর কুকুরছানার মতো মমতা মাখানো চোখজোড়া বেচারা নিগ্রো বাচ্চাটার জন্য স্বস্তির আনন্দে নীরব হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ক্ষণস্থায়ী প্রদোষের পর দেখতে দেখতে নেমে এলো গ্রীষ্মমণ্ডলের অপরূপ মধুর রাত। আকাশের বুকে জ্বলে উঠল অযুত তারা, উজ্জ্বল মিটমিট করতে লাগল মখমলি স্বপ্নরাজ্য। দূরে সমুদ্র কালো হয়ে এলো, জাহাজের গায়ের কাছে ও তার পেছন দিকে জলরাশি ফসফরাস আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল।

শিগ্গিরই প্রার্থনার সঙ্কেত বেজে উঠল। এর পর বদলি পাহারাদাররা খাটিয়া নিয়ে জাহাজের ডেকের ওপর ঘুমোতে গেল।

এদিকে প্রহরারত নাবিকেরা দড়িদড়ার পাশে জায়গা করে নিয়ে নিচু গলায় গুলতানি করে সময় কাটাতে লাগল। সেই রাতে বহু লোকের মধ্যেই নিগ্রো বাচ্চাটাকে নিয়ে জটলা চলে।

৫

দুদিন বাদে যথারীতি সকাল সাতটায় রোগীর কেবিনে প্রবেশ করে তাঁর একমাত্র রোগীকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার সিদ্ধান্ত করলেন যে সে এখন সেরে উঠেছে, বিছানা ছেড়ে উঠে ওপরের ডেকে যেতে পারে, নাবিকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতে পারে। ডাক্তার বেশির ভাগই আকারে ইঙ্গিতে নিগ্রো বাচ্চাটিকে তা জানালেন। ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তার মনে ফুর্তি দেখা দিয়েছে। এবারে সে ইঙ্গিতগুলো তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলল। মনে হচ্ছিল সে যে এই সেদিন মরতে মরতে বেঁচে গেছে তা যেন এখন আর তার মনেই নেই। ওপরে গিয়ে রোদ পোহানোর দারুণ ইচ্ছে সংযত করতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি বেড ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তার গায়ে নাবিকের লম্বা শার্টটি একটা লম্বা থলের মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু ছোট্ট কালো মানুষটার গায়ে এমন একটা পোশাক দেখে ডাক্তার মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন, তাঁর সহকারীও হেসে কুটপাট; তাতে নিগ্রো ছেলেটি কিছুটা থতমত খেয়ে গেল — সে কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। ডাক্তার কেন হাসছেন আর তার জামা ধরে টানছেন তা ওর সম্পূর্ণ বোধগম্য হচ্ছিল না।

তখন সে চটপট জামা খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দরজার দিকে ছুট মারতে গেল, কিন্তু ডাক্তারের সহকারী ওকে হাত ধরে আটকে দিল। ডাক্তার তখনও হাসছেন আর বলে চলছেন:

'নো, নো, নো...'

এর পর আবার আকারে-ইঙ্গিতে নিগ্রোকে তার বস্তা ধরনের জামা পরতে বলা হল।

'ওকে কী পরতে দেওয়া যায়, ফিলিপভ্?' বিব্রতভাবে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সহকারীকে। 'এ নিয়ে ত আমরা মাথা ঘামাই নি, ভাই...' সহকারী লোকটি বছর তিরিশেকের, বাবু ধরনের, তার মাথার চুল কোঁকড়া।

'যা বলেছেন স্যার, এটা মাথায়ই আসে নি। আচ্ছা এখন যদি ওর জন্যে একটা জামা, মানে ধরুন, স্যার, হাঁটু অবধি একটা জামা কাটা যায় — বলেন ত কোমরে একটা বেল্টও লাগানো যেতে পারে — তা হলে কিন্তু দিব্যি 'রেসপেক্টিভ্' দেখাবে স্যার,' সহকারী পরিশেষে জানাল। পল্লবিত ভাষা, কিংবা নাবিকেরা যাকে 'চোখাল' বলে — সে রকম ভাষা বলতে গিয়ে উল্টো-পাল্টা শব্দ ব্যবহারের বদ অভ্যেস এই লোকটির ছিল।

'রেসপেক্টিভ্? তার মানে?' ডাক্তার মুচকি হাসলেন।

'হ্যাঁ তাই-ই ত... রেসপেক্টিভ্। 'রেসপেক্টিভ্' মানে কী তা সবারই জানা আছে বলে মনে হয়, স্যার!' ক্ষুব্ধ স্বরে সহকারী বলল। 'মানে, সুন্দর আর আরামের।'

'জানি না তুমি যে 'রেসপেক্টিভ্' বলছ তা হবে কিনা। তবে ভাই, যেটা হবে তা হল দারুণ হাসির ব্যাপার। যাই হোক, ছেলেটাকে ত আপাতত কিছু একটা পরানো দরকার, যতক্ষণ না ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে ওর মাপসই একটা পোশাক তৈরী করাতে পারছি।'

'ভালো পোশাক একটা সেলাই করিয়ে নেওয়া খুবই সম্ভব। জাহাজে নাবিকদের মধ্যে দর্জিও আছে। সেলাই করে দেবে।'

'তাহলে তোমার 'রেসপেক্টিভ্' পোশাকটার বন্দোবস্ত কর!'

এমন সময় রোগীর কেবিনের দরজায় কে যেন সন্তর্পণে, ভদ্রভাবে টোকা দিল।

'কে ওখানে? ভেতরে এসো,' ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন।

দরজার সামনে প্রথমে দেখা দিল লালচে, সামান্য ফুলো ফুলো, সাদাসিধে একটা মুখ, তাকে দুপাশ থেকে বেড় দিয়ে রেখেছে কটারঙের জুলপি, নাকের রঙটা সন্দেহজনক, চোখদুটো টসটসে, প্রাণবন্ত, ভালোমানুষ-ভালোমানুষ। তার পরেই বেরিয়ে এলো গোটা একটা শরীর — ছোটখাটো, শুকনো গোছের, তবে বেশ সুগঠিত, শক্তসমর্থ — লোকটা হল সামনের মাস্তুলের নাবিক ইভান লুচ্কিন।

বয়স্ক নাবিক, বছর চল্লিশেক বয়স, পনের বছর ধরে নৌবাহিনীতে কাজ করছে। জাহাজের সেরা নাবিকদের একজন, কিন্তু পারে গিয়ে পড়লেই বেপরোয়া মাতাল। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে পারে সে নিজের সব জামাকাপড় মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে একমাত্র অন্তর্বাস পরে জাহাজে এসেছে, পরের দিন সকালে দিব্যি নির্বিকার ভাব করে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করেছে।

'আমি, স্যার,' বড় বড় মাপের শিরা-ওঠা খালি পা ফেলে এগিয়ে আসতে আসতে ভাঙা ভাঙা গলায় লুচ্কিন বলল। তার আলকাতরা মাখা খসখসে হাত দিয়ে সে অপ্রতিভভাবে তার ট্রাউজারটা টানছিল।

অন্য হাতে একটা পুঁটলি।

ডাক্তারের দিকে তাকাতে তার চোখেমুখে এমন একটা সলজ্জ অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল যা সচরাচর দেখা যায় মাতালদের মধ্যে, মোটের ওপর সেই সব লোকের মধ্যে যারা নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন।

'কী ব্যাপার, লুচ্কিন?.. অসুখবিসুখ করেছে নাকি?'

'মোটেই না, স্যার, আমি নিগ্রো ছেলেটার জন্যে এই একটা পোশাক নিয়ে এসেছি। ভাবলাম, পরনের কিছু নেই, তাই সেলাই করলাম, মাপ আগেই নিয়েছিলাম। যদি অনুমতি করেন ত দিই, স্যার।'

'তা দাও, ভাই... বড় খুশি হলাম,' ডাক্তার বললেন, তিনি খানিকটা অবাকও হলেন। 'ছেলেটাকে কী পরতে দেওয়া যায় আমরা সে কথাই ভাবছিলাম। তুমি দেখছি আমাদের চেয়েও আগে ওর ব্যাপারে ভেবে রেখেছ।'

'ফাঁকা সময় ছিল, স্যার,' লুচ্কিন প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে বলল।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকাপড়ের পুঁটলি থেকে নাবিকদের জামার মতো ছোট্ট একটা জামা বার করল আর বার করল ঐ রকমই একটা ট্রাউজার — ক্যাম্বিসের তৈরী। জামা আর ট্রাউজার ঝেড়েঝুড়ে সে অভিভূত ছেলেটির হাতে দিল। আগে যেমন অপরাধী-অপরাধী ভাব

করে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিল এখন আর লুচ্কিনের কণ্ঠে মোটেই সে সুর নেই—সে খুশি হয়ে নিগ্রোটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলল:

'ধর, মাক্সিমকা! ভাই রে, এই পোশাকটা — যাকে বলে ভেরি গুড্। পর, যত খুশি পর, আমি একটু দেখি কেমন ফিট করে। দেখি, গায়ে চাপাও দেখি, মাক্সিমকা!'

'ওকে তুমি মাক্সিমকা বলে ডাকছ কেন?' হেসে বললেন ডাক্তার।

'তাছাড়া আর কী বলব, স্যার? মাক্সিমকাই ত, কেননা ওকে বাঁচানো হয় সেণ্ট মাক্সিমের দিনে। তাই ও হল মাক্সিমকা। তাছাডা ছেলেটার কোন নাম-টাম নেই, কিন্তু একটা কিছু বলে ওকে ডাকতে হবে ত।'

নাবিকের নতুন পরিষ্কার পোশাক গায়ে দিয়ে ছেলেটির আনন্দ আর ধরে না। মনে হয় এমন পোশাক ও আর কখনই পরে নি।

লুচ্কিন বিভিন্ন কোণ থেকে নিজের হাতের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শার্টটা এখানে একটু টেনে, ওখানে একটু হাত বুলিয়ে সমান করে দিল, দেখল পোশাক একেবারে নিখুঁত হয়েছে।

'আচ্ছা, এবারে ওপরে যাওয়া যেতে পারে, মাক্সিমকা। রোদে শরীর গরম কর, মাক্সিমকা! যদি বলেন ত নিয়ে যাই, স্যার।'

ডাক্তার উদার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। নাবিক নিগ্রো ছেলেটির হাত ধরে ওকে সামনের ডেকে নিয়ে গেল, অন্য নাবিকদের কাছে ওকে দেখিয়ে বলল:

'এই হল মাক্সিমকা! বদমাশ মের্কিনটাকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে, ও জানে যে রুশী নাবিকরা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না।'

এই বলে লুচ্কিন আদর করে ছেলেটার কাঁধে মৃদু চাপড় মারল, তারপর ওর কোঁকড়া চুলভর্তি মাথা দেখিয়ে বলল:

'হুঁ হুঁ ভাই, টুপিও হবে... জুতোও বানিয়ে দেওয়া যাবে, রসো না!'

ছেলেটা কিছুই বুঝল না, তবে নাবিকদের রোদে পোড়া এই সব মুখ আর সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ তাদের হাসি থেকে সে অনুভব করতে পারল যে ওকে কেউ আঘাত দেবে না।

তাই সেও তার একান্ত আপন দখিনা সূর্যের প্রখর কিরণ উপভোগ করতে করতে আনন্দে ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করল।

সে দিন থেকে সকলেই তাকে মাক্সিমকা বলে ডাকতে শুরু করল।

৬

নাবিকের পোশাকে নিগ্রোটিকে সামনের ডেকে নাবিকদের সামনে হাজির করে ইভান লুচ্কিন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল যে সে মাক্সিমকার দেখাশোনা করবে, তাকে নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখবে; তার মতে, এটা তার ন্যায্য অধিকার, যেহেতু সে ছেলেটাকে 'সাজপোশাক' পরিয়েছে, তাকে — ওর নিজের কথায় — 'যুতসই ডাক নাম' দিয়েছে।

এই অস্থিচর্মসার, রোগা নিগ্রো ছেলেটা যে তার জীবনপ্রভাতেই মার্কিন ক্যাপ্টেনের কাছে এত নির্যাতন ভোগ করেছে, বিশেষ করে যার নিজের জীবনও এককালে মধুর ছিল না, এমন এক সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নাবিকের হৃদয়েও যে সে অসাধারণ করুণা জাগ্রত করেছে এবং ওর জাহাজের জীবনকে যতদূর সম্ভব প্রীতিকর করে তুলতে মনে মনে একটা ইচ্ছে জাগিয়ে তুলেছে — সে ব্যাপারে লুচ্‌কিন কিন্তু একটি কথাও বলল না। সাধারণ রুশীদের মতোই নিজের অনুভূতিকে অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠা বোধ করে। সম্ভবত এই কারণেই মাক্সিমকাকে দেখাশোনা করার বাসনাকে সে নাবিকদের কাছে বিশেষ করে এই বলে ব্যাখ্যা করল যে 'নিগ্রো বাচ্চাটা, ভাই, মজাদার — অনেকটা বাঁদরের মতো।'

পেত্রোভ্ নামে নাবিকটি ছিল অন্যের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। এ ব্যাপারে তার কুখ্যাতি ছিল। গোবেচারী ও ভীরু স্বভাবের 'নবাগত' নাবিকদের উত্ত্যক্ত করতে সে ভালোবাসত। লুচ্‌কিন তাই নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বেশ স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিল যে 'অনাথ ছেলেটার' সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে এমন কাউকে যদি দেখা যায় — যাকে 'সরাসরি ইতর বলতে হয়'—তাহলে তার সঙ্গে ওর—ইভান লুচ্‌কিনের এক চোট হয়ে যাবে।

'মনে থাকে যেন, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব!' এক চোট দেখে নেওয়ার অর্থটা কী, তা ব্যাখ্যা করে বলার জন্যই যেন সে যোগ করল। 'ছোটদের মনে কষ্ট দেওয়া — মহা পাপ... সে যে-ই হোক না কেন — খ্রেস্টান জাতের হোক আর নিগ্রোই হোক, বাচ্চা — বাচ্চাই। ওর মনে কষ্ট দেওয়া চলবে না বাপু!' লুচ্‌কিন তার বক্তব্য শেষ করল।

সব নাবিকই মাক্সিমকার ওপর লুচ্‌কিনের অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা সোৎসাহে মেনে নিল, যদিও নিজের ওপর স্বেচ্ছায় সে যে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তা কতখানি উৎসাহের সঙ্গে পালন করতে পারবে এ ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ ছিল।

ওদের কথা হল, ওর মতো একটা 'ডাকাবুকো খালাসি' আর পাঁড় মাতাল নিগ্রো বাচ্চাটার ঝামেলা কী করে সামলাবে?

বুড়ো নাবিকদের মধ্যে কে একজন বেশ ঠাট্টার সুরেই জিজ্ঞেস করল:

'এখন তাহলে তুমি বলতে গেলে মাক্সিমকার ধাই হলে, কী বল, লুচ্‌কিন?'

'তা যা বলেছ, ধাই-ই বটে!' ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বাঁকা হাসির তোয়াক্কা না করে অমায়িক হাসি হেসে লুচ্‌কিন বলল। 'তা ভাই আমি কি ধাই হওয়ার যুগ্যি নই? বড়লোকের ছাওয়ালের ত আর হতে যাচ্ছি না!.. এই কালোচামড়ার ছেলেটার সাজগোজ বলতে আর কী আছে বল? আরেক পরস্থ জামাকাপড়, জুতো আর টুপি বানিয়ে দিতে হবে। সরকারী ইস্টোর থেকে যাতে জিনিস মেলে তার জন্যি ডাক্তরবাবু চেষ্টা-চরিত্তির করবেন... কেপ হোপে মাক্সিমকাকে যখন একা একা ছেড়ে যাব তখন যেন রাশিয়ার জাহাজীদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ওর মনে থাকে। ওকে অন্তত ন্যাংটো থাকতে হবে না।'

'কিন্তু এই নিগ্রো ছেলেটার সঙ্গে তুমি বার্তাচিত্ করবে কী করে, ল্যুচ্‌কিন? না ব্যঝবে তুমি ওর কথা, না ও তোমার কথা!'

'সে আমরা ঠিক করে নেব! কথাবার্তা ঠিকই চালানো যাবে!' কোন এক দ্যুর্জ্ঞেয় বিশ্বাস নিয়ে ল্যুচ্‌কিন বলল। 'ও নিগ্রো হলে কী হবে, দিব্যি চালাকচতুর। আমি, ভাই, ওকে চটপট আমাদের ভাষা শিখিয়ে নেব। ও ব্যঝতে পারবে।'

ল্যুচ্‌কিন সস্নেহে নিগ্রো বাচ্চাটির দিকে তাকাল। সে তখন জাহাজের দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে চারদিকে কৌতূহলভরে তাকাচ্ছিল।

ল্যুচ্‌কিনের ভালোবাসা ও দরদে পরিপ্যর্ণ চাউনি লক্ষ্য করে জবাবে সে-ও দাঁত বার করে হাসল, কৃতজ্ঞতার প্রশস্ত হাসি হাসল — এই নাবিকটি যে তার বন্ধ্য তা সে ভাষা ছাড়াই ব্যঝতে পেরেছে।

সাড়ে এগারোটায় সকালের সমস্ত কাজের পাট চুকে যেতে ডেকের ওপর ভোদকা এলো। দ্যুজন সারেঙ্গ আর আটজন জ্যুনিয়ার অফিসার ডেকের মাঝখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হ্যুইসিল বাজিয়ে ভোদকা পানের আমন্ত্রণ জানাল। নাবিকেরা রসিকতা করে এর নাম দিয়েছে 'ব্যুলব্যুলের গান'। ল্যুচ্‌কিন সঙ্গে সঙ্গে খ্যুশিভরে হাসতে হাসতে ছেলেটাকে ইসারায় নিজের ম্যুখ দেখিয়ে দিয়ে তাকে ওখানে বসে অপেক্ষা করতে বলল। সে নিজে বাচ্চাটাকে কিছ্যুটা হতভম্ব অবস্থার মধ্যে রেখে কোয়ার্টার ডেকের দিকে ছ্যুটল।

তবে তার এই হতভম্ব ভাব শিগ্‌গিরই কেটে গেল।

গোটা ডেকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল ভোদকার তীব্র গন্ধ। কোয়ার্টার ডেক থেকে নাবিকেরা তাদের আলকাতরা মাখা খসখসে হাতে নাক ম্যুছতে ম্যুছতে ম্যুখে একটা গম্ভীর পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে দলে দলে ফিরে আসছিল। এ থেকে নিগ্রো ছেলেটার মনে পড়ে গেল যে 'বেট্‌সিতে'ও সপ্তাহে একবার নাবিকদের এক গেলাস করে রাম দেওয়া হত; ক্যাপ্টেন অবশ্য রোজই তা গিলত — ছেলেটির মনে হয় — মাত্রাতিরিক্তই।

বড় এক গেলাস ভোদকা টেনে ল্যুচ্‌কিন এবার খ্যুশিতে ডগমগ হয়ে মাক্সিমকার কাছে ফিরে এলো, সানন্দে ওর পিঠ চাপড়াল এবং নিজের মধ্যুর অভিজ্ঞতার ভাগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলল:

'খাসা ভোদকা! ভেরি গ্যুড্, ব্যুঝলে, মাক্সিমকা?'

মাক্সিমকা সায় দিয়ে মাথা নেড়ে উচ্চারণ করল:

'ভেরি গ্যুড্!'

তার এই দ্রুত উপলব্ধিক্ষমতায় ল্যুচ্‌কিন উল্লসিত হয়ে বলল:

'সাবাস মাক্সিমকা! সবই বোঝ দেখছি... আচ্ছা এবারে ত খেতে যেতে হয়। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

এই বলে নাবিক বেশ দেখার মতো করে হাঁ করে চোয়াল নাড়াল।

এটা ব্যুঝতেও অস্যুবিধা হল না, বিশেষ করে ছেলেটি যখন দেখতে পেল যে নাবিকদের

মেসের লোকজন কাঠের বাটিতে বাঁধাকপির স্যুপ নিয়ে একের পর এক নিচ থেকে ডেকের ওপর উঠে আসছে, আর স্যুপ থেকে উঠছে রুচিকর ধোঁয়া. ক্ষুধা উদ্রেককারী সুস্বাদু গন্ধ।

নিগ্রো ছেলেটিও রীতিমতো অর্থপূর্ণ ভাব করে মাথা নাড়ল, আনন্দে তার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

'ওঃ সবই বুঝতে পার দেখছি! মাথা আছে!' লুচ্‌কিন বলল। এখনই সে ছেলেটাকে এবং ওর সঙ্গে বোঝাবার মতো করে কথা বলার ক্ষমতায় নিজেকে সে বেশ খানিকটা তারিফ না করে পারছে না। সে মাক্সিমকাকে হাত ধরে নিয়ে গেল।

তের্‌পলে ঢাকা ডেকের ওপর ইতিমধ্যে জনা বারো করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাঁধাকপির স্যুপের ধূমায়মান বাটির চারধারে পা গুটিয়ে বসেছে নাবিকেরা। ক্রন্‌স্টাড্‌টের টকানো বাঁধাকপির স্যুপ। সাধারণ লোকেরা সচরাচর যেমন করে খায়, ওরাও তেমনি চুপচাপ, গম্ভীরভাবে স্যুপের মধ্যে শুকনো রুটি ভিজিয়ে গবগব করে খেয়ে চলেছে।

ভোজনরতদের মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে পথ করে লুচ্‌কিন ছেলেটাকে নিয়ে নিজের দলের দিকে চলল। ওরা ছিল প্রধান ও সামনের মাস্তুলের মাঝখানে। নাবিকেরা তখনও খাওয়া আরম্ভ করে নি — ওরা লুচ্‌কিনের প্রতীক্ষায় ছিল। লুচ্‌কিন তাদের উদ্দেশ করে বলল:

'কী ভাই, মাক্সিমকাকে তোমরা দলে নেবে ত?'

'আহা, কী কথাই বললে! বসে পড় ছেলেটাকে নিয়ে!' বলল বুড়ো ছুতোর জাখারিচ্‌।

'আর কারও হয়ত... কী বল তোমরা সবাই?' লুচ্‌কিন আবার জিজ্ঞেস করল।

সকলেই সমস্বরে বলল যে নিগ্রো ছেলেটা তাদের দলে বসতে পারে। ওরা সকলে সরে দুজনেরই বসার জায়গা করে দিল।

এবারে চারদিক থেকে হাসিঠাট্টা শোনা গেল:

'তোমার মাক্সিমকা ত আর সব খেয়ে ফেলবে না!'

'সবটা মাংসও সাবাড় করতে পারবে না!'

'ওর জন্যে — তোমার নিগ্রো ছেলেটার জন্যে — চামচও আছে হে।'

'আরে ভাই, আমার বলার কারণ এই যে ও নিগ্রো... মানে বেজাত কিনা...' বাটির ধারে বসে পড়ে নিজের পাশে মাক্সিমকাকে বসিয়ে দিয়ে লুচ্‌কিন বলল, 'তবে আমি একটা কথা বলি কি, ভগবানের চোখে সবাই সমান। রুটি খেতে সকলেরই ইচ্ছে করে...'

'তা নয় ত কী? প্রভু জগতের সকলকেই ক্ষমার চোখে দেখেন। তিনি কাউকে আলাদা করে দেখেন বলে মনে হয় না। ঐ আর্দালি সোইকিনটার মতো বুদ্ধুই কেবল কোন রকম যুক্তি তক্কের ধার ধারে না — জাত-বেজাত নিয়ে বকবক করে!' আবার বলল জাখারিচ্‌।

মনে হল, সবাই জাখারিচের মতে সায় দিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ যে কোন জাত আর ধর্মাবলম্বী লোকজনের সঙ্গে রুশী নাবিকদের পরিচয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতিই ওরা অপূর্ব সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে।

একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ওরা মাক্সিমকাকে দলে টেনে নিল। একজন তাকে একটা কাঠের চামচ দিল, অন্যজন এগিয়ে দিল ভেজানো রুটির টুকরো। সকলেই চুপ-মেরে-যাওয়া ছেলেটার দিকে সস্নেহে তাকাতে লাগল। দেখা যাচ্ছে ছেলেটা সাদা চামড়ার লোকজনের কাছ থেকে বিশেষ খাতির-যত্ন পেতে অভ্যস্ত নয়। এরা যেন তাদের চোখের দৃষ্টিতে ওকে অভয় দিচ্ছিল।

'এবারে তাহলে শুরু করতে হয়, নইলে সুপ ঠান্ডা মেরে যাবে!' জাখারিচ্ মন্তব্য করল।

সকলে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সুপ খেতে শুরু করল।

'আরে, তুমি খাচ্ছ না কেন, মাক্সিমকা, অ্যাঁ? খা রে, বোকা! বাঁধাকপির সুপ, ভাই, দারুণ সোয়াদ। গুড্ সুপ্!' লুচ্‌কিন চামচ দেখিয়ে বলল।

কিন্তু নিগ্রো বাচ্চাটাকে জাহাজে কখনই সাদা চামড়ার লোকদের সঙ্গে বসে খেতে দেওয়া হত না — অন্ধকার কোন এক কোনায় বসে বসে সে ওদের পাত-কুড়ানো খাবার খেত। তাই ওর সাহস হচ্ছিল না, যদিও লোলুপ দৃষ্টিতে সুপের দিকে সে তাকিয়ে ছিল, তার জিভে জল এসে গিয়েছিল।

'ওঃ কী ভীতু রে! দেখা যাচ্ছে ঐ বদমাশ মের্কিনটা ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে আর কিছু রাখে নি!' জাখারিচ্ বলল। সে মাক্সিমকার পাশেই বসে ছিল।

এই বলে বুড়ো ছুতোর মাক্সিমকার কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিল, নিজের চামচটা ওর মুখের কাছে এনে ধরল।

এর পর মাক্সিমকার ভয় ভেঙ্গে গেল। কয়েক মিনিট বাদে সে মহা উৎসাহে সাঁটিয়ে চলল বাঁধাকপির সুপ, তারপর ঝুরঝুরে জারান মাংস আর মাখন দিয়ে কাউনের পরিজ।

লুচ্‌কিন ঘন ঘন বাহবা দিয়ে বারবার বলে চলল:

'এই ত চাই, মাক্সিমকা! ভেরি গুড্, ভাই। খাও, প্রাণ ভরে খাও!'

৭

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গোটা জাহাজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্রামরত নাবিকদের নাসিকা গর্জন। ঘুমায় নি কেবল পাহারাদারদের বিভাগ আর হিসেবী দু-একজন নাবিক, যারা অবসর সময়ের সুযোগ নিয়ে নিজেদের বুট আর জামা সেলাই করছে কিংবা তাদের পোশাকের কোন অংশ রিপু করছে।

এদিকে 'জাবিয়াকা' অনুকূল আয়ন বাতাসে এগিয়ে চলছে ত চলছেই। ভয়ংকর মেঘ ধেয়ে এলে সাময়িকভাবে নাবিকদের পাল গুটিয়ে ফেলতে হয়, যাতে গ্রীষ্মমন্ডলের প্রবল ঝঞ্ঝা আর মুষলধার বৃষ্টির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা যায়, অর্থাৎ মাস্তুল খালি করে তার ক্ষিপ্ততার সামনাসামনি বাধার ক্ষেত্রটা কমিয়ে রাখতে হয়। যতক্ষণ না সে রকম কিছু হচ্ছে ততক্ষণ পাহারাদারদের কিছুই করার নাই।

কিন্তু দিকচক্রবাল নির্মল। কোন পাশ থেকেই দেখা যায় না সেই ধূসর ছোট বিন্দুটি, যা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠে বিশাল কালো মেঘের আকার ধারণ করে, দিকচক্রবাল আর সূর্যকে ঢেকে ফেলে। প্রচণ্ড দমকা বাতাসে জাহাজ একপাশে কাত হয়ে পড়ে, প্রবল বৃষ্টির ধারা ডেকের ওপর ঝাপ্‌টা মারে, সকলকে ভিজিয়ে সপ্‌সপে করে দেয়, তারপর ঝড়টা যেমন আসে তেমনই দ্রুত গতিতে আরও দূরে চলে যায়। গর্জন আর বর্ষণের একশেষ — পরক্ষণেই অদৃশ্য।

আবার চোখ ধাঁধানো সূর্য, তার কিরণে চটপট শুকিয়ে যায় ডেক, দড়িদড়া, জাহাজের পাল আর নাবিকদের জামা। আবার নির্মেঘ নীল আকাশ, স্নিগ্ধ সমুদ্র; সে সমুদ্রের ওপর আবার সমস্ত পালের সাজ পরে একটানা আয়ন বাতাসের তাড়নায় ছুটে চলে জাহাজ।

এখনও চারদিকে অনুকূল পরিবেশ। জাহাজেও নীরবতা। 'নাবিকদল বিশ্রাম নিচ্ছে।' এই সময় বিশেষ জরুরী কোন দরকার না পড়লে নাবিকদের ব্যাঘাত করা হয় না — এ হল জাহাজের বহুকালের প্রথা।

লুচ্‌কিনও আজ ঘুমোচ্ছে না, সামনের মাস্তুলের ছায়ায় সে একটা জুতসই জায়গা করে নিয়েছে। পাহারাদাররা অবাক, কারণ তাকে সকলে 'কুম্ভকর্ণ' বলে জানে।

আপন মনে নাকিসুরে গুনগুন করে সে এক টুকরো ক্যাম্বিস কেটে জুতো বানাচ্ছিল। গানের কথাগুলি বোঝার সাধ্য নেই। মাক্সিমকা তার পাশে হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছিল। লুচ্‌কিন থেকে থেকে তার দিকে আর সাদা ট্রাউজার থেকে বেরিয়ে আসা তার কালো কালো পায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। উদ্দেশ্য এই যে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পরই ঐ পাজোড়ার যে মাপটা সে নিয়েছিল তা ঠিক আছে কিনা বিবেচনা করে দেখা।

দেখেশুনে মনে হচ্ছিল পর্যবেক্ষণ করে সে রীতিমতো আশ্বস্ত। তাই ছোট ছোট কালো পাজোড়ার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে সে কাজ করে যেতে লাগল।

ঘরছাড়া এই বেচারি ছেলেটির জন্য সে বানাতে চলেছে 'প্রথম শ্রেণীর' জুতো এবং প্রয়োজনীয় আরও সব কিছু — এই কথা ভেবে কেমন একটা প্রসন্ন ও উষ্ণ অনুভূতিতে এই পাষণ্ড পাঁড় মাতালটির মন ভরে উঠল। ইচ্ছে না থাকলেও এর পর তার সামনে ফুটে উঠল তার গোটা নাবিক জীবন, যার স্মৃতি বলতে মনে আসে রীতিমতো একঘেয়ে চিত্র — উচ্ছৃঙ্খল মাতলামি আর মদ খেয়ে সরকারী জিনিসপত্র উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঠ্যাঙানি খাওয়া।

লুচ্‌কিন কিছুটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করল যে সে যদি এরকম নির্ভীক নাবিক না হত, যে সব ক্যাপ্টেন ও সিনিয়র অফিসারের অধীনে সে কাজ করেছে, নিজের দুঃসাহসিকতা দিয়ে যদি তাদের খুশি না করতে পারত তাহলে বহুদিন আগেই তাকে কয়েদীদের কোম্পানিতে সামিল হতে হত।

'কাজের জন্যেই ওরা আমাকে দয়া করে!' ও স্বগতোক্তি করল, তারপর কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল, 'ওখানেই ত যত ফেচাং!'

সে যে জাহাজ তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া হয়ে মাতলামিতে মেতে ওঠে, একমাত্র ক্রন্‌স্টাড্‌ট

ছাড়া আর কোন শহরে পারের কাছাকাছি সরাইখানা থেকে বেশি দূরে যে সে কখনও যায় নি — এই কারণেই কি 'ফেচাং' শব্দটির উল্লেখ অথবা দুঃসাহসী মাস্তুল পাহারাদার হিশেবে তার ক্ষমতার জন্য কয়েদীদের কোম্পানির স্বাদ পায় নি বলে — এটা ঠিক বোঝা গেল না। তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না — জীবনের কোন এক 'ফেচাংয়ের' প্রশ্ন মনে জাগতে কয়েক মিনিটের জন্য লুচ্‌কিনের গুনগুনানি থেমে গেল, সে চিন্তায় ডুবে গেল। শেষ পর্যন্ত স্বগতোক্তি করল:

'একটা গরম কোর্তাও মাক্সিমকার লাগবে। কোর্তা ছাড়া আবার মানুষ কিসের?'

মধ্যাহ্নভোজের পর নাবিকদলের বিশ্রামের যে এক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল তার মধ্যে লুচ্‌কিন মাক্সিমকার জুতোর ওপরের অংশ কেটে ফেলল, সোলেরও বন্দোবস্ত করল। সোল দুটো নতুন, স্টোর থেকে আনা। সেদিন সকালেই এক হিসেবী নাবিকের কাছ থেকে ও দুটো ধারে নেওয়া হয়। লোকটা নিজের তৈরী জুতো পরে। লুচ্‌কিনের নিজেরই জানা আছে যে বিশেষ করে শক্ত মাটিতে পা পড়লে তার পক্ষে টাকাপয়সা হাতে রাখা ভারি কঠিন; তাই 'বিশ্বাস উদ্রেকের জন্য' সে-ই বন্দোবস্ত করল যে ওর মাইনে থেকে টাকা কেটে নিয়ে সারেঙ্গ ধার শোধ করবে।

সারেঙ্গের হুইসিল বেজে উঠল। তার পরই শোনা গেল 'গলাবাজ' সারেঙ্গ ভাসিলি ইয়েগোরভিচের কিংবা নাবিকেরা যাকে 'ইয়েগোরিচ্‌' বলে ডাকে — তার হুকুম। মাক্সিমকা তখনও কাদা হয়ে ঘুমুচ্ছিল। লুচ্‌কিন তাকে জাগাতে গেল। ভাবল, ছেলেটা যাত্রী হলে কী হবে, তার উচিত যে-কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে — প্রধানত ইয়েগোরিচ্‌ যাতে কিছু না বলতে পারে সেই উদ্দেশ্যে — নাবিকদের ধরনে যতদূর সম্ভব রুটিন মাফিক জীবন কাটানো। লুচ্‌কিনের মতে, ইয়েগোরিচ্‌ যদিও 'ভালোমানুষ', মারধর যদিও বা করে ত মিছিমিছি নয়, 'ভালোরকমের ভাবনাচিন্তা করার পর'; তবু বলা যায় না, মেজাজ চড়ে গেলে নিগ্রো বাচ্চাটিকে সামনে পেয়ে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের' অভিযোগে তার কানেও ঘুষি মেরে বসতে পারে। তার চেয়ে বরং নিগ্রো ছেলেটাকে আইনশৃঙ্খলা শেখানো ভালো।

'উঠে পড়, মাক্সিমকা!' ছেলেটার কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সস্নেহে বলল নাবিক।

মাক্সিমকা আড়মোড়া ভেঙ্গে চোখ খুলল, চারদিকে তাকাল। নাবিকেরা সকলে উঠে পড়ছে আর লুচ্‌কিনও নিজের কাজের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে দেখে মাক্সিমকা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, অনুগত কুকুরছানার মতো লুচ্‌কিনের চোখের দিকে তাকাল।

'আরে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মাক্সিমকা। ইস্‌, কী বোকা রে... সব তাতেই কেবল ভয়! এই দেখ ভাই, এটা হবে তোমার জুতো...'

কখনও মাক্সিমকার পা, কখনও বা কাটা ক্যাম্বিসের টুকরোটা দেখিয়ে লুচ্‌কিন যে তাকে কী বলছিল তা ও বুঝতে পারছিল না বটে, তবু ওকে সম্ভবত ভালো কিছু বলা হচ্ছে এই অনুভব করে সে একগাল হাসল। লুচ্‌কিনের ইসারায় বিশ্বস্ত ও অনুগতের মতো সে তার পিছু

পিছু চলল নাবিকদের ঘরের দিকে। সেখানে সে কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল লুচ্‌কিন কাপড়চোপড় ও পোশাকে ভর্তি ক্যাম্বিসের একটা সুটকেসের মধ্যে তার আধা তৈরী জিনিসটাকে রেখে দিল। এবারেও সে কিছু বুঝতে পারল না, কেবল কৃতজ্ঞতাভরে হাসল, যখন লুচ্‌কিন তার টুপি খুলে আঙ্গুল দিয়ে প্রথমে টুপির দিকে ইসারা করল, তারপর দেখাল নিগ্রো ছেলেটার মাথা — সে কথায় আর আকারে-ইঙ্গিতে বৃথাই বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে মাক্সিমকারও হবে সাদা খোলের এবং ফিতে জড়ানো অমন একটা টুপি।

তবে নিগ্রোটি তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিল সাদা চামড়ার এই মানুষগুলির মনোভাব, যারা 'বেট্‌সির' সাদা চামড়ার লোকদের চেয়ে একেবারেই অন্য ভাষায় কথা বলে। বিশেষ করে পাট রঙের চুলওয়ালা এই যে নাবিকটি — যার টুকটুকে নাকটি দেখলেই ওর মনে পড়ে যায় আস্ত একটা লঙ্কার কথা — তার সদয় ব্যবহার। লোকটা তাকে কী চমৎকার পোশাকই না উপহার দিয়েছে! সে ওকে ভালো ভালো খাবার খাইয়েছে, ওর দিকে এমন স্নেহদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে যেভাবে তার সারা জীবনেও কেউ তাকে দেখে নি — কেবল কোন একজনের ঠিকরানো বড় বড় কালো চোখজোড়া ছাড়া। সে চোখজোড়া এক কালো নারীমুখের ওপর বসানো।

সেই দরদভরা, স্নেহময় চোখদুটি তার মনের গহনে ছিল দূরের এক আবছা স্মৃতি হয়ে দীর্ঘ তালগাছ আর কলাপাতায় ছাওয়া কুটিরের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কি স্বপ্ন না শৈশবের অভিজ্ঞতা তা অবশ্যই ওর ব্যাখ্যা করে বলার সাধ্য ছিল না; কিন্তু এই চোখজোড়া কখন কখন স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার প্রতি মমতা প্রকাশ করত। আর এখন সে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছে সেই দরদভরা স্নেহমাখা চোখ।

তাছাড়া সব মিলিয়ে এই জাহাজ-জীবন তার কাছে মনে হচ্ছিল সেই সুন্দর স্বপ্নের মতো, যা কেবল ঘুমের ঘোরেই দেখা যেত। এই কিছু দিন আগেকার নিদারুণ নির্যাতন ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ দিনগুলির চেয়ে তা কতই না পৃথক!

টুপির ব্যাপারে বোঝানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে লুচ্‌কিন যখন সুটকেস থেকে একটা চিনির ডেলা বার করে মাক্সিমকাকে দিল তখন ত ছেলেটা রীতিমতো অভিভূত। সে নাবিকের কড়াপড়া খসখসে হাত চেপে ধরে লাজুক লাজুক ভাবে সোহাগভরে তার ওপর হাত বুলাতে লাগল, আদরে উদ্দীপ্ত একটা নির্যাতিত জীবের মর্মস্পর্শী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব নিয়ে সে লুচ্‌কিনের মুখের দিকে তাকাল। এই কৃতজ্ঞতায় তার চোখ মুখ ঝলমল করছিল। চিনির টুকরোটা মুখে ফেলার আগে ছেলেটা আবেগ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তার মাতৃভাষায় যে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করল তার কাঁপা কাঁপা গরগর আওয়াজের মধ্যেও সে ভাবের প্রকাশ শোনা গেল।

'ইস্‌, কী আদুরে রে! আহা রে বেচারা, জীবনে ভালো কথা ত কেউ বলে নি!' নাবিক তার স্বাভাবিক কর্কশ গলায় যতটা পারা যায় কোমলতা ফুটিয়ে তুলে বলল। সে মাক্সিমকার গালে টোকা মারল। 'চিনিটা খেয়ে ফেল। দিব্যি সোয়াদ!' ও যোগ করল।

আর এইখানেই, নাবিকদের ঘরের অন্ধকার কোণটিতে স্বীকারোক্তি বিনিময়ের পর, বলা

যেতে পারে, খুদে নিগ্রোটা আর নাবিকের মধ্যে দুদিক থেকেই ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হল। মনে হচ্ছিল দুজনেই যেন দুজনাকে পেয়ে দারুণ খুশি।

'তোমাকে আমাদের ভাষা অবিশ্যিই শেখানো দরকার, মাক্সিমকা। নইলে তুমি যে কী বিড়বিড় করে বল কালোমানিক, তা বোঝার সাধ্যি নেই! যাক গে, এখন ওপরে যেতে হয়! তোপের মহলা হবে। দেখবে 'খন!'

ওরা ওপরে উঠে এলো। দেখতে দেখতে ঢাক বাজিয়ে ঢাক পিটিয়ে কামান আক্রমণের বিপদসংকেত ঘোষণা করল। মাক্সিমকা একটা মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে না যায়। কামানের দিকে নাবিকদের উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে দেখে প্রথমটায় ও ঘাবড়ে যায়, তবে পরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভয় কেটে গেল। সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল নাবিকেরা বড় বড় কামানগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসছে, চটপট লম্বা লম্বা বুরুশ কামানের মুখে গুঁজে দিয়ে সেগুলোকে সাফ করছে, আবার বাইরের ডেকে কামান নিয়ে এসে তাদের সামনে সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেটা ভাবল ওরা কামান দাগবে, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না কার ওপর গোলা ছুঁড়তে চায়, কেননা দিগন্তে একটিও জাহাজ দেখা যাচ্ছিল না। গোলাবর্ষণের সঙ্গে তার ইতিমধ্যেই পরিচয় আছে, একবার এমনও দেখেছে যে কোন এক তিন-মাস্তুলওয়ালা জাহাজকে এড়ানোর জন্য 'বেট্সি' যখন বাতাসে ভর দিয়ে পুরো বেগে ছুটে চলছিল তখন তার পেছন দিকে খুবই কাছাকাছি গুড়ুম্ করে আছড়ে পড়ে কী যেন একটা বস্তু। জাহাজটা নিগ্রো বোঝাই দু-মাস্তুলওয়ালা 'বেট্সির' পিছু ধাওয়া করেছিল। ছেলেটির মনে আছে 'বেট্সির' সকলের মুখে দেখেছিল আতঙ্কের ছায়া, সে শুনেছিল তিন-মাস্তুলওয়ালা জাহাজটি যতক্ষণ না বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ল ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনের সে কি শাপশাপান্ত! সে অবশ্য জানত না যে ওটা ছিল একটা ইংরেজ রণপোত, যার কাজ ছিল দাস ব্যবসায়ীদের ধরা। তাই ওদের জাহাজ যে পালিয়ে আসে তার জন্য সে-ও আনন্দ করেছিল। এইভাবে ওর নির্যাতনকারী ক্যাপ্টেন আর ধরা পড়ল না, ন্যক্কারজনক মানুষব্যবসার জন্য তাকে ফাঁসিকাঠেও ঝুলতে হল না।*

কিন্তু গোলাগুলি চলল না। অথচ মাক্সিমকা কত আশাই না করেছিল! তবে সে মুগ্ধ হয়ে ড্রামের গুরু গুরু আওয়াজ শুনতে লাগল, লুচ্কিনকে চোখের আড়াল করল না। লুচ্কিন তখন গোলন্দাজ হিশেবে সামনের ডেকের একটি কামানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এবং লক্ষ্য স্থির করার জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছিল।

* আগেকার দিনে নিগ্রো ক্রীতদাসব্যবসা যখন বিশেষ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে তখন এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একটি আন্তর্জাতিক কনভেন্শন গঠিত হয়। উক্ত কনভেন্শনের বলে দাসব্যবসায়ীদের ধরার জন্য ফ্রান্স ও ইংলন্ড আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকূলের দিকে রণপোত পাঠায়। ধৃত ব্যবসায়ীরা কঠোর দণ্ড পেত। ক্যাপ্টেন ও তার সহকারীর ফাঁসি হত আর নাবিকেরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হত। নিগ্রোদের মুক্ত বলে ঘোষণা করা হত আর জলযান যাদের হাতে ধৃত হত তারাই ওটাকে পুরস্কার স্বরূপ পেত। (টীকা লেখকের।)

মহলার দৃশ্যটি মাক্সিমকার বড় ভালো লাগল, তবে মহলার পর লুচ্‌কিন তাকে যে চা দিল তাও তার কম ভালো লাগল না। প্রথমটায় মাক্সিমকা কেবল দারুণ অবাক হয়ে যায় এই দেখে যে নাবিকেরা সকলে চিনির ডেলা কামড়ে খেতে খেতে মগ থেকে ঢকঢক করে গরম জল খাচ্ছে আর গলগল করে ঘামছে। কিন্তু লুচ্‌কিন যখন তাকেও একটা মগ আর চিনির ডেলা ধরিয়ে দিল তখন মাক্সিমকা স্বাদ টের পেল, সে দু মগ সাবাড় করে ফেলল।

সেই দিনই বিকেলে, যখন গরম কমতে শুরু করল, তখন লুচ্‌কিন ওকে প্রথম রুশ ভাষার পাঠ দিতে বসল, কেননা তার কথায় এ সময়টায় 'মাথা খেলানো একটু সহজ'। প্রথম পাঠ সম্পর্কে স্বীকার করতেই হবে যে তার সূচনা বিশেষ কোন সাফল্যের পূর্বাভাস দিল না। তার নাম মাক্সিমকা, আর তার মাস্টারমশাইয়ের নাম লুচ্‌কিন — ছাত্রকে একথা বোঝানোর জন্য লুচ্‌কিনের আপ্রাণ চেষ্টায় নাবিকেরা কম আমোদ পেল না।

লুচ্‌কিন যদিও কস্মিনকালে মাস্টার ছিল না, তবু শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি বলে তার কাছে যা মনে হয়েছিল সেই নাম সম্পর্কে জ্ঞান যে করেই হোক ছেলেটির মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সে এমন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর কোমলতার পরিচয় দিল যাতে মহা মহা পণ্ডিতেরও হিংসে হতে পারে। তাছাড়া নাবিকের সামনে যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল সেগুলো তাঁদের কদাচিৎ পোয়াতে হয়।

নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মোটামুটি বুদ্ধিমানের মতো কতকগুলি পন্থা সে বার করল, তৎক্ষণাৎ তাদের কাজে লাগাতে গেল।

সে নিগ্রো ছেলেটির বুকে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'মাক্সিমকা', তারপর নিজেকে দেখিয়ে বলল, 'লুচ্‌কিন'। এই প্রক্রিয়া কয়েকবার করেও যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না তখন লুচ্‌কিন কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে ডাকল, 'মাক্সিমকা!' ছেলেটা দাঁত বার করল, কিন্তু এই পদ্ধতিটাও ধরতে পারল না। তখন লুচ্‌কিন নতুন এক ফন্দী আঁটল। সে একজন নাবিককে অনুরোধ জানাল 'মাক্সিমকা!' বলে ডাক দিতে। নাবিক ডাক দিল। লুচ্‌কিন নিজের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত, তাই সে বেশ খানিকটা তুষ্টির ভাব নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাক্সিমকাকে দেখিয়ে দিল, এমন কি আরও ভালো করে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ওর জামার কলার ধরে মৃদু নাড়া দিল। কিন্তু বৃথাই! মাক্সিমকা মজা পেয়ে হাসতে লাগল, কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল, নাড়া দেওয়ার মানে সে নাচের আমন্ত্রণ বলে ধরে নিয়েছে, তাই সে চট করে লাফিয়ে উঠে নাচ শুরু করে দিল। যে সব নাবিক ওখানে এসে জুটেছিল তারা এবং লুচ্‌কিন নিজেও ভারি আনন্দ পেল।

নাচ শেষ হলে নিগ্রো ছেলেটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারল যে তার নাচে ওরা খুশি, কেননা নাবিকদের অনেকেই তার মাথায়, পিঠে ও কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে খুশিতে হাসতে হাসতে বলছিল:

'গুড্, মাক্সিমকা! সাবাস, মাক্সিমকা!'

মাক্সিমকাকে তার নামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে লুচ্‌কিনের পরবর্তী চেষ্টা

কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হত বলা মুশকিল। লুচকিন আবার তার প্রয়াস শুরু করতে যাবে, এমন সময় সামনের ডেকে ইংরেজি-বলা ওয়ারেণ্ট অফিসারটির আগমন ঘটতে কাজটা রীতিমতো সহজ হয়ে গেল। সে ছেলেটিকে বলল যে তার নাম 'বয়' নয়, মাক্সিমকা, সেই সঙ্গে একথাও বলল যে মাক্সিমকার বন্ধুর নাম হল লুচকিন।

'এখন ভাই, ও জানে তুমি ওকে কী নাম দিয়েছ!' লুচকিনের উদ্দেশে ওয়ারেণ্ট অফিসার বলল।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' লুচকিন সানন্দে বলল, তারপর যোগ করল, 'আমি ত, স্যার, অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম... ছেলেটার মাথা আছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না ওর নাম কী।'

'এখন জানে। আচ্ছা, জিজ্ঞেস কর দেখি।'

'মাক্সিমকা!'

নিগ্রো ছেলেটা নিজেকে দেখিয়ে দিল।

'ওঃ কী দারুণ, স্যার!.. লুচকিন!' নাবিক আবার ছেলেটির উদ্দেশে বলল।

ছেলেটি আঙুল দিয়ে নাবিককে দেখিয়ে দিল।

ওরা দুজনেই তখন খুশিতে হাসতে লাগল। নাবিকেরাও সেই হাসিতে যোগ দিল, মন্তব্য করল:

'নিগ্রো বাচ্চাটার তাহলে নেকাপড়া শুরু হল...'

এর পর থেকে শিক্ষার কাজ সহজ হয়ে গেল।

লুচকিন বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে তাদের নাম বলতে লাগল। তবে কোন শব্দ বিকৃত করে উচ্চারণের সামান্যতম সুযোগ থাকলে সে তা-ই করতে লাগল, জামার বদলে বলল 'জেমা', মাস্তুলের বদলে 'মেস্টুল' — তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শব্দগুলো এই ভাবে পরিবর্তন করে নিলে তাদের অনেকটা বিদেশী বিদেশী বলে মনে হবে, আর তাতে মাক্সিমকার পক্ষে মনে রাখা আরও সহজ।

রাতের খাবারের বাঁশী যখন বাজল ততক্ষণে লুচকিনের সঙ্গে সঙ্গে মাক্সিমকা বেশ কিছু রুশী শব্দ উচ্চারণ করতে শিখে গেছে।

'ধন্যি মানতে হয় তোমাকে, লুচকিন! বেড়ে শিখিয়েছ ছেলেটাকে। কেপ হোপে পেঁছুতে পেঁছুতে আমাদের ভাষা বুঝতে শিখে ফেলবে দেখা যাচ্ছে!' নাবিকেরা বলল।

'তা আর বুঝবে না! কেপে পেঁছুতে এখনও বিশ দিনের কম নয়, আর মাক্সিমকাও বেশ বোঝে-সোঝে!'

'মাক্সিমকা' শব্দটি শোনামাত্রই ছেলেটি লুচকিনের দিকে তাকাল।

'ওঃ, নিজের নামটা দিব্যি জানে!.. বসো ভাই, এবারে রাতের খানা হবে!'

প্রার্থনার পর বিছানা দেওয়া হল। লুচকিন মাক্সিমকাকে ডেকের ওপর নিজের পাশে শোয়াল।

মাক্সিমকা খুশি ও কৃতজ্ঞ, সে আরাম করে শরীর এলিয়ে দিল নাবিকের তোষকে। তার মাথার নিচে বালিশ, গায়ে কম্বল — এ সবই লুচ্কিন চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করেছে এসিস্ট্যাণ্ট মেটের কাছ থেকে। এসিস্ট্যাণ্ট মেট নিগ্রো ছেলেটাকে আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু সমেত বিছানা দিয়েছে।

'ঘুমোও, ঘুমোও, মাক্সিমকা! কাল খুব ভোরে উঠতে হবে!'

মাক্সিমকার অমনিতেই ঘুম এসে গিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে উচ্চারণ করল 'মাক্সিমকা' আর 'লিউচিকা'—মাস্টারমশাইয়ের পদবীটিকে সে এ ভাবেই উচ্চারণ করল। প্রথম পাঠের পক্ষে অবশ্য তেমন খারাপ বলা যায় না।

নাবিক নিগ্রো ছেলেটির ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। শিগ্গিরই তার ঘোর নাসিকা গর্জন শুরু হল।

মাঝরাতে সে উঠে পাহারা দিতে গেল। সামনের মাস্তুলের নাবিক লেওন্তিয়েভের সঙ্গে মাস্তুলের মাথায় উঠল।

মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়ার পর ওরা সেখানে বসল, ঘুম তাড়ানোর জন্য বসে বসে গল্পগুজব শুরু করে দিল। কথাবার্তা চলল ক্রন্স্টাড্ট সম্পর্কে, ক্যাপ্টেনদের কথাও উঠল... তারপর সব চুপচাপ।

হঠাৎ লুচ্কিন জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা লেওন্তিয়েভ্, এই ভোদকা-টোদকার নেশা তোমাকে কি কখনও ধরে নি?'

লেওন্তিয়েভ্ লোকটা সংযমী, গম্ভীর ও সুশৃঙ্খল। অভিজ্ঞ নাবিক হিশেবে সে লুচ্কিনকে শ্রদ্ধা করত, আবার সেই সঙ্গে মাতলামির জন্য তাকে খানিকটা অবজ্ঞার চোখেও দেখত। সে স্পষ্ট জবাব দিল:

'জীবনেও না।'

'তার মানে ছুঁয়েও দেখ নি?'

'মাঝে মধ্যে কোন উপলক্ষে এক-আধ গেলাস — ব্যস্।'

'এই জন্যেই কি তুমি তোমার বরাদ্দ পাত্তর না নিয়ে তার বদলে টাকা নাও?'

'টাকাটা যে ভাই অনেক বেশি দরকার। চাকরী থেকে ছাড়া যদি পাই ত রাশিয়ায় ফিরে যাব, টাকা থাকলে কোন সময়ই আটকাবে না...'

'তা আর বলতে!'

'কিন্তু কী ব্যাপার? ভোদকার কথা তুলছ কেন, লুচ্কিন?'

'না, বলছিলাম কি, লেওন্তিয়েভ্, তোমার ভাগ্যিটা ভালো...'

লুচ্কিন একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা লোকে যে বলে মন্তর পড়ে মাতলামি ছাড়ানো যায় — এটা কি সত্যি?'

'মন্তর পড়ে যে লোকে ছাড়াতে পারে এটা সত্যি... 'কোব্চিকের' একজন জুনিয়ার অফিসার

এক নাবিকের এই দোষ ছাড়িয়েছিল। লোকটা ঐ রকম মন্তর-টন্তর জানত আর কি... আমাদের এখানেও অমন লোক আছে...'

'কে?'

'ছুতোর জাখারিচ্। কিন্তু এটা সে গোপন রেখেছে। সবার জন্যে করবে না। তা তোমার মতলবটা কী শুনি? তুমি কি মদ ছেড়ে দিতে চাইছ নাকি, লুচ্কিন?' ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল লেওন্তিয়েভ্।

'ছাড়া না ছাড়ার কথা নয়, তবে মদ খেয়ে যাতে জিনিসপত্র উড়িয়ে না দিতে হয়...'

'মাত্রাজ্ঞান রেখে মদ খাওয়ার চেষ্টা কর না...'

'চেষ্টা করে দেখেছি। কোন ফলই হয় না রে ভাই। মদ গিলতে শুরু করলে আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। এমনই আমার ধারা!'

'ধারা না আরও কিছু, আসলে তোমার বিচার-বিবেচনা বলে কিছু নেই!' গম্ভীরভাবে লেওন্তিয়েভ্ মন্তব্য করল। 'প্রত্যেক লোকেরই বোঝা উচিত নিজেকে... যা হোক, তুমি জাখারিচের সঙ্গে কথা বলেই দেখ না। হয়ত তোমাকে 'না' বলবে না। তবে মন্তর-টন্তর তোমার ওপর কাজ করবে কি?' বিদ্রূপের সুরে লেওন্তিয়েভ্ বলল।

'আমারও ত তা-ই মনে হয়! কাজ করবে না!' এই বলে লুচ্কিন নিজেই কেন যেন মৃদু হাসল, যেন সন্তুষ্ট হল এই ভেবে যে মন্ত্রে তার কোন ফল হবে না।

৮

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। 'জাবিয়াকা' কেপটাউনের কাছে এসে গেলে কী হবে সেখানে ঢুকতে পারছিল না। উল্টো দিক থেকে বইছে একটা তাজা বাতাস — নাবিকেরা যাকে বলে স্রেফ 'কপাল আছড়ানো'। সে বাতাস সময় সময় ঝড়ের পর্যায়ে উঠছে, আর তার ফলে জাহাজ তীরের কাছাকাছি ঘেঁষতে পারছে না। ঢেউ আর বাতাসের বেগ এত প্রচণ্ড যে বাষ্পে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবাও যায় না। ওতে শুধু কয়লাই নষ্ট।

তাই আবহাওয়া পরিবর্তনের আশায় পারের অনতিদূরে উঁচু মাস্তুলের পাল সামান্য গুটিয়ে 'জাবিয়াকা' সাগরের বুকে প্রচণ্ডভাবে দোল খেতে লাগল।

এই ভাবে দিন ছয়-সাত কেটে গেল।

অবশেষে বাতাস পড়ে গেল। 'জাবিয়াকা' স্টীম ছাড়ল। দেখতে দেখতে সাদা চোঙার ভেতর দিয়ে ভস্ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাহাজ কেপটাউনের পথ ধরল।

নাবিকেরা এতে যে কত খুশি হল তা আর বলার নয়।

কিন্তু জাহাজে এমন একজন লোক ছিল যে খুশি ত হলই না বরং তার উল্টো — 'জাবিয়াকা'

যতই বন্দরের কাছাকাছি আসতে লাগল সে ততই বেশি করে চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল।

এ হল লুচ্‌কিন, মাক্সিমকার সঙ্গে যার ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে।

এই একটি মাস ধরে জাহাজীদের অবাক করে দিয়ে মাক্সিমকার দেখাশোনার ব্যাপারে লুচ্‌কিন কোন ত্রুটি রাখে নি, মাক্সিমকার ওপর ওর মমতা পড়ে গিয়েছিল, আর নিগ্রো বাচ্চাটাও তার কম ন্যাওটা হয়ে পড়ে নি। ওরা দুজনের কথা দিব্যি বুঝতে পারে, কেননা লুচ্‌কিন ত মাস্টারমশাই হিশেবে তার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়েইছে, মাক্সিমকাও পরিচয় দিয়েছে যথেষ্ট বুদ্ধির — সে এখন রুশীতে কোন রকমে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তারা যত বেশি করে একে অন্যকে জানতে পারল, তাদের বন্ধুত্ব তত গাঢ় হতে লাগল। মাক্সিমকার এখন দু প্রস্থ পোশাক। আর আছে একজোড়া জুতো, টুপি, বেল্ট, বেল্টের ওপর জাহাজী ছোরা। দেখা গেল ছেলেটা বেশ চালাকচতুর ও ফুর্তিবাজ, তাই অনেক আগেই সে গোটা জাহাজী দলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। এমন কি সারেঙ্গ ইয়েগোরিচ্ — যে লোকটা জাহাজে নিষ্কর্মা লোকজন বলে কোন রকম যাত্রীকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না — সে-ও মাক্সিমকার ওপর বেশ প্রসন্ন, কেননা মাক্সিমকা কাজের বেলায় সব সময়ই অন্যদের সঙ্গে দড়িদড়া টানত এবং মোটের ওপর কোন না কোন ভাবে অন্যদের কাজে আসতে চেষ্টা করত, যাতে কেউ বলতে না পারে যে সে অমনি অমনি জাহাজী রেশন খাচ্ছে। সে বানরের মতো তরতর করে মাস্তুলের আগার দড়িদড়া বেয়ে ওপরে উঠে যেত, ঝড়ের সময় তার মনে ভয়ডরের লেশমাত্র দেখা যেত না — এক কথায়, সব মিলিয়ে সে ছিল 'জাহাজী ছেলে'

অসাধারণ সৎ ও কোমল স্বভাবের এই ছেলেটি প্রায়ই জাহাজের সামনের ডেকে নেচে আর তার সুরেলা গলায় নিজের দেশের গান গেয়ে নাবিকদের আনন্দ দিত। এর জন্য সকলেই ওকে প্রশ্রয় দিত, আর ওয়ারেণ্ট অফিসারের আর্দালি আর্ত্যুশকা অনেক সময়ই অফিসারদের কেবিনের টেবিল থেকে ওর জন্য কেক-টেক নিয়ে আসত '

বলাই বাহুল্য যে সে ছিল লুচ্‌কিনের একান্ত অনুরক্ত, কুকুরছানাটির মতো সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, বলা যেতে পারে তার চোখের ইসারার অপেক্ষায় থাকত। পাহারার সময় লুচ্‌কিন যখন মাস্তুলের ডগার মাচায় থাকল তখন সে-ও তার কাছে উঠে আসত, জাহাজের সামনের দিকে লুচ্‌কিনের পাহারার কাজ থাকলে তার সঙ্গে বসত আর রুশী শব্দগুলি উচ্চারণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেত...

ইতিমধ্যে খাড়া তীরভূমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। 'জাবিয়াকা' পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। দুপুর নাগাদ কেপটাউনে নোঙর ফেলার কথা।

এই চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে লুচ্‌কিনকে খুশি দেখাচ্ছে না। সে বিশেষ কেমন যেন একটা রুক্ষ ভাব নিয়ে কামান পরিষ্কার করছিল। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল- মাক্সিমকা, সে তাকে টুকটাক সাহায্য করছিল।

'শিগ্‌গিরই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে, ভাই মাক্সিমকা!' অবশেষে লুচ্‌কিন বলল।

'ছাড়াছাড়ি কেন?' মাক্সিমকা অবাক।

'তোমাকে কেপ হোপে ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমাকে নিয়ে কী করা যায় বল?'

ছেলেটি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে ভাবে নি। লুচ্‌কিন যে তাকে কী বলছে তা সে একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তবে নাবিকের মুখের বিষণ্ণ ভাব দেখে আঁচ করতে পারছিল যে তার দেওয়া সংবাদটা মোটেই আনন্দের নয়। ছেলেটার সজীব মুখের ওপর দ্রুত অনুভূতির রেখা ফুটে উঠল, হঠাৎ তার মুখটা কালো হয়ে গেল, সে বলল:

'আমার না বুঝি লিউচিকা।'

'আরে ভাই জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে... পারে ছেড়ে দেবে। আমি আরও দূরে চলে যাব, আর মাক্সিমকা থাকবে এখানে।'

লুচ্‌কিন আকারে ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করল।

নিগ্রো ছেলেটা বুঝতে পারল বলে মনে হল। সে লুচ্‌কিনের হাত আঁকড়ে ধরল, অনুনয়ের সুরে বলল:

'আমাকে না... পারে না... আমাকে এখানে... মাক্সিমকা, লিউচিকা, লিউচিকা, মাক্সিমকা। আমাকে রুশ নাবিক... হাঁ, হাঁ, হাঁ...'

তখন চট্‌ করে একটা বুদ্ধি নাবিকের মাথায় খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল:

'রুশ নাবিক হতে চাও, মাক্সিমকা?'

'হাঁ, হাঁ', মাথাটাকে সর্বশক্তিতে নেড়ে সায় দিয়ে আবার বলল মাক্সিমকা।

'তাহলে ত দিব্যি হয়! আরে, আগে ত এটা আমার মাথায় আসে নি? সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হয়, ইয়েগোরিচকে ধরতে হয়। ও সিনিয়র অফিসারকে জানাবে...'

সামনের ডেকে নাবিকেরা জড় হয়ে ছিল। কয়েক মিনিট বাদে লুচ্‌কিন তাদের বলল:

'শোন ভাইসব! মাক্সিমকা আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে চায়। আমরা আর্জি জানাব যাতে ওকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। ও 'জাবিয়াকার' জাহাজী হয়ে ঘুরুক না! তোমরা এতে কী বল ভায়ারা?'

নাবিকেরা সকলেই এই প্রস্তাবকে দারুণ সমর্থন জানাল।

অতঃপর লুচ্‌কিন গেল সারেঙ্গের কাছে। লুচ্‌কিন বলল সে যেন নাবিকদের অনুরোধ সিনিয়র অফিসারকে জানায়। সেই সঙ্গে বলল:

'এই ভারটা নাও, ইয়েগোরিচ্‌, না করো না। সিনিয়র অফিসারকে বলো... মাক্সিমকা নিজেই যে থাকতে চায়... ঘরছাড়া অনাথ ছেলেটাকে কেপ হোপে কোথায় ফেলে যাব বল? ওখানে বেচারি বেঘোরে মারাই যেতে পারে, ইয়েগোরিচ... বাচ্চাটার জন্যে কষ্ট হয়... ছেলেটা ভালো যে, চমৎকার ছেলে।'

'ঠিক আছে, আমি জানাব... মাক্সিমকা ছেলেটা নিয়ম-টিয়ম মানে বটে। তবে ক্যাপ্টেন কী

বলবেন জানি না। নিগ্রো জাতের একটা ছেলেকে রুশ জাহাজে রেখে দিতে উনি রাজী হবেন কিনা... এখানেই ফেঁকড়া না বাধে।'

'ফেঁকড়ার কিছু থাকবে না, ইয়েগোরিচ। মাক্সিমকাকে আমরা নিগ্রো জাত থেকে বার করে নিয়ে আসব।'

'সেটা কী রকম?'

'আমরা ওকে রুশী ধর্মে দীক্ষা দেব, ইয়েগোরিচ্। তার মানে, ও হবে রুশী নিগ্রো।'

আইডিয়াটা ইয়েগোরিচের মনে ধরল। সে সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র অফিসারকে জানাবে বলে কথা দিল।

সারেঙ্গের রিপোর্ট শোনার পর সিনিয়র অফিসার মন্তব্য করলেন:

'মনে হচ্ছে এর পেছনে লুচ্কিন আছে?'

'জাহাজীদের গোটা দলও নিগ্রো ছেলেটার জন্যে বলছে, স্যার। তাছাড়া কোথায় ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে? সবাই কষ্ট পাচ্ছে। ও কিন্তু আমাদের খুদে জাহাজী হতে পারত, স্যার! ছেলেটা ভালো স্বভাব-চরিত্রের, আমি বুক ঠুকে বলতে পারি। আর ওকে খ্রীস্টান করে নিলে ত ওর আত্মাটাকে রীতিমতো উদ্ধার করা যাবে।'

সিনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেনকে জানাবেন বলে কথা দিলেন।

ফ্ল্যাগ তোলার সময় ক্যাপ্টেন ওপরে এলেন। সিনিয়র অফিসার নাবিকদের আর্জি তাঁর কাছে পেশ করলে প্রথমটায় ক্যাপ্টেন সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু সম্ভবত নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যেতে তিনি তক্ষুনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন, বললেন:

'বেশ। থেকে যাক। ওকে আমরা খুদে জাহাজী করে নেব। আর আমাদের সঙ্গে ক্রন্স্টাড্টে যখন ফিরে আসবে তখন ওর জন্যে কিছু একটা করা যাবে... সত্যিই ত, ওকে ফেলে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? — বিশেষ করে ও নিজেই যখন এটা চাইছে না!.. আর হ্যাঁ, লুচ্কিন ওর দেখাশোনা করতে থাকুক। এই লুচ্কিনটা পাঁড় মাতাল, অথচ দেখ... ছেলেটার ওপর কী টান! নিগ্রোটাকে ও কীভাবে জামাকাপড় পরিয়েছে তা ডাক্তার আমাকে বলেছেন।'

মাক্সিমকাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে — এই খবরটা সামনের ডেকে পৌঁছুতে জাহাজীরা সকলে মহা খুশি। তবে বলাই বাহুল্য যে সকলের চেয়ে বেশি খুশি হল লুচ্কিন ও মাক্সিমকা।

বেলা একটায় জাহাজ কেপটাউন পোতাশ্রয়ে নোঙর করল। পরের দিন প্রথম পাহারাদলের লোকজন পারে যাওয়ার ছুটি পেল। লুচ্কিন আর মাক্সিমকাও তৈরী হল।

'দেখো, লুচ্কিন, মদের জন্যে মাক্সিমকাকে বেচে দিও না আবার!' হাসতে হাসতে ইয়েগোরিচ মন্তব্য করল।

এই মন্তব্য বোধহয় লুচ্কিনের মনে বড় বিঁধল। সে উত্তর দিল:

'এমনও ত হতে পারে যে মাক্সিমকা আছে বলে আমি মাতাল না হয়েই ফিরব!'

লুচ্কিন যথারীতি মদে চুর হল, কিন্তু সবাইকে অবাক করে সে পুরো পোশাকে তীর থেকে

ফিরল। পরে জানা যায় যে এটা ঘটে মাক্সিমকার কল্যাণে, কেননা বন্ধুকে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ গিলতে দেখে সে পাশের সরাইয়ে ছুটে গিয়ে রুশ নাবিকদের ডেকে আনে। তারাই লুচ্‌কিনকে বয়ে জেটিতে নিয়ে এসে নৌকোয় শুইয়ে দেয়। মাক্সিমকা সব সময়ই ছিল তার পাশে পাশে।

লুচ্‌কিনের জিভ প্রায় জড়িয়ে আসছিল, কিন্তু সে বারবার বলছিল:

'মাক্সিমকা কোথায়? মাক্সিমকাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মদের জন্যে আমি ওকে বেচে দিই নি, ভাই... ও আমার প্রাণের বন্ধু। কোথায় মাক্সিমকা?'

মাক্সিমকা লুচ্‌কিনের কাছে আসতে লুচ্‌কিন সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ বাদে 'জাবিয়াকা' কেপ অফ গুড্‌ হোপ ছেড়ে গেল। জাহাজ ওখান থেকে বেরিয়ে আসার কিছু দিনের মধ্যেই মাক্সিমকাকে সাড়ম্বরে দীক্ষা দেওয়া হল, দ্বিতীয়বার তার নাম দেওয়া হল মাক্সিমকা, আর পদবী হল জাহাজের নাম অনুসারে — 'জাবিয়াকিন'।

তিন বছর বাদে 'জাবিয়াকাতে' করে মাক্সিমকা ফিরে এলো ক্রন্‌স্টাড্‌টে। তখন সে চৌদ্দ বছরের কিশোর, রুশ ভাষা চমৎকার লিখতে ও পড়তে পারে। এটা হয়েছে ওয়ারেণ্ট অফিসার পেতিয়ার কৃপায় — সে-ই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে।

ক্যাপ্টেন ওর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না, ওকে এসিস্ট্যাণ্ট ডাক্তারী শেখার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। চাকরী থেকে ছাড়া পাওয়ার পর লুচ্‌কিন তার আদরের ধর্মটির কাছাকাছি থাকার উদ্দেশ্যে ক্রন্‌স্টাড্‌টে রয়ে গেল। সে তার হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢেলে দিল মাক্সিমকার ওপর। ওর খাতিরে এখন আর সে মদ খেয়ে জিনিসপত্র ওড়ায় না। মদ সে খায়, তবে 'মাত্রা রেখে'।

ভ্‌সেভলোদ গার্শিন

সিগন্যাল



ভ্সেভলোদ মিখাইলভিচ্ গার্শিনের জন্ম — ১৮৫৫ সনে, তাঁর মৃত্যু হয় ৩৩ বছর বয়সে। নিজের এই স্বল্প জীবনপরিসরের মধ্যে তিনি মাত্র গোটা দশেকের কিছু বেশি গল্প আর রূপকথা লিখে যাওয়ার অবকাশ পান। তার প্রায় সবগুলিই বয়স্কদের জন্য। কিন্তু শিশুদের বই ও শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্ন গার্শিনকে সর্বদাই উদ্দীপিত করত। লেখক ছিলেন পিটার্সবুর্গের বিদ্যোৎসাহী কর্মিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ নির্বাচনে পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য করা। ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সনে যে বার্ষিক 'শিশুসাহিত্য পর্যালোচনা' প্রকাশিত হয়, সঙ্ঘের সদস্যরূপে গার্শিন তা সম্পাদনা করেন। তিনি শিশুদের জন্য বিদেশী লেখকদের কয়েকটি রূপকথাও অনুবাদ করেন। সোভিয়েত শিশুরা গার্শিনের মৌলিক রূপকথাগুলি জানে, পছন্দ করে। এই সব রূপকথার মধ্যে আছে 'অহঙ্কারী তালগাছ', 'কোলাব্যাঙ ও গোলাপফুলের কথা' এবং বিশেষ করে — 'মুসাফির ব্যাঙ'। শেষোক্ত রূপকথাটিতে লেখক কচ্ছপ ও হাঁস সম্পর্কিত ভারতীয় হিতোপদেশের উপাদান কাজে লাগিয়েছেন।

'সিগন্যাল' গল্পটি ১৮৮৭ সনে বড়দের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু অচিরেই শিশুদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। জগতে অশুভ শক্তির আধিপত্য বলে যে একটি প্রচলিত নৈরাশ্যবাদী ধারণা আছে, গল্পটিতে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুভ শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের — শ্রমজীবী মানুষের অপূর্ব নৈতিক গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস।



সেমিওন ইভানোভ রেল লাইনে পাহারাদারের চাকরি করত। তার গুমটি থেকে একটি স্টেশন ছিল বারো ভার্স্ট দূরে, অন্যটি — দশ ভার্স্ট। ভার্স্ট চারেক দূরে গত বছর খুলেছে বড় এক সুতোকল। বনের আড়াল থেকে কালো কালো দেখা যায় তার উঁচু চিমনী, আর ধারে কাছে, আশেপাশের গুমটি ছাড়া বসতি বলতে কিছু নেই।

সেমিওন ইভানোভ লোকটা ছিল অসুস্থ, তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। নয় বছর আগে সে যুদ্ধে গিয়েছিল — অফিসারের ফৌজী খিদমতগার হয়ে কাজ করে, গোটা একটি অভিযানে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সে অনশনে কষ্ট পায়, ঠাণ্ডায় জমে যায়, রোদে পুড়ে ভাজা ভাজা হয়, আর কি গরমে কি ঠাণ্ডায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ভার্স্ট করে পাড়ি দেয়। গুলিগোলার নিচেও তাকে পড়তে হয়েছে, তবে ভাগ্য ভালো যে একটিও তার গায়ে বেঁধে নি। একবার তাদের রেজিমেণ্ট সামনের লাইনে ছিল; পুরো একটি সপ্তাহ তুর্কীদের সঙ্গে গুলিবিনিময় চলে, একদিকে লাইন আমাদের আর খাতের ওপর দিকে তুর্কীদের। সকাল থেকে সন্ধে অবধি গুলিবর্ষণের আর কামাই নেই। সেমিওনের অফিসারও লাইনে ছিলেন। রোজ দিনে তিনবার করে খাত বয়ে, রেজিমেণ্টের রসুইঘর থেকে সেমিওনকে বয়ে নিয়ে আসতে হত গরম সামোভার আর খাবার। খোলা জায়গার ওপর দিয়ে সামোভার নিয়ে যায়, সাঁ সাঁ গুলি চলে, পাথরে কটকট আওয়াজ হয়। সেমিওনের ভয় লাগত, সে কাঁদত, কিন্তু চলত ঠিকই। অফিসার মহোদয়রা তার ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন—সব সময় তাঁরা গরম চা পেতেন। অভিযান থেকে সে অক্ষত অবস্থায় ফিরল। কেবল হাত আর পা টনটন করতে



থাকে। তার পর থেকে অনেক দুঃখই তাকে ভোগ করতে হয়েছে। বাড়ি ফিরে এলো—বুড়ো বাপ মারা গেল, গলার ব্যামো হয়েছিল; রয়ে গেল সেমিওন আর তার বৌ—ওরা দুজন। গেরস্থালি করার মতো অবস্থাও তার নেই, ফোলা হাত-পায়ে মাটি চষাও কঠিন। নিজের গাঁয়ে সে তিত-বিরক্ত হয়ে উঠল। ওরা সুখের সন্ধানে নতুন জায়গায় চলল। বৌকে সঙ্গে নিয়ে সে খের্সোনে ও দন নদীর তীরে গেল—কোথাও সুখ নেই। বৌকে চাকরানীর কাজ নিতে হল, এদিকে সেমিওন আগের মতোই কেবল ঘোরে আর ঘোরে। একবার তাকে গাড়িতে যেতে হয়। এক স্টেশনে দেখে—স্টেশন মাস্টার—চেনা-চেনা মনে হল। সেমিওন তাঁর দিকে তাকায়, আর স্টেশন মাস্টারও সেমিওনের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। দুজনেই দুজনেক চিনতে পারল—দেখা গেল উনি হলেন সেমিওনদের রেজিমেণ্টেরই অফিসার।

'তুমি ইভানোভ?' উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিকই বলেছেন, স্যার, আমিই সেই।'

'তুমি এখানে কী করে?'

কী করে কী হল সেমিওন তাঁকে সে বৃত্তান্ত বলল।

'এখন তাহলে কোথায় চললে?'

'জানি না, স্যার।'

'আচ্ছা হাঁদারাম ত! জান না কেমন?'

'ঠিকই, স্যার, কেননা যাওয়ার কোন জায়গা নেই। কোন একটা কাজের সন্ধান চাই, স্যার।'

স্টেশন মাস্টার তার দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে বললেন:

'তাহলে বলি ভাই, এখানকার এই স্টেশনেই থেকে যাও না কেন? তুমি বিয়ে করেছ ত? তোমার বৌ কোথায়?'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার, বিয়ে করেছি। বৌ আছে কুর্স্ক শহরে, এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঝি-গিরি করছে।'

'তাহলে বৌকে লিখে দাও চলে আসতে। চেষ্টা-চরিত্তির করে একটা মাগনা টিকিট বার করে দেব 'খন। এখানে আমাদের রেল গুমটি খালি হবে; তোমার জন্যে রেল ডিভিসনের বড়কর্তাকে বলব তাহলে।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' সেমিওন উত্তর দিল।

সেমিওন স্টেশনে থেকে গেল। সে স্টেশন মাস্টারের রান্নাঘরে কাজ করত, লকড়ি কাটত, আঙিনা ও প্ল্যাটফর্ম ঝাড়ু দিত। দু সপ্তাহ বাদে বৌ এলো, সেমিওন তখন ঠেলাগাড়িতে চেপে নিজের গুমটিতে চলল। গুমটিটা নতুন, গরম, লকড়ি যত খুশি মেলে। আগেকার পাহারাদাররা একটা ছোট সবজি বাগান করেছিল — সেটি রয়ে গেছে। চাষ করার মতো কাঠা কয়েক জমিও রেল রাস্তার দু পাশে ছিল। সেমিওন উল্লসিত হয়ে উঠল। ভাবতে বসল কী করে গেরস্থালি পেতে বসবে, গোরু, ঘোড়া কিনবে।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মজুত ওকে দেওয়া হল—সবুজ ফ্ল্যাগ, লাল ফ্ল্যাগ, লণ্ঠন, হর্ন, হাতুড়ি চাবি—নাট-বল্টু আঁটার জন্য; শাবল, কোদাল, ঝাড়ু, বল্টু, গজাল; দেওয়া হল নিয়মকানুন সংক্রান্ত দুটো বই আর রেলের টাইম টেবিল। প্রথম প্রথম সেমিওনের রাতে ঘুম হত না, বারবার টাইম টেবিল মনে রাখার চেষ্টা করত; গাড়ি হয়ত আরও দু ঘণ্টা বাদে যাবে — এদিকে সে নিজের অংশটা একবার ঘুরে দেখে নেবে, গুমটির কাছের বেঞ্চটাতে বসবে, থেকে থেকে তাকিয়ে দেখবে আর শোনার চেষ্টা করবে রেল লাইন কাঁপছে কিনা, ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। নিয়মকানুনও সে মুখস্থ করে নিল; পড়তে ভালো পারত না — বানান করে করে পড়ত, তাসত্ত্বেও কিন্তু মুখস্থ করে ফেলল।

গ্রীষ্মকালের ঘটনা। কাজ হালকা — বরফ চাঁছার দরকার নেই, তাছাড়া এ পথে ট্রেনও কম। সেমিওন নিজের তত্ত্বাবধানের এলাকাটা দিনে-রাতে দুবার ঘুরে দেখে, কোথাও কোথাও নাট-বল্টু ভালো করে আঁটার চেষ্টা করে, খোয়া পাথর সমান করে দেয়, জলের পাইপ দেখে, বাড়িতে যায় নিজের গেরস্থালি গোছাতে। গেরস্থালিতে ওর ছিল বাধাবিপত্তির একশেষ — কোন কিছু করবে বলে ভেবেছে কি বিস্তারিত রেলের ফোরম্যানকে জানাও, সে আবার জানাবে রেল ডিভিসনের বড়কর্তাকে; অনুমতি আসতে আসতে সময়ও যায়। সেমিওন ও তার বৌয়ের মনমেজাজ খারাপই লাগতে শুরু করল।

মাস দুয়েক সময় কেটে গেল; পড়শী পাহারাদারদের সঙ্গে সেমিওনের আলাপ-পরিচয় শুরু হল। একজন ছিল খুবই বুড়ো; তাকে বারবার খারিজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় — গুমটি থেকে বেরোতে পারে না বললেই চলে। তার হয়ে বৌ-ই টহলদারীর কাজ করত। আরেক গুমটিওয়ালা — যে স্টেশনের একটু কাছাকাছি — সে লোকটা অল্পবয়সী, দারুণ রোগা, শিরা-ওঠা। গুমটিগুলোর মাঝখানে, রেলপথের ওপর, টহল দেওয়ার সময় প্রথম সেমিওনের সঙ্গে ওর দেখা। সেমিওন টুপি খুলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল।

'মঙ্গল হোক, পড়শী,' ও বলল।

পড়শী আড়চোখে এক ঝলক তার দিকে তাকাল। বলল:

'নমস্কার।'

মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। পরে ওদের গিন্নিদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হল। সেমিওনের বৌ আরিনা পড়শীর বৌকে নমস্কার জানাল; সে-ও বিশেষ কোন কথাবার্তা না বলে চলে গেল। সেমিওন একবার তাকে দেখতে পেয়ে বলল:

'ওগো বৌ, তোমার সোয়ামিটি তেমন কথাবার্তা কয় না কেন?'

পড়শী বৌ একটু চুপ করে থেকে পরে বলল:

'তোমার সঙ্গে ওর কীই বা কথা কইবার আছে? সকলেরই যার যার কাজ আছে। নিজের চরকায় তেল দাও গে।'

তবে আরও মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর আলাপ-পরিচয় হল। রেলপথের ওপরে ভাসিলির

সঙ্গে সেমিওনের দেখা হলে ওরা ধারে এসে বসে, পাইপ টানে আর নিজেদের দৈনন্দিন সুখদুঃখের কথা বলে। ভাসিলি একটু বেশি রকমেরই চুপচাপ থাকত, আর সেমিওন বলে যেত নিজের গ্রামের কথা, অভিযানের কাহিনী।

'আমার জীবনে আমি অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছি, অথচ বয়স আর আমার এমন কি,' ও বলে। 'ভগবান আমার কপালে সুখ দেন নি। ভগবান যার কপালে যা লিখেছেন তা খণ্ডায় কে! কথাটা হল এই, ভাসিলি স্তেপানিচ্ ভায়া।'

ভাসিলি স্তেপানিচ্ তখন রেল লাইনের গায়ে ঠুকে পাইপ ঝেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল:

'তোমার আমার মতো মানুষকে সারা জীবন কষ্ট দিচ্ছে আমাদের কপাল নয় — লোকে। দুনিয়ায় মানুষের চেয়ে হিংস্র ও কুটিল আর কেউ নেই। নেকড়ে নেকড়েকে খায় না, কিন্তু মানুষ মানুষকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলে।'

'না ভাই, এটা তুমি ঠিক বললে না — নেকড়ে নেকড়েকে খায়।'

'কথার কথা বললাম আর কি। তা যা-ই বলো না কেন, মানুষের চেয়ে নিষ্ঠুর প্রাণী আর হয় না। মানুষের হিংসে আর লোভ যদি না থাকত তাহলে টেকা সম্ভব হত। সকলেরই তাল — কী করে তোমার ওপর বড় রকমের থাবা বসাবে, খাবলা মারবে, তোমাকে গিলে খাবে।'

সেমিওন ভাবিত হয়ে পড়ল, বলল:

'জানি না ভাই। হবেও বা, আর তা-ই যদি হয় তাহলে বলতে হবে সেটা ভগবানেরই বিধান।'

'তা-ই যদি হয়,' ভাসিলি বলল, 'তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কিছু নেই। যা কিছু খারাপ ভগবানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে বসে বসে কষ্ট ভোগ করা — এটা ভাই, মানুষের জীবন নয়, পশুর জীবন। এ-ই হল আমার সাফ কথা।'

সে উল্‌টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কোন বিদায় সম্ভাষণ না করেই চলে গেল। সেমিওনও উঠে দাঁড়াল, চেঁচিয়ে বলল:

'গালাগালি করছ কেন, পড়শী?'

পড়শী ফিরেও তাকাল না, চলতে লাগল। সেমিওন অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না মোড়ের নিচু জায়গাটায় ভাসিলির মূর্তিটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে সে বৌকে বলল:

'বুঝলে আরিনা, আমাদের পড়শীটি যা! মানুষ ত নয়, কালকেউটে।'

তবে ঝগড়াঝাঁটি তাদের মধ্যে হল না। আবার তাদের দুজনের দেখা হল, আগের মতোই কথাবার্তা চলল, সেই একই বিষয়ে।

'ওঃ ভাই, মানুষ না হলে... তুমি, আমি — আমরা কি আর এই গর্তটিতে পড়ে থাকি!' ভাসিলি বলল।

'গ্মটি ত কী হয়েছে?.. কিছ্ না, বাস করা যেতে পারে।'

'বাস করা যেতে পারে, বাস করা যেতে পারে... ওঃ, কী বলব! কেবল বয়সই হয়েছে, এদিকে ঘটে ত ঠনঠন, দেখেছ অনেক, কিন্তু দেখার মতো করে দেখেছ কমই। তা ঐ গ্মটিতেই বল আর যেখানেই বল—গরিব লোকের আবার জীবনযাত্রা কী? এই কসাইগ্লো তোমাকে খাচ্ছে। সমস্ত রস নিংড়ে নিচ্ছে, আর ব্ড়ো হলে ছিবড়ের মতো ছ্রুড়ে ফেলে দেবে — যেমন খোল শ্রোরের খাদ্য হয়। তুমি কত মাইনে পাও?'

'তা কমই, ভাসিলি স্তেপানভিচ্। বারো র্বল।'

'আর আমি পাই সাড়ে তেরো। আচ্ছা বলতে পার কি কেন? আইন অন্যায়ী, অফিস থেকে সকলেরই এক পাওয়ার কথা — মাসে প্রো পনেরো, জ্বালানি আর আলোর ব্যবস্থা। বারোই বল আর সাড়ে তেরোই বল এটা আমাদের ঠিক করে দিল কে শ্নি? তা বাপ্, তোমাকে জিজ্ঞেস করি, বাকি তিন র্বল কিংবা ধর ঐ দেড় র্বলই সর-ননী হয়ে কার পেটে, কার পকেটে যাচ্ছে বলতে পার? আর তুমি বলছ কিনা বাস করা যেতে পারে! আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর, ব্যাপারটা ঐ দেড় কিংবা তিন র্বল নিয়ে নয়। প্রো পনেরোই যদি দিত তাতেই বা কী? গত মাসে আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম; ডিরেক্টর সাহেব এসেছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি। বড়ই কেতাথ হলেম। দিব্যি চলেছেন আলাদা কামরায়; প্ল্যাটফর্মে নামলেন, দাঁড়ালেন, পেটের ওপর দ্লছে সোনার চেন, লাল টকটক করছে গাল দ্টি, যেন ফেটে পড়ছে... আমাদের রক্ত খেয়ে টৈটম্ব্র। ওঃ, শক্তি আর ক্ষমতা যদি থাকত!.. আরে, এখানে আমি বেশি দিন থাকছি না; চলে যাব, যে দিকে দ্চোখ যায়।'

'কোথায় যাবে বল স্তেপানিচ্? হাতের লক্ষ্মী কে আর সাধ করে পায়ে ঠেলে? এখানে তোমার ঘর, ঘরে তাপ আছে, ছোট এক টুকরো জমি আছে। বৌ তোমার কাজের মেয়ে...'

'হ্ঃ, জমি! আমার জমিটা যদি একবার দেখতে। একটা ডালও সেখানে নেই। বসন্তকালে বাঁধাকপি বসিয়েছি কি বসাই নি, অমনি লাইনের ফোরম্যান এসে হাজির। বলে, 'এ কী ব্যাপার? বিনা রিপোর্টে কেন? বিনা অন্মতিতে কেন? খ্রুড়ে উঠিয়ে ফেল, ওর কোন নামগন্ধ যেন না থাকে।' মাতাল অবস্থায় ছিল। অন্য সময় হলে হয়ত কিছ্ বলত না, কিন্তু এবারে মাথায় সেই যে ঢুকল... 'তিন র্বল জরিমানা!..''

ভাসিলি একটু চুপ করে থেকে পাইপ টেনে ম্দ্স্বরে বলল:

'আর একটু হলে আমি ওকে খ্নই করে বসতাম।'

'উঃ, পড়শী, আমি বলি কি, তোমার মেজাজটা বাপ্ গরম।'

'মেজাজ গরম নয়, আমি হক কথা বলি, আমার বিচার বিবেচনা আছে। আমার কাছ থেকে আরও পাওনা আছে ঐ লাল ম্খোটার। খোদ ডিভিসন ম্যানেজারের কাছে নালিশ করব। দেখা যাবে!'

ঠিকই নালিশ করল।

একবার ডিভিসন ম্যানেজার পথ পরিদর্শন করতে এলেন — তার তিন দিন বাদে পিটার্সবুর্গ থেকে হোমরা চোমরা লোকজনদের ঐ পথে যাওয়ার কথা। ইনস্পেকশন হচ্ছিল। তাঁদের ভ্রমণের আগে সব কিছু সুশৃঙ্খল করা দরকার। ভালো করে খোয়া বিছিয়ে সমান করা হল, স্লীপারগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখা হল, গজাল পোঁতা হল, নাট-বল্টু শক্ত করে আঁটা হল, খুঁটিগুলোতে আরেক পোঁচ রঙ চড়ল, ক্রসিংগুলোতে হলুদ বালি ঢালার হুকুম হল। পড়শী পাহারাওয়ালী তার বুড়োকে পর্যন্ত আগাছা সাফ করতে পাঠিয়ে দিল। সেমিওন পুরো সপ্তাহ ধরে কাজ করল; শৃঙ্খলার কিছু আর বাকি রাখল না, নিজের গায়ের কামিজটাও রিফু করল, সাফ করল, আর তামার তকমাটা ইট দিয়ে ঘষেমেজে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। ভাসিলিও কাজ করে। ট্রলি করে ডিভিসন ম্যানেজার এলেন; চারজন শ্রমিক হ্যাণ্ডেল ঘুরায়, গিয়ার গুনগুন আওয়াজ তোলে। ঘণ্টায় প্রায় বিশ ভার্স্ট বেগে ট্রলি ছুটে চলে, কেবল চাকা ঘর্ঘর করতে থাকে। এসে থামল সেমিওনের গুমটিতে। সেমিওন ছুটে এসে ফৌজী কায়দায় বিবরণী পেশ করল। দেখা গেল সবই ঠিক আছে।

'তুমি কি এখানে অনেক দিন হল?' কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

'দোসরা মে থেকে, স্যার।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, একশ চৌষট্টি নম্বরে কে?'

রেলের ফোরম্যান ওঁর সঙ্গেই ট্রলিতে যাচ্ছিল, সে জবাব দিল:

'ভাসিলি স্পিরিদভ্।'

'স্পিরিদভ্... স্পিরিদভ্... আচ্ছা, সেই স্পিরিদভ্, যাকে গত বছর আপনি ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সে-ই।'

'ঠিক আছে, ভাসিলি স্পিরিদভ্কে দেখা যাক। ট্রলি চালাও।'

মজুরেরা হ্যাণ্ডেল টানল, ট্রলি চলতে শুরু করল।

সেমিওন সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে: 'পড়শীর সঙ্গে ওদের এক চোট হবে এখন।'

ঘণ্টা দুয়েক বাদে সে টহল দিতে বের হল। দেখতে পেল নিচু জায়গাটা থেকে রেলপথ বরাবর কে যেন চলেছে, তার মাথায় সাদামতো কী একটা দেখা যাচ্ছে। সেমিওন মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল—ভাসিলি বটে। হাতে লাঠি, কাঁধে একটা ছোট্ট পুঁটলি, দুপাশের গাল রুমাল দিয়ে বাঁধা।

'কোথায় চললে হে পড়শী?' সেমিওন হাঁক দিল।

ভাসিলি একেবারে কাছে এগিয়ে এলো — তার চেহারা করুণ, কাগজের মতো সাদা, চোখ দুটোতে বন্যভাব। কথা বলতে শুরু করল — কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

'শহরে চললাম,' ও বলল, 'মস্কোয়... হেড অফিসে।'

'হেড অফিসে... বটে! নালিশ জানাতে যাচ্ছ বুঝি? ছাড় দেখি, ভাসিলি স্তেপানিচ্, ভুলে যাও...'

'না ভাই, ভোলা যায় না। এখন আর ভোলার উপায় নেই। দেখতে পাচ্ছ, ও আমার মুখে ঘুসি মেরেছে, রক্ত বার করে দিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না, এভাবে ছেড়ে দেব না। এই রক্তচোষাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার...'

সেমিওন ওর হাত ধরল।

'যেতে দাও, স্তেপানিচ্, আমি তোমাকে ঠিকই বলছি — এতে ভালো কিছু হবে না।'

'ভালো আর কী আছে? আমি নিজেই জানি যে ভালো কিছু হবে না। কপালের কথা তুমি যা বলেছিলে তা সত্যি বটে। নিজের ভালো কিছু করতে পারব না ঠিকই. কিন্তু সত্যের জন্যে দাঁড়াতে হবে, ভাই।'

'আরে তুমি বলই না কোথা থেকে এত দূর গড়াল?'

'কোথা থেকে আর... সব ভালোমতো দেখল, ট্রলি থেকে নেমে গুমটিতে উঁকি মারল। আমি অবশ্য জানতামই যে কড়া করে জিজ্ঞেসবাদ করবে, তাই যতদূর হতে পারে সব মেরামত করে রেখেছিলাম। যাওয়ার জন্যে তৈরী, এমন সময় আমি আমার নালিশ পেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল: 'সরকারী ইনস্পেকশন চলছে। হ্যানা-তেনা... বললে, তুই কিনা এখানে আর্জি জানাতে এসেছিস সবজি বাগান নিয়ে! মন্ত্রিসভার সদস্য বলে কথা, আর তুই এলি কিনা কোথাকার বাঁধাকপি নিয়ে!' আমার সহ্য হল না, মুখের ওপর কথা বললাম, তেমন একটা কিছু নয় অবশ্য, কিন্তু তাতেই বাবুর মানে লাগল। এমন একটা দিল... আমাদের ধৈর্যের বলিহারি! সঙ্গে সঙ্গে ওকেও একটা মারা উচিত ছিল... অথচ আমি যেমনকার তেমন দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন এটা আমার পাওনাই। ওরা চলে যাওয়ার পর আমার হুঁশ ফিরল, আমি মুখ ধুয়ে নিয়ে চললাম।'

'গুমটির কী হবে?'

'বৌ রয়ে গেল। ওর কোন ভুলচুক হবে না। তা মরুক গে ওরা, আর ওদের রেল লাইন!'

ভাসিলি উঠে দাঁড়াল, যাওয়ার জন্য তৈরী হল।

'চলি ইভানিচ্! জানি না ন্যায়বিচার পাব কিনা।'

'তা পায়ে হেঁটে যাবে নাকি?'

'স্টেশনে গিয়ে মালগাড়ি ধরব এখন; কাল মস্কোয় পৌঁছুব।'

পড়শী দুজন একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিল। ভাসিলি চলে গেল। বহুদিন তার কোন পাত্তা নেই। বৌ তার হয়ে কাজ করতে লাগল; কি দিনে, কি রাতে ঘুমোত না — স্বামীর অপেক্ষা করতে করতে তার একেবারে জেরবার হয়ে গেল। তিন দিনের দিন ইনস্পেকশনের দলবল এখান দিয়ে চলে গেল — ইঞ্জিন, মালপত্রের ওয়াগন আর দুটি প্রথম শ্রেণীর কামরা। ভাসিলির তখনও দেখা নেই। চতুর্থ দিন সেমিওন ভাসিলির গিন্নিকে দেখতে পেল — কেঁদে কেঁদে তার মুখ ফুলে গেছে, চোখ লাল।

'স্বামী ফিরল কি?' সেমিওন জিজ্ঞেস করল।

মহিলা হতাশভাবে হাত নাড়ল, কিছু না বলে, যে দিকে যাচ্ছিল, চলে গেল।

কোন এক সময়, সেমিওন যখন খুব ছোট ছিল তখন সে নলখাগড়া দিয়ে বাঁশী বানাতে শেখে। নলের যেখানে যেখানে দরকার ছেঁক দেয়, ছ্যাঁদা করে, আগায় ভেঁপু বানায়। এমন চমৎকার গড়ে যে যা খুশি তাই বাজানো যায়। অবসর সময় সে বহু বাঁশী বানাত আর মালগাড়ির জানাশোনা গার্ডকে দিয়ে সেগুলো শহরের বাজারে চালান করত; সেখানে এককেটির জন্য সে দু কোপেক করে পেত। ইনস্পেকশনের পর তৃতীয় দিন সন্ধে ছয়টার গাড়ির ভার বৌয়ের ওপর দিয়ে তাকে ঘরে রেখে নিজে একটা ছুরি নিয়ে বনের দিকে চলল নল কাটার উদ্দেশ্যে। নিজের অংশের শেষ সীমানায় পৌঁছুল — এই জায়গায় রেলপথ হঠাৎ মোড় নিয়েছে। ওপরের বাঁধ থেকে নিচে নেমে সে পাহাড়ের নিচে বন বরাবর চলল। আধ ভার্স্ট দূরে ছিল একটা বিরাট জলা, তারই কাছাকাছি — ওর বাঁশীর জন্য চমৎকার ঝাড় জন্মেছে। গোটা এক আঁটি নল কেটে নিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল। বন ধরে চলেছে; সূর্য ততক্ষণে নিচে নেমে গেছে; কবরের নিস্তব্ধতা, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাখিদের কিচিরমিচির আর পায়ের নিচে ডালপালার মড়মড় শব্দ। সেমিওন আরও খানিকটা পথ পার হয়েছে, শিগ্‌গিরই রেলপথ পড়বে। এমন সময় তার মনে হল আরও একটা কিসের যেন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে — কোথায় যেন লোহায় লোহায় টুং টাং হচ্ছে। সেমিওন দ্রুত পা চালাল। সে সময় তার অংশে মেরামতের কাজ হওয়ার কথা নয়। 'এর মানে কী?' ও ভাবল। বনের ধারে যেখানে বেরিয়ে এলো, সেখানে তার সামনে রেল লাইনের বাঁধ উঠে দাঁড়িয়েছে, ওপরে, রেলপথে উটকো হয়ে বসে একটা লোক কী যেন করছে। সেমিওন নিঃশব্দে তার দিকে উঠতে লাগল — ভাবল, কে আবার নাট-বল্টু চুরি করতে এলো? দেখল লোকটাও উঠে দাঁড়াল, তার হাতে শাবল; শাবলে চাড় দিয়ে সে রেল লাইন একপাশে সরিয়ে ফেলেছে। সেমিওন চোখে অন্ধকার দেখল, চেঁচাতে গেল — পারল না। ও দেখতে পেল ভাসিলিকে, ছুটল; এদিকে শাবল আর রেঞ্চ হাতে ভাসিলি বাঁধের আরেক পাশ থেকে ডিগবাজী খেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'ভাসিলি স্তেপানিচ। তোমার পায়ে পড়ি, বাবা, লক্ষ্মীটি আমার, ফিরে এসো! রেঞ্চটা দাও! এসো, রেলটা ঠিক করে রাখি, কেউ জানতে পারবে না। ফিরে এসো, পাপের হাত থেকে নিজের আত্মাকে বাঁচাও।'

ভাসিলি ফিরেও তাকাল না, বনের ভেতরে চলে গেল।

ওল্‌টানো রেলের ওপর সেমিওন দাঁড়িয়ে থাকে, বোঝাটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। যে গাড়িটা যাওয়ার কথা সেটা মালগাড়ি নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। কিছু দিয়ে যে থামাবে সে উপায় নেই — ফ্ল্যাগ নেই। রেল জায়গায় বসানো সম্ভব নয়; খালি হাতে গজাল পোঁতা যাবে না। ছোটা দরকার, এক্ষুনি ছুটে যেতে হয় গুমটিতে কোন একটা সরঞ্জামের জন্য। ভগবান, সহায় হও!

সেমিওন নিজের গুমটির দিকে ছুটতে থাকে, হাঁপ ধরে যায়। ছোটে — এই বুঝি পড়ে যায়। বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো — গুমটি অবধি পৌঁছুতে আর একশ গজের বেশি বাকি নেই, এমন সময় শুনতে পেল কারখানায় ভোঁ বেজে উঠল। ছয়টা বাজল। এদিকে ছ'টা বেজে দু মিনিটে ট্রেন পার হবে। হা ভগবান! নিরপরাধ লোকগুলোকে বাঁচাও! সেমিওন যেন তার চোখের সামনে দেখতে পায় ইঞ্জিনের বাঁ চাকা ভাঙা রেলের ওপর এসে পড়ল, কেঁপে উঠল, একদিকে কাত হয়ে গেল, স্লীপার টুকরো টুকরো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার; এদিকে জায়গাটা বাঁকা, লাইন ঘুরে গেছে, তায় আবার উঁচুতে, হুড়মুড় করে গিয়ে পড়বে এগারো গজ নিচে, আর থার্ড ক্লাসে লোক গিজগিজ করছে, ছোট বাচ্চাকাচ্চা... ওরা সবাই এখন বসে আছে, মনে কোন ভাবনাচিন্তা নেই। ভগবান, আমাকে বুদ্ধি বাতলে দাও! না, গুমটি অবধি ছুটে গিয়ে সময়মতো ফিরে আসা সম্ভব হবে না...

সেমিওন আর গুমটির দিকে গেল না, পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি আগের জায়গার দিকে ছুটল। ছুটতে লাগল প্রায় আচ্ছন্নের মতো, কী যে হবে তাও জানা নেই। রেল যেখানে ওলটানো হয়েছে সে জায়গাটায় ছুটে এলো — তার আঁটিটি পড়ে আছে। সে নিচু হয়ে একটা নল উঠিয়ে নিল, কেন, তা নিজেও বুঝতে পারল না। দৌড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। তার মনে হল ট্রেন ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে। দূর থেকে সে শুনতে পাচ্ছে হুইসিল, রেল লাইন সমান তালে একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করেছে... আর সামনে দৌড়ে যাওয়ার শক্তি নেই। ভয়াবহ জায়গাটা থেকে শ খানেক গজ দূরে এসে সে থামল — এমন সময় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল। সে মাথার টুপি খুলে ফেলল, তার ভেতর থেকে সুতী কাপড়ের টুকরো টেনে বার করল, হাই বুটের ওপরের আবরণীতে যে ছুরি গোঁজা ছিল তা বার করল। ক্রুশ করল, ভগবানের নাম স্মরণ করল।

বাঁ হাতে — কনুইয়ের কিছুটা ওপরে ছুরি বসিয়ে দিল; ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, ঝরে পড়ল উষ্ণ ধারা। তাতে সে কাপড়ের টুকরোটা ভিজিয়ে নিল, ওটাকে সমান করল, টানটান করে নিল, কাঠির আগায় বাঁধল। সে সামনে এগিয়ে ধরল তার লাল ফ্ল্যাগ।

সেমিওন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার লাল ফ্ল্যাগ নাড়তে থাকে, ট্রেন ততক্ষণে দেখা দিয়েছে। ড্রাইভার তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কাছে এগিয়ে যেতে হয়, এক শ গজ দূর থেকে ভারী ট্রেনকে থামানো যাবে না!

এদিকে রক্ত ঝরছে ত ঝরছেই। পাশ থেকে ক্ষত জায়গাটাকে চেপে ধরে, চেপে বন্ধ করতে চায়, কিন্তু রক্ত পড়ার আর কামাই নেই; দেখা যাচ্ছে হাতে সে গভীর ক্ষত করে বসেছে। ওর মাথা ঘুরে গেল, চোখে ও সর্ষেফুল দেখল, তারপর একেবারে অন্ধকার; কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। ট্রেন দেখতে পায় না, আওয়াজও কানে আসে না; মাথায় কেবল একটাই চিন্তা: 'খাড়া থাকতে পারব না, পড়ে যাব, ফ্ল্যাগ পড়ে যাবে; গাড়ি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে... ভগবান, সহায় হও, আমার বদলি কাউকে পাঠিয়ে দাও...'